জননী কৈকেয়ী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ এক ॥

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

ঝিলাম নদীর তীরে সুন্দর মনোরম নগরী গিরিব্রজ। কেকয় রাজ্যের রাজধানী। দুর্ধর্ষ উপজাতি অধ্যুষিত কেকয় রাজ্যের নৃপতি হলেন অনুবংশের অশ্বপতি। অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। অতিথিবৎসল বলে তাঁর খ্যাতি আছে। অতিথিকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করেন। অতিথি শত্রু হলেও সমাদরের কোন কার্পণ্য নেই তাঁর।

অকস্মাৎ অযোধ্যার রাষ্ট্রদূতের আগমন উপলক্ষ্য করে কেকয়ের নানা লোক নানারকম কথা বলতে লাগল। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। যে যার নিজের দিক থেকে ব্যাখ্যা করল। অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা হল রাজসভায়। প্রত্যেকের বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তবু মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। মতান্তর বাদ প্রতিবাদের উত্তেজনা জমে উঠল রাজধানীর মজলিসে মজলিসে। অবশেষে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে রাজসভা বসল।

কাঞ্চন নির্মিত বেদীতে স্থাপিত স্বর্ণ সিংহাসনে মহারাজ অশ্বপতি উপবিষ্ট। তাঁকে গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখাচ্ছিল। হাতের উপর মুখ রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সকলকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। পাত্র মিত্র সভাসদও নিজ নিজ আসনে বসেছিল। আমাত্য প্রধান সুবীর রাজসভাকে সম্ভাষণ করে বলল ঃ মহারাজ, নগরে জনে জনে যা বলছে, আমি শুধু সেই কথাই নিবেদন করছি। বেশিরভাগ নাগরিকের মত হল যে, দণ্ডক প্রদেশের বৈজয়ন্ত নগরের অধীপতি শম্বর মহারাজের বন্ধু। আমাদের মিত্র রাজ্য। তিনি এখন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধরত। তাঁকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই অযোধ্যাপতি চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিয়ে চলেছেন। ব্রহ্মাবর্তের পথে শম্বরের মিত্ররাষ্ট্রে আতিথ্য গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে তিনি শম্বরের কাছে আমাদের সন্দেহ ভাজন করতে চাইছেন। এই সময় তাঁকে রাজনৈতিক আতিথ্য জ্ঞাপন করলে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। তারা আরো বলছে, দশরথের আতিথ্যগ্রহণ বন্ধুজনোচিত নয়। বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কেকয়ের মাটিতে পা রেখেছেন।

প্রধান পুরোহিত বলল ঃ মহারাজের অনুমতি পেলে আমি দু'চার কথা সংযোজন করতে পারি। অশ্বপতি তাকে মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। রাজাদেশ লাভ করে পুরোহিত বলল ঃ দশরথ একজন চতুর ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিচার বিবেচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতএব এ আগমন তাঁর সদিচ্ছা সফর কখনই নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

আমাদেরও রাজনৈতিক ভাবে নিতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের স্বরূপ নিয়ে যত মতভেদ।

যুবরাজ ভদ্র অধৈর্য হয়ে বলল : মতভেদ থাকবে কেন ? আমরা অনুবংশের লোক। শম্বর আমাদের বন্ধু ও স্ববংশীয়। রাক্ষসদের মত অসুরদের একটি পৃথক দুনিয়া প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে শম্বর রাবণের বন্ধু ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। দেবলোককে সে অসুরলোক করবে। এতে অন্যায় কোথায় ? রাবণের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। তাই দেব বিরোধী গোষ্ঠী নিয়ে রাবণের ঐক্য ভাঙ্গারও কোন প্রশ্ন ওঠে না। দেবতারা আমাদের শত্রু। উপজাতি বংশোদ্ভূত অনুবংশীয় বীরদের ম্লেচ্ছ বলে তারা ঘৃণা করে। বিদ্রূপ করে। অবহেলা দেখায়। তাই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে আমরা জাতীয় কর্ত্তব্য মনে করি। পিতা শম্বরের পুরোনো বান্ধব। দেবতাদের সঙ্গে সংঘর্ষে পিতা শম্বরের পক্ষে। এঁরা দুইজন একত্রে যুদ্ধ করলে দেবলোকের সাধ্য নেই তাদের প্রতিরোধ করে। এমনিতে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। এরকম একটি সুন্দর সুযোগে শম্বরের দেবলোক আক্রমণ আমরা সমর্থন করি। কিন্তু দশরথ আসছেন আমাদের বিভেদ বাড়াতে। সুতরাং, তাঁকে কেকয়রাজ্যের অতিথিরূপে বরণ করা কতখানি সংগত পিতাকে তা ভেবে দেখতে হবে।

সেনাপতি অশ্বসেন বলল : অযোধ্যাপতি দশরথ কখনই অতিথির যোগ্য নন। কেকয় রাজ্যের ভেতর দিয়ে তাঁর চতুরঙ্গ বাহিনীর যাত্রা কিছুতে অনুমোদন করা যায় না। এতে দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সমরাভিযান তাঁর সামরিক বাহিনীর মহড়া। বিপক্ষদলের মনে অকারণ একটা উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে তার মনোবল নষ্ট করা এবং এক দুঃসহ স্নায়ু উত্তেজনায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত ও ত্রস্ত রেখে তার আত্মবল ধ্বংস করে, তার সামরিক প্রতিক্রিয়া ও মতিগতি নির্ণয় করার এক চমৎকার দাওয়াই এই সামরিক মহড়া। শত্রুতা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী ; আচরণকে যথেষ্ট সংযত ও শান্ত রাখার এক পরোক্ষ চাপ। চতুর অযোধ্যাপতি ঠাণ্ডা মাথায় স্নায়ু যুদ্ধের এক উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে শম্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য ও বন্ধুত্বে জাগ্রত করে এক বৃহৎ রাজনৈতিক জয় আদায়ের ফন্দী এঁটেছেন। শম্বরের সঙ্গে আমাদের বিভেদ সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর জয়ে আমাদের পরাজয়। এ কথা মনে রেখে আমাদের কর্ত্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।

মন্ত্রীবর সুবীর ধীরে ধীরে শান্ত গলায় বলল : সেনাপতি অশ্বসেনের বক্তব্য আমি সমর্থন করি। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, শম্বরকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করার কৌশলরূপে ধূর্ত্তরাজা সরল, মহাপ্রাণ, অতিথিবৎসল কেকয় রাজকে ব্যবহার করবে। অথবা, কেকয় রাজ্যের দুর্বলতার রন্ধ্রপথগুলি অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দাবী আদায়ের চাপ সৃষ্টি করবে।

তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে মন্ত্রীবর সুবীর পুনরায় বলল : আমার আরো ধারণা, অত্যন্ত সজ্জন, অতিথিবৎসল কেকয়রাজকে আতিথেয়তায় ব্যস্ত রেখে শম্বরের

অসুবিধা সৃষ্টি করাও তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে। শুধু তাই নয়, অযোধ্যার বিশাল সৈন্যবাহিনীর আহারাদি এবং অন্যান্য সুখ সুবিধা দেখতে এ দেশের শষ্যভাণ্ডার এবং অর্থ ভাণ্ডারে টান পড়বে। এর ফলে কেকয় রাজ্যে বেশ একটা অর্থনৈতিক অসুবিধা দেখা দেবে। বিপুল ক্ষয় ক্ষতির অঙ্কে কেকয় রাজ্যে এমন এক দুর্বিষহ অবস্থার উদ্ভব হবে যা তার নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। অতএব অযোধ্যাপতির প্রবেশ নিরর্থক এবং ক্ষতিকর।

কেকয়রাজ অশ্বপতি কিন্তু এত সব কথার মধ্যে একটি কথাও বললেন না। মনোযোগ সহকারে সকলের কথা শুনছিলেন। প্রত্যেকের বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি এবং চিন্তা ছিল। নিজেকে যথাসম্ভব তাদের আলোচনা থেকে দূরে রেখে নিরাবেগ চিত্তে তাদের শাণিত কথাগুলি পুংখানুপুংখ ভাবে বিশ্লেষণ করছিলেন। অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। আস্তে আস্তে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেনঃ মহামতি দশরথের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমাদের অপরিজ্ঞাত। তবু তাঁকে নিয়ে যে আলোচনা হল তাতে প্রত্যেকের দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, বন্ধুত্বের মর্যাদারক্ষায় আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকের কথা শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত এবং গর্বিত। আপনাদের মত আমি এদেশের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষায় সচেতন। আপনাদের সকলের মত যত যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে এবং সন্দেহের বশে তাঁর আতিথ্যের আবেদনকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আপনাদের পুনর্বিবেচনার জন্যেই আমি কতকগুলি কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি। অকারণ শত্রু সৃষ্টি করা রাজনীতির ধর্ম নয়। মিত্র আচরণে পরিতুষ্ট রেখে শত্রুর হৃদয় জয় করা শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের কূটকৌশল। তাই বলছি, মাননীয় অতিথিকে অকারণ সন্দেহের চোখে দেখে যদি ভুল করি তা-হলে শত্রুর হাতই শক্ত হবে তাতে। সমাদরে যাকে ধন্য করতে পারি, অনাদরে তাকে শত্রু করব কেন? তাঁর বিশাল সমরবাহিনী সম্পর্কে সেনাপতি অশ্বসেনের আশংকার কোন ভিত্তি নেই। রাজ্যের মধ্যে সেনাবাহিনী প্রবেশ করলেই যে রাজ্য জয় হয়ে গেল, আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের সতর্ক সেনাবাহিনী সর্বদা মিত্রবাহিনীকে বেষ্টন করে আছে। রাজ্য সীমার বাইরে বেরোনোর পথ বন্ধ। বাইরের পথ খোলা না থাকলে শুধু অবরুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা যায় না। রসদ এবং যুদ্ধাস্ত্রের নিয়মিত সরবরাহের পথ বন্ধ রেখে কোন মূর্খ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এই সরল সত্য কথাটা মনে রাখলে আর আশংকা থাকবে না। অতএব, আপনাদের সম্মতি পেলে মহামান্য অতিথি বরণের আয়োজন করতে পারি।

অশ্বপতির পরামর্শ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হল সভায়। সবাই একবাক্যে তাঁর বক্তব্য অনুমোদন করল।

অতিথিবরণের সাজসাজ পড়ে গেল রাজধানী গির্জাকে। সমগ্র নগরী উৎসবের রূপ পেল। পত্র পুষ্পে পল্লবে পতাকায় সজ্জিত করা হল বিশাল রাজপথ। প্রতিটি পথের সংযোগস্থলে তোরণ নির্মিত হল। রাজপ্রাসাদও রূপে রঙে রেখায় অপরূপ হয়ে উঠল।

স্বয়ং কেকয়রাজ অযোধ্যাপতি দশরথকে সমাদর করে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

দশরথ বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ অযোধ্যার বিখ্যাত মূল্যবান শিল্পদ্রব্য উপহার সামগ্রী এবং বহু সুন্দরী রমণী কেকয় রাজকে দিয়ে প্রীতি করল।

দণ্ডক প্রদেশের বৈজয়ন্ত নগরের অধিপতি শম্বর চতুরঙ্গ বাহিনী সজ্জিত করে ব্রহ্মলোক আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। লক্ষ্য তার ইন্দ্রলোক জয়। রাবণের সঙ্গে ইন্দ্রের সখ্য সম্পর্ক তার মনঃপূত হয়নি। রাবণের একাধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তাকে ঈর্ষান্বিত করল। ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিয়ে রাক্ষস ও অসুরের বিরোধ পুরনো। সেই বিরোধের ইন্ধন দিয়ে সে এক বিভেদের রাজনীতি সূচনা করল। অসুরদের একত্র করে সে এক পৃথক অসুরভূমি গঠনের সংকল্প প্রকাশ করল। কিন্তু তার সংগ্রাম রাবণের সঙ্গে নয়, দেবতাদের বিরুদ্ধে।

শম্বরের সংকল্প সব অসুর অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচার করা হল। কিন্তু অনেকে রাবণের ভয়ে এবং ঐক্য নষ্ট হওয়ার আশংকায় শম্বরের আহ্বানে সাড়া দিল না। তখন তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ এবং ভীতি প্রদর্শন করা হল। সব অসুর প্রধানের কাছে তার আদেশ নির্দেশ নতুন নতুন করে জারি হল। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতা ও দেবলোক নিশ্চিহ্ন করে ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে ব্রহ্মাবর্ত নামক স্থানটিকে সে মুছে ফেলবে। অধিকৃত দেবভূমি অসুরভূমি নামক অভিহিত হবে। শুধু অসুরেরা থাকবে সে রাজ্যে। শম্বরের অভিনব ঘোষনায় প্রতিটি বীর অসুরের রক্ত যুদ্ধের জন্য নেচে উঠল। যুদ্ধাস্ত্র ভর্তি শকট সাজিয়ে তারা শম্বরের সংগে ব্রহ্মাবর্তে যাত্রা করল। প্রতিটি যোদ্ধার মুখে দেবলোকের প্রতি সুতীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি। চোখে তাদের অনাগত এক অসুর রাজ্যের স্বপ্ন।

দেবলোক থেকে সে খবর পেঁছিল আর্যাবর্তে। ইন্দ্র সবার কাছে আবেদন জানাল। সকলের সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোন আর্যনৃপতি এগিয়ে গেল না। রাবণের রক্তচক্ষুকে ভয় পেল তারা। আর্যাবর্তের প্রধান নরনাথ অযোধ্যা মহীপতি দশরথকে প্রতিনিধি করে তারা ইন্দ্রলোকে পাঠাল। সব আর্যরাজাই গোপনে নিজ নিজ বাহিনী থেকে বেশ কিছু সেন্য, অস্ত্র, অশ্ব, শকট, খাদ্য, রথ প্রভৃতি দিল। বিশাল সেন্যবাহিনীর মধ্যভাগে দশরথ মধ্যাহ্ন সূর্যের মত শোভা পাচ্ছিল।

যাত্রার সময় দশরথ নানারকম দামী নয়ন মনোহর উপহার সামগ্রী নিয়েছিল। গোড়াতেই সে মতলব করেছিল কেকয় রাজ্যের অধিপতি অশ্বপতিকে বশ করতে পারলে দেবাসুরের সংগ্রামের চিত্র বদলে যাবে। কারণ অশ্বপতি এবং শম্বর দুই বন্ধু। তাদের প্রণয়ও গাঢ়। শম্বরের দক্ষিণ হস্তও বটে। অশ্বপতির সৈন্যবাহিনী বিশাল। প্রত্যেকেই রণকুশলী এবং কষ্ট সহিষ্ণু। জীবন মরণ পণ করে এঁরা যুদ্ধ করে। সুতরাং, দেবতাদের সঙ্গে রণে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারলে অনেকখানি জয় আদায় করা সম্ভব হবে। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করবে কোন্ মন্ত্রবলে? তবু দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার একটা উপায় সে চিন্তা করতে লাগল। অবশেষে চরের মুখে

জানতে পারল, অশ্বপতি ভীষণ অতিথিবৎসল রাজা। অতিথি তাঁর কাছে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতিথি শত্রু হলেও অশ্বপতি সমাদরের কোন ত্রুটি রাখেন না। এই চরিত্রগুণটিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার করে দশরথ তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠাল। এবং ম্লেচ্ছরাজ্য কেকয়ের ভেতর দিয়েই সে ব্রহ্মলোকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অশ্বপতির আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন করা সম্ভব বলে মনে হল।

দশরথের সম্মানে কয়েকদিন ধরে উৎসব চলল সেখানে। খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান এর আনন্দ উৎসবে রাজপ্রাসাদ মেতে রইল। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দশরথকে দেখার জন্যে রাজ্যের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তির সমাগম হল সেখানে। এছাড়াও প্রতিদিন বহু দর্শনার্থীর ভীড় সেখানে লেগেই ছিল। দশরথের শিষ্ট আচরণে, সুমিষ্ট ভাষণে সকলে তুষ্ট হল। তাঁর সংস্পর্শে ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি থেকে আরম্ভ করে সম্ভ্রান্ত সকল ব্যক্তি নিজেকে ধন্য মনে করল।

অতিথির আদর যত্নের পরিচর্যার একটুও ত্রুটি রাখলেন না অশ্বপতি। সেবায় স্বাচ্ছন্দ্যে আতিথেয়তায় অন্তরঙ্গতায় দশরথ অভিভূত হল।

অবশেষে যাত্রার দিন উপস্থিত হল। যাত্রার আগে দশরথ শিব মন্দিরে গেল পূজা দিতে। কেকয়রাজ অশ্বপতিও তার সঙ্গে রইলেন। সুসজ্জিত সপ্ত অশ্ববাহিত রথে তাঁরা দু'জন মন্দিরে গেলেন।

মন্দিরে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ীর উপর। পূজারী পুরোহিত পূজাবিধি পালনে দশরথকে যত সাহায্য করুক আর আপ্যায়ন করুক, পরিচর্যার শ্রী-সৌন্দর্য রমণীয় হয় রমণীর সেবা ও সান্নিধ্যে। অতিথি সেবা ত্রুটিহীন করতে আতিথেয়তাকে আরো অন্তরঙ্গ ও মধুর করতে কেকয়রাজ আপন দুহিতাকে মন্দিরে নিযুক্ত করলেন।

মন্দিরের পথ পুষ্প মাল্যে এবং নানাবর্ণের পতাকায় সজ্জিত করা হল। দু'একটি তোরণও রাজপথে নির্মিত হল। উঁচু চড়াই পাহাড়ী পথের দুধারে উৎসুক মানুষের ভীড়। জনতার অভিনন্দন এবং হর্ষ কুড়োতে কুড়োতে দশরথের রথ ভীড়ের ভিতর দিয়ে মন্দগতিতে এগিয়ে চলল।

রথ মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠল। পুর-নারীরা উলু ও শঙ্খধ্বনি দিল। যুবরাজ ভদ্র এবং মন্ত্রীবর সুবীর দুজনে দশরথকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। জনতা জয়ধ্বনি দিল। সকলের সঙ্গে দশরথ মন্দিরে প্রবেশ করল। অমনি সুগন্ধী পুষ্পের বলয় সাজানো একদল নৃত্য পটীয়সী যৌবনবতী দেবদাসী মরালীর মত ভেসে ভেসে এল নাটমণ্ডে। প্রস্ফুটিত ফুলের মত সজীব এই সুযৌবনা দেবদাসীরা তাদের যৌবনপুষ্ট দেহের লীলায়িত বিন্যাসে বিচিত্রমুদ্রা রচনা

করে নাচতে লাগল। নাচছিল পাগলের মত। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দুলছিল তাদের দেহ। বিদ্যুতের রেখার মত তাদের আঁখিকোণে কটাক্ষ মুহুর্মুহু ঝলক দিচ্ছিল। রঙীন কাচুলির আড়ালে দুটি বক্ষ গোলক উত্তেজনায় অধৈর্য হয়ে ঘন ঘন কাঁপছিল। ললনারা চক্রাকারে পাক দিতে দিতে উল্কার মত ছুটে গেল দেব বিগ্রহের দিকে। নাটমণ্ড থেকে দেখা যাচ্ছিল কাঞ্চনময় মঞ্চে রক্ষিত হরপার্বতীর অনুপম যুগল শিলামূর্তি। নর্তকীরা সকলে একসঙ্গে হরপার্বতীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। শ্বেত পাথরের বেদীর উপর মাথা রেখে তারা আকুল হয়ে নিজেকে নিবেদন করল।

দশরথের দুই চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা। অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতর তলিয়ে গিয়ে সে যন্ত্রচালিতের মত অশ্বপতি, ভদ্র প্রমুখদের অনুসরণ করল। আলো ঝলমল মন্দির দ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়াল তারা।

দশরথের চোখের তারায় তখনও অনাস্বাদিতপূর্ব সুখানুভূতির আবেশ। মৃদুগতি মরালীর মত সামনে এসে দাঁড়াল কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী। কৈকেয়ীর গায়ের রঙ গৌরবর্ণা। প্রতিমার মত নিখুঁত মুখ। ছোট কপাল, আর চমৎকার। থোকায় থোকায় নেমে আসা চুল পা পর্যন্ত। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঝর্ণার মত উচ্ছৃংখল তার অবিন্যস্ত কেশদাম। মসৃণ ত্বক, চোখা নাক, খাসা চোখ। নীলকান্ত মণির মত চোখের দুটি তারা। পল্লবঘন চোখ দুটি সরোবরের মত স্থির, শান্ত। অগাধ ও গভীর। কি গভীর অনুভূতি মাখানো চোখের চাহনি। ঘুম ঘুম আবেশে বিভোর। বর্তুলকার চিবুক, বিম্বফল সদৃশ ঠোঁট, মুক্তার মত ঝকঝকে দাঁত, ঝিনুকের মত কান, মরালের মত গ্রীবা, শঙ্খের মত পয়োধর। রমণীয় সবকিছু সৌন্দর্য উজাড় করে ঈশ্বর তাকে অনুপমা করে গড়েছেন।

দশরথ স্তব্ধ। চোখের পলক পড়ে না তার। চোখ দুটো খদ্যোতের মত জ্বলে। কৈকেয়ীর উদগ্র যৌবন যেন মরীচিকার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। তৃষ্ণার্ত পথিকের মত আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে দশরথ তার দিকে তাকিয়েছিল।

কৈকেয়ীর বর্ণাঢ্য পোশাক আর ঝকমকে অলংকারে শোভিত তার তনু। বহুমূল্যের রত্নখচিত হাল্কা নীল শাড়ি নিতম্বের সঙ্গে আঁটা। তাতে নিতম্বদেশই বেশি করে উদ্ভাসিত হয়েছে। নীবিবন্ধ থেকে পা পর্যন্ত কাপড়ের কুঁচি উরুর দুইদিকে সমান ভাবে পাটে পাটে থাকে থাকে নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। কোমরের ঊর্ধ্বভাগে চুমকির কাঁচুলি ছাড়া আর কোন আবরণ নেই। বিমুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টি থেকে কমনীয় ঊর্ধ্বাঙ্গকে ঢেকে রাখার কোন সামাজিক অনুশাসন উপজাতি সমাজে নেই। রাজকন্যা হলেও উপজাতি সমাজের রীতি তাকেই মানতে হয়। অলঙ্কার প্রিয় উপজাতি রমণীর মত কৈকেয়ীও তার তন্বী সুঠাম অবয়ব সাজিয়ে তুলেছে বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে। ঝিনুকের মত দুটি কানে মুক্তোর ঝুমকো, চন্দ্রশোভার মত ললাটে টায়রা, বল্লরীর মত ভুজদ্বয়ে কঙ্কন, বলয়, পদ্মনালের মত কণ্ঠে হারের লহর। মেঘবরণ কুন্তলে থোকা থোকা সুগন্ধী পুষ্পগুচ্ছ, সোনার কাঁটা আর চিরুনী। সব অলঙ্কারে সোনার উপর জড়োয়া কাজ। চুনির পাশে পান্না, পীতাভ পোকরাজ আর হীরে, মোতির জহরৎ মিশে রঙের

ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছে। ফুল্ল পয়োধরের পীতবর্ণ রেশমীর কাঁচুলিতে মরকতের গায়ে সোনা আর পদ্মরাগ মণি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। রূপ নয় রূপের আগুন।· সে আগুন পুরুষের মন পোড়ে, দেহ জ্বলে।

দশরথের আকস্মিক ভাবান্তর চতুর অশ্বপতির দৃষ্টি এড়াল না। অধরে তার গর্বিত হাসি ফুটল। চোরা চোখে তাকাতে গিয়ে দশরথের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে গেল। বিব্রত লজ্জায় সংকুচিত হল দশরথ। নিজেকে সংযত করার জন্যে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। বিভ্রান্ত চোখের চাহনিতে কামনার আগুন নিভে গিয়ে ফুটে উঠল অকপট বিস্ময়।

অশ্বপতি কৈকেয়ীর অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করে গর্বিত কণ্ঠে মৃদু-স্বরে উচ্চারণ করল ঃ আমার কন্যা কৈকেয়ী।

অশ্বপতির ইংগিত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল।

একথা শুনে লাজুক অপ্রতিভতায় দশরথের ভুরু কোঁচকাল। মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। শরবিদ্ধ হরিণের মত কাতর একটা শব্দ তার কণ্ঠ থেকে তৎক্ষণাৎ নির্গত হল ঃ অঃ!

কৈকেয়ীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব তার ভরা যৌবনের ব্যক্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তুলল। রূপের দেমাকেই যেন সে একটু বেশী স্বতন্ত্র। তবু দশরথের মনে হল, সত্যিই অসাধারণ সে। তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু একটা ভীষণ দুর্বলতায় তার বুক কাঁপছিল। লজ্জা পাচ্ছিল। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কেমন বেদনাচ্ছন্ন আর সকরুণ সে দৃষ্টি।

মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৈকেয়ীর সুডৌল মুখখনা। মধুর কণ্ঠে বলল ঃ মহারাজ, পবিত্র গঙ্গাজলে আচমন করে হরপার্বতীর বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করুন আমার সঙ্গে। তারপর গন্ধধূপ আর পুষ্প দিয়ে দেবতার অর্ঘের আয়োজন করুন।

দশরথ সহসা কথা বলতে পারল না। সম্মোহিতের মত তার অনুগমন করল। মধুর প্রসন্নতায়, আবিষ্ট তার চেতনা। রাজেন্দ্রাণীর মত কৈকেয়ীর শান্ত সমাহিত রূপের ঐশ্বর্য তাকে কৈকেয়ীর দিকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করতে লাগল। বাসনা অনন্ত কামনার দীপ হয়ে জ্বলছিল বুকে। বাসনা পূরণের উন্মাদনায় আকুল হল সে। কারণ, বীর চায় প্রতিমুহূর্ত্ত নিজের জীবনকে সার্থক করে পেতে। জীবন তার কাছে খেলার, আনন্দের উপভোগের। জীবনকে বাজি রেখে বীর জীবন মরণ যুদ্ধে নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যেমন তার বুক কাঁপে না, তেমনি জীবনের সুখ, তৃপ্তি আনন্দের জন্যে বীর্যের গর্বে সুন্দরী নারীকে দাবি করতেও কুণ্ঠা নেই তার। এ হল বীর ধর্ম! এ দাবি সব বীর্যবান পুরুষের। পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্য ধন বীর কামনা করে। একে ভাগ্যের প্রসাদ বা অনুগ্রহ মনে করে না। দাবিই মনে করে। রূপবতী কৈকেয়ী দশরথের হৃদয়ে সেই অনুচ্চারিত দাবির প্রতিধ্বনি করল।

বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করতে করতে করতে অপরাধীর মত নিজের ত্রুটি স্বীকার করে সংযত স্বরে আত্মনিবেদনের ভাষায় বলল : রাজকন্যা আমি তো এদেশের ধর্মকর্মের রীতি নীতি জানি না। তুমি আমার হাত ধরে শিখিয়ে নাও।

বিগ্রহের পিছনে ছাই ছাই অন্ধকার। তবু, দশরথ কৈকেয়ীর নিঃশব্দ হাসির ভেতর তার উদ্দাম প্রাণের ইশারা ফুটে উঠতে দেখল। অমনি বুকের ভেতর তার দুরু দুরু করে উঠল। আদিম রক্ত তরঙ্গের ভাষা তাকে প্রগলভ করে তুলল। ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল : প্রেমের দেবতার হর পার্বতীর ভাষা শুনতে পাচ্ছ রাজকন্যা ?—মন্দির অভ্যন্তরে নিথর স্তব্ধতার ভেতর তার কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনাল।

দশরথের প্রশ্নে কৈকেয়ী থমকে দাঁড়াল। বিগ্রহের সুউচ্চ কাঞ্চন মঞ্চে কান পাতল। গোল মুখে, কাজল কালো চোখের তারায় হাসি হাসি সরলতা, কৌতুকে উজ্জ্বল। ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল : প্রেমের দেবতা পাষাণ। তাঁর হৃদয় নেই। তবু মানুষের প্রাণের বীণায় তার মৌন স্তম্ভিত প্রেমের অব্যক্ত বাণী স্বর হয়ে ওঠে। এ জন্যেই নিদ্রিত দেবতাকে জাগ্রত বলা হয়।

বিচিত্র একটা পুলকানুভূতিতে দশরথের মনটা প্রজ্জ্বলিত মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল। অকস্মাৎ শত কৌতূহলিত মানুষের দৃষ্টির সম্মুখবর্ত্তী হওয়ার জন্যে নিজের আবেগকে মুহূর্ত্তের জন্যে সংযত করল। তারপর, পুনরায় দৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তী হলে নিচু গলায় বলল : রাজকন্যা, যুগযুগান্তর ধরে প্রেম মানুষের রক্তে বহমান। সরল ধর্মবিশ্বাসের আলোয় তাকে আরো উজ্জ্বল এবং শাশ্বত করে তুলতে এই পাষাণ বিগ্রহের আয়োজন। হরপার্বতীর ঐ যুগল রূপ অনাদিকাল ধরে ঈশ্বরের বাণী শোনাচ্ছে। বলছে : মানুষ তুমি পশু নও, অমৃতের সন্তান। তোমার পশু স্বভাবকে প্রেম সুন্দর করে। বিশ্ব চরাচরের মানুষের কল্যাণের প্রতীক প্রেমের এই যুগল বিগ্রহ। প্রেমের বীর্যে মানুষ সুন্দর হয়। মহান হয়।

কৈকেয়ী কথা বলতে পারল না। প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। বিস্মিত বিহ্বলতা নামল তার দুই চোখে। তার স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে প্রবাহিত হল তীব্র একটা আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। তথাপি, বুকের ভেতর জলতরঙ্গের মত রিন রিন করে বাজছিল দশরথের কথাগুলো। স্তিমিত আলোয় দেখল দশরথের স্ফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা যৌবন সমুজ্জ্বল,অনিন্দ্যসুন্দর দীর্ঘ দেহ এবং স্বাস্থ্য। তারুণ্যের সৌন্দর্য দীপ্তি ঔজ্জ্বল্য, কমনীয়তা অটুট তার শরীরে। প্রস্ফুটিত পুষ্প যেমন ভ্রমরকে আকর্ষণ করে তেমনি একটা আকর্ষণ তার অবয়বে, নম্র চাহনিতে ; ননীরের মত কোমল রক্তবর্ণ অধরে। নিদারুণ উত্তেজনায় দেহমন তার বিকল হয়ে গেল। অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল কৈকেয়ী। দৃপ্ত যৌবনা রমণীর সেই অনির্বচনীয় লাজুক অপ্রতিভ সৌন্দর্যের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দশরথ তাকিয়ে রইল। নিরীক্ষণ শুধু করল না, হৃদয়ঙ্গমও করল। কৈকেয়ীর দুই চক্ষু বোজা। বিপুল আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত হল দশরথ। নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘনীভূত হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। বলল : স্তিমিত আলোতেই তোমাকে দেখতে আমার ভাল লাগছে রাজকন্যা। নিজেকে নিঃশেষে উজার করে

দিতে এত আনন্দ হচ্ছে কেন ? ভক্ত যেমন সর্বস্ব নিবেদন করে দেবতার উদ্দেশ্যে, ঠিক তেমনি দীনাতিদীন প্রার্থীর মত আমিও নিজেকে নিবেদন করলাম তোমার কাছে। প্রেমের দেবতার ইচ্ছায় তুমি আমার ধর্মের সহকর্মিণী হয়েছ। সহধর্মিণী হতে বাধা কোথায় ? এখন তোমার ইচ্ছে হলে দ্বটি শীর্ণ তটিনী এক হয়ে মিশে যেতে পারে সাগরে।

কৈকেয়ী আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। দক্ষিণ হস্তের করতল দিয়ে দশরথকে সজোরে ঠেলে দিয়ে বিগ্রহের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। দশরথ দেখল কৈকেয়ীর কোন চাঞ্চল্য নেই। সে নির্বিকার, নিরাবেগ চিত্তে তার হাতে পুষ্প বিল্বপত্র দিল। কণ্ঠ মিলিয়ে তার সংগে পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করল।

অর্ঘ্যদানের অনুষ্ঠান শেষ হল একসময়। প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল দশরথ। তার চেতনার ভেতর, সমস্ত সত্তার ভেতর কৈকেয়ীর অনির্বচনীয় শরীরী সৌন্দর্য নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল। তাই কেমন একটা নিশি পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন অভিভূতভাব তার মুখে থমথম করতে লাগল। উপস্থিত রাজপ্রতিনিধিরা কিন্তু ভাবছিল, ভক্তবৎসল মহামান্য অতিথি তদ্গতচিত্তে দেবতার ধ্যান করছে। তাই, এরূপ আত্মসমাহিত তিনি।

অনেকক্ষণ কেটে গেলে কৈকেয়ী মধুর কণ্ঠে ডাকল তাকে। বলল ঃ মহারাজ ! কি মিষ্টি সেই স্বর। মনে হল অনেকদূর থেকে সে স্বর যেন ভেসে ভেসে এল দশরথের কানে।

দশরথের বুকের ভেতর চঞ্চল বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। স্বপ্নাচ্ছন্ন বড় বড় চোখে তাকাল তার দিকে। উদভ্রান্ত চোখে অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল ঃ চলুন তাহলে।

অশ্বপতির সঙ্গে রথে উঠল দশরথ। রথে দশরথ সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক উদাসীন। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কি যেন ভাবছিল তন্ময় হয়ে। আর এই আকস্মিক আশ্চর্য পরিবর্তন অশ্বপতিকে অবাক করল। নাটমঞ্চে রূপধন্যা সুযৌবনা, দেবদাসীদের দেখা থেকেই মহামান্য অতিথির চোখের চাহনি বদল হতে দেখেছেন তিনি। কিন্তু দশরথের চিত্তবিনোদনের জন্য এরকম হাজার রমণী অযোধ্যায় প্রতিদিন তার সেবায় নিযুক্ত। ললনাপ্রিয় দশরথের নিজস্ব প্রমোদ কক্ষে এরকম আকর্ষণীয়া রূপরম্যা, লাস্যময়ী তরুণীর অভাব নেই। অনাবরণ দেহের অপরিসীম সৌন্দর্যে ভরপুর যৌবন চিহ্নগুলি উম্মুক্ত করে তারা রাজার সম্মুখে নৃত্য করে। সে নৃত্য আরো উত্তেজক, আরো চিত্তবিভ্রমকারী। প্রমোদ গৃহের ঝাড় বাতির আলোয় তাদের অনাবৃত আশ্চর্য যৌবনশ্রী অগ্নিশিখার মত জ্বলে। কামনা লালসা লেলিহান শিখার মত লকলক করে তাদের সর্বাঙ্গে। উষ্ণ জলের স্রোতের মত তরলিত কামনা মোমের মত গলে গলে পড়ে রক্তে। সুতরাং-এ উত্তেজনা আনন্দ রোমান্স দশরথের কাছে নতুন কিছু নয়। এসবে তার মন অভিভূত হলেও হৃদয় বিফল হওয়ার কথা নয়। এসব এক ঘেঁয়ে আনন্দ উপভোগের মধ্যে কোন চমৎকারিত্ব নেই। তাহলে দশরথ অন্যমনস্ক

কেন ? কি হয়েছে তার ? আকস্মিক কোন অসুস্থতার জন্যে কি এরূপ চিত্তবৈকল্য ? ভেবে কুল-কিনারা করতে পারলেন না অশ্বপতি। অবশেষে, "কে জানে ? দূরে ছাই !" করে দশরথকে নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করলেন। আত্মরক্ষার মগ্নতাকে অন্যমনস্কতার রূপ দেবার জন্য অশ্বপতি পথের দু'ধারে চলমান শোভার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সাঁ সাঁ করে বাতাসের ঝাপ্টা লাগছিল দশরথের চোখে, মুখে, নাকে, কানে। হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছিল। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মাথার মুকুট ঠিক করে নিচ্ছিল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতল হল দশরথের দেহ। স্নায়ুর তাপ হ্রাস পেল। ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়গুলো তার সজীব ও ক্রিয়াশীল হল। গভীর বিষাদের বরফ গলতে সুরু করায় মুখের মালিন্য গেল কেটে। মনের মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব জাগল। কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে তখনও নানা চিন্তা ও জিজ্ঞাসার ভীড়। সহসা কৌশল্যা ও সুমিত্রার মুখখানা তার মনের পটে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। কারণ, ওই চিন্তার মধ্যেও আশ্চর্য রকমভাবে একটা ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল। বিদ্যুৎ চমকের মত কৈকেয়ীর তন্বী সুঠাম, অবয়বের নিটোল সুন্দর প্রতিমার মত মূর্তিটি বারংবার চোখের তারকায় ঝলকিয়ে উঠল।

যে পথ ধরে রথ যাচ্ছিল, সেই পথের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দশরথ অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নাড়ছিল। নিজেকে প্রশ্ন করছিল আর নিজের মনেই তার একটা কাল্পনিক উত্তর সে সন্ধান করছিল। পঞ্চদশী কৈকেয়ীর রক্তের শিরায় শিরায় কি তার মত গলিত আগুনের স্রোত বয়েছিল ? থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল কি তার শরীরের ভিতর বাহির ? কৈকেয়ীকে কেমন তার নির্লিপ্ত, নির্বিকার, অসহায় মনে হচ্ছিল। তথাপি কেমন একটা অসহিষ্ণুতা যেন তাকে পীড়া দিচ্ছিল। চোখের তারায় ছিল একটা অব্যক্ত জিজ্ঞাসার প্রশ্ন ; কেমন একটা ভীরু দ্বিধার ছায়া। আসলে তা ভীরুতা নয়। সে হল পঞ্চদশী তরুণীর প্রেমের সরস সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ? আধো অন্ধকার বিগ্রহের পিছনে কৈকেয়ী তার ডান হাত মুঠো করে ধরেছিল। আর তাতেই তার থরথরিয়ে উঠেছিল বুক। কৈকেয়ীর ভীরুতা ছিল, দ্বিধা ছিল কিন্তু তার আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটি চোখ প্রেমানুভূতির তীব্রতায় জ্বলজ্বল করছিল। ঠোঁটে তার কথা বলার শক্তি ছিল না কিন্তু মুখখানি দুরন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। কৈকেয়ী চুপি চুপি স্বরে বলেছিল ঃ 'মহারাজ !' সেকথা শুনে নিজেই চমকে উঠেছিল সে। ভাললাগার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার একটা দুর্জয় সাহস দেখিয়েছিল কৈকেয়ী। আনন্দ বিস্ময় এবং একটি সূক্ষ্ম সহানুভূতিবোধ তার চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটেছিল। অতএব সে এখন নিঃসন্দেহ যে, কৈকেয়ী তাকে ভালবাসে। তা-হলে কেকয়রাজ অশ্বপতির কাছে মনের বাসনা প্রকাশ করতে বাধা কোথায় ? বাধা একটা নয়, অসংখ্য বলে মনে হল দশরথের। নিষেধের প্রতিমূর্তি কেকয়রাজ এখন তার কাছে বাস্তব সত্য। তাঁর কাছে কৈকেয়ীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া এক কঠিন কাজ। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের বিবাহ হয় না। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, বয়স, পরিবেশ, সময় সবনিয়ে এ বিবাহ অসঙ্গত

এবং অসিদ্ধ। বাধার কথা মনে হতে বুকের ভেতর তার কাঁটা ফোটার যন্ত্রণায় টনটন করে উঠল। মস্তিষ্কের বদ্ধ কুঠুরির মধ্যে খঞ্জনির মত বাজতে লাগল, কেন পাবে না কৈকেয়ীকে? কৈকেয়ীর শূন্য জীবনের মূল্য কোথায়? কান্নারুদ্ধ হৃদয়ের এক রুদ্ধ আবেগে নিজের মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ভয়ংকর সাধ পূরণের জন্যে যুদ্ধ যদি অনিবার্য হয় তবুও কৈকেয়ীর উপর তার দাবি ত্যাগ করবে না। বীর্যের গর্বে পুরুষ নারীকে চায়। দাবির নীতি মেনেই বীর্যবান পুরুষ কেশরফোলা সিংহের মত গর্জন করে আক্রমণের সংকেত দেয়। সে রকম কিছু একটা করার অভিপ্রায় নিয়ে সে অশ্বপতির দিকে তাকাল। চোখে তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি। দৃষ্টিতে কোন প্রশ্ন ছিল না। ছিল শুধু একটা সেতু স্থাপনের প্রয়াস। সে সেতু তার নিজের কুল থেকে অশ্বপতির তীরে উঠা।

দশরথ জানত না সে নিজেই অশ্বপতির জিজ্ঞাসার স্রষ্টা। অশ্বপতির দিকে তাকাতেই তাঁর চোখের তারায় অবাক বিস্ময় আর কৌতুহলিত রহস্যের দ্যুতি দেখতে পেল। দশরথের নিজের প্রাণও তাতে দ্যুতিময় হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে তার অভিভূত আচ্ছন্নভাব, দূর হল। দশরথের চোখে শংকা, দ্বিধা কিছুই ছিল না। দুজনের চোখাচোখিতে ঠোঁটের অগ্রভাগে ঈষৎ অপ্রস্তুত হাসি বর্তুল হয়ে উঠল।

দশরথের কথা বলার আগেই অশ্বপতি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলল: মহান বন্ধু অযোধ্যাপতি আপনি কি কোন শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন? আমার আতিথেয়তার কি কোন ত্রুটি হল? আপনার শরীর ঠিক আছে'ত? আপনাকে সারাক্ষণ অত্যন্ত বিমর্ষ এবং চিন্তিত দেখে আমি যারপরনাই অশান্তি ও উদ্বেগ বোধ করেছি। এখন অনুগ্রহ করে বলুন আপনার কি হয়েছে? আপনার কোন কাজে আমি লাগতে পারি?

অশ্বপতির সহৃদয় আন্তরিকতায় মুগ্ধ ও অভিভূত হল। সহসা কোন কথা বলতে পারল না। দ্বিধা সংকোচ কাটাতে আরো কিছু সময় লাগল। তারপর হাসি হাসি মুখ করে সকৌতুকে বলল: কেকয় রাজ্যে পা দিয়ে আমার জীবনের হিসাবের গরমিল দেখতে পেলাম। অঙ্কের উত্তর মেলাতে পারছি কৈ? মহারাজ হয়ত কিছু সূত্র সন্ধান দিতে পারবেন। আপাতত এই সাহায্যটুকু পেলেই তৃপ্ত হব।

অশ্বপতির চোখের ছটায় কৌতুকের ঝিলিক দিল। একটু হাসার চেষ্টা করলেন। অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা তাঁর স্বরে বাজল। বলল: ভারী মজা'ত!

দশরথ চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল! সত্যিই তাই।

অশ্বপতি গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার দিকে তাকাল। দশরথের মুখে রঙের ছোপ লাগল। চোখের তারায় নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছিল কৈকেয়ীর প্রদীপ্ত যৌবনরূপ। বুকের ভেতর বাজতে লাগল কৈকেয়ীর মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর। সুখের অনুভবে দশরথের চেতনা কেমন একটা অভিভুত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে রইল।

দেখতে দেখতে রথ রাজপ্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করল। সিংহদ্বার পেরিয়ে অতিথির গৃহ সংলগ্ন প্রাঙ্গনের সামনে দাঁড়াল।

'অশ্বপতি দশরথকে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে কক্ষে হাজির করে দিল। ঐ সামান্য পথটুকু অতিক্রম করার সময় দশরথের বুকের উপর দুরন্ত ঝড় বয়ে গেল। উপকূলের বুকে আছড়ে পড়া ঝড়ের মত অশান্ত অবস্থা তার। এই মুহূর্তে তার কর্তব্য কি, ভেবে স্থির করতে পারছিল না। কেমন করে কথাগুলো শুরু করবে? কি করলে সব দিক রক্ষা হয়, তার কথা চিন্তা করে আকুল হল। বিভ্রান্ত অসহায়-তাবোধে তার পা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, পায়ের নীচে মৃদু ভূকম্পন হচ্ছে। আসলে হৃদয়ের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন হচ্ছিল।

কথা বলতে গিয়ে গলা শুকিয়ে গেল। জিভ দিয়ে শুকনো জোড়া লাল ঠোঁট দুটো ভেজানোর চেষ্টা করল। কিন্তু জিভও তার অস্বাভাবিক শুকনো। ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল, প্রদীপ শিখার মত কাঁপছিল জ্বলজ্বলে চোখের চাহনি। কেমন একটা অসহায় আর্তি ফুটে উঠেছিল সেখানে।

অশ্বপতি স্থির দৃষ্টিতে দশরথের হাবভাব লক্ষ্য করল। তারপর দেয়ালের ছবি-গুলো একটা একটা করে খুঁটিয়ে দেখল। উদ্দেশ্য দশরথের অসমাপ্ত মনের কথা শোনা। সেজন্য মনেতে তাঁর অধীর ব্যাগ্রতা। কিন্তু ঘুণাক্ষরে তাঁর মনের ভাব দশরথকে বুঝতে দিলেন না। এধার ওধার করে আরাম কেদারায় উপবেশন করলেন।

বেল, জুঁই ফুলের গন্ধে সাজানো ঘর মাতাল হয়েছিল। সেই মাদকতাময় ঘরে হাঁটুর উপর পা তুলে দিয়ে শিকারীর মত তীক্ষ্ন চোখ মেলে দশরথকে দেখতে লাগল। মুখের অভিব্যক্তিতে তাঁর একটা হাসি হাসি ভাব। চোখে চোখ পড়তে দশরথ হাসল অপ্রতিভের মত। জড়তা এবং ভয় দূর হল। অসংকোচে বলল ঃ মহামান্য অশ্বপতি, বাইরে দেখে মানুষের অন্তরের সব পরিচয় আঁচ করা যায় না। আমার বুকের ভেতর লুকোন কান্নার কন্ঠস্বর হঠাৎ হর-পার্বতীর মন্দিরে বুক চিরে বেরিয়ে এল। সেই প্রথম অনুভব করলাম, অন্তরে কী ভীষণ রিক্ত আমি! আমার শূন্যতা আমাকেই ব্যঙ্গ করল। অথচ, কি আর বয়স হয়েছে আমার? যৌবনসীমা উত্তীর্ণ করলেও আমি এখনও অমিত বীর্যসম্পন্ন পুরুষ সিংহ। দেহে তারুণ্যের দীপ্তি, বুকে সাগরের উচ্ছ্বাস। আঁখির কটাক্ষে মদনের মোহনধনু, কণ্ঠে কোকিলের প্রগলভতা, হৃদয়ে ঝিল্লীর ধ্বনি। এসব অনুভবের কথা। একে ব্যাখ্যা কিংবা বিশ্লেষণ করা দায়।

দশরথের অকারণ আবেগের কোন উত্তর অশ্বপতির জানা ছিল না। প্রয়োজন থেকে আলাদা করে নেয়া এইসব কথার অর্থ তাঁর মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগাল। মানুষের মন এক অদ্ভুত চিত্রকর। চেনা মুহূর্তগুলির এক আশ্চর্য সুন্দর ছবি সে মনের পটে ফুটিয়ে তোলে। কত অদ্ভুত ঘটনার বিস্ময়কর কল্পিত দৃশ্য সে সব বিশেষ অবস্থার বিশেষ মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষের এই রকম একটা ভাবাবেশের সৃষ্টি হয়। এটা তার অন্তরের গোপন দুঃখের অথবা গোপন সুখের অনুভূতি থেকে হয়। দশরথও সেরকম কোন দুঃখ বা সুখের অনুভূতি বলতে ব্যগ্র বলে মনে হল অশ্বপতির। তাই কথা বলার সময় তার চোখ মুখের এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেল। চোখের দৃষ্টি সুদূর, নয়নের রূপ সুন্দর, কণ্ঠের স্বর মধুর আর ভরাট।

অশ্বপতি কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বিভ্রান্ত স্বরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন ঃ মাঝে মাঝে সব মানুষ কেমন যেন দার্শনিক হয়ে যায়। এই অকারণ বিহ্বলতা তার মনের বিলাস।

দশরথের বিস্ফারিত চোখের তারা দুটি অশ্বপতির চোখের তারায় স্থির হল। মনের ভেতর অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কার্যকারণ কথার প্রতিক্রিয়ার একটা ঝড় বয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তার বাহ্যচেতনা লুপ্ত ছিল। মনের গভীরে ডুবে গিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে বেশ কয়েকবার মাথা নাড়ল। আস্তে আস্তে সম্মোহিতের মত গভীর গলায় বলল ঃ মহামতি অশ্বপতি। এ এক অন্য অনুভূতি। নিজেকে বড় একা, নিঃসঙ্গ মনে হয়। নিরানন্দ জীবনের অর্থ কি? বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না! কেন, এরকম মনে হয় বলতে পারেন? কেন নিজেকে একা আর দুঃখী লাগে?

অশ্বপতি বিব্রতবোধ করল। হঠাৎ একটু দিশাহারা বোধ করে চুপ করে রইল। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল ঃ এ প্রশ্নের জবাব আমি আর কি দেব? কতটুকু বা জানি? ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং নিকট আত্মীয় ছাড়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করা শক্ত।

দশরথের চোখে ব্যথা ঘনাল। কণ্ঠস্বরে মিনতি ঝরল। বলল ঃ তবু, আপনি বলুন। নিজেকে আমার কেন এত একা লাগে? কেন, মনে হচ্ছে কেউ নেই আমার কাছে?

অশ্বপতির কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হল। নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করলেন অশ্বপতি। কেন; আপনি জানেন না?

না, কেবল মনে হচ্ছে প্রগাঢ় যন্ত্রণা আমার বুকের মধ্যে থাবা গেড়ে বসেছে।

অশ্বপতি দশরথকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শান্ত ভাবলেশহীন দুই চোখে তার অদ্ভুত প্রশ্ন। দ্বিধায় ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। বিব্রত স্বরে বলল ঃ মহারাজ, আপনার এই অনুভূতির মধ্যে কোন গভীর দার্শনিকতা নেই। প্রবৃত্তির ক্ষুধা নিবৃত্ত না হওয়ার যন্ত্রণাই আপনাকে এমন অন্যমনা এবং চঞ্চল করে তুলেছে। পুত্রহীনতার দুঃখ আপনার এই একাকীত্ববোধ ও পরিজনহীনতাবোধের জন্য দায়ী। আপনার ভার্যা আছে, রাজ্য ঐশ্বর্য আছে, কেবল নেই তার উত্তরাধিকার। তাই, এই সুতীব্র যন্ত্রণা। অর্থ ঐশ্চর্য, আরাম, বিলাস, ব্যসন, খ্যাতি মানুষের বহিরঙ্গকে ভরিয়ে রাখে কিন্তু অন্তরে সে দীন হতে দীন।

দশরথ অবাক স্বরে প্রশ্ন করল ঃ এসব আপনি কেন বলছেন?

মহারাজ আপনার স্পর্শকাতর ও সযত্ন গোপন স্থানটির সন্ধান করে আমি যা অনুভব করছি, তাই আপনাকে বললাম। পুত্রহীনতার কষ্ট আপনাকে এই যন্ত্রণা দিচ্ছে। মানুষের জীবনে যত দুঃখ এবং যন্ত্রণা তার উৎপত্তির উৎস প্রবৃত্তির গভীরে। অক্ষমতা ব্যর্থতার সঙ্গে দুরন্ত ইচ্ছার বিরোধ যন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে উঠে। প্রতিরোধের প্রাচীর যখন ভেঙে পড়ে তখন ব্যক্তিত্বের অন্তরালে মনের এই ক্ষয় চলে। মানুষ পশুর মত জীবদেহ সর্বস্ব নয়। সন্তান সন্ততির মধ্যে সে তার বংশধারা রক্ষা করতে চায়।

তাই প্রত্যেক নারী ও পুরুষ সন্তান চায়। সন্তান তার প্রতীক। মৃত্যুর পরেও যে তাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি বহন করে নিয়ে যাবে আর এককালে। এই ভাবে ব্যক্তি তার সন্তানের ভেতর দিয়ে নতুন করে বেঁচে উঠে—সমাজ, ধর্ম, পরিবারকে প্রাণের শক্তি দান করে। এইখানেই তার জীবনের সার্থক জয়যাত্রা। সেই যাত্রা পথের যখন বিঘ্ন ঘটে তখন মানুষের মনের গভীরে শ্মশানের চিতা জ্বলে। পুত্রহীনতার দুঃখ আপনার এই একাকীত্ববোধ ও পরিজনহীনতাবোধের জন্যে দায়ী। ভার্যা, রাজ্য, ঐশ্বর্য, ধন সম্পদ কোন কিছুর অভাব আপনার নেই তবু মন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। তাই এই বিলাপ।

দশরথ গম্ভীর হল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। তারপর বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ধীরে ধীরে বলল ঃ মহামতি অশ্বপতি এসব কথা এত গভীর করে কোনদিন স্থির চিত্তে ভাবিনি। আজ মনে হচ্ছে, ক্ষুধার্ত প্রবৃত্তি তার শিকারকে গ্রাসের সম্মুখে রেখে বসে আছে। সংকোচে আহার করতে পারছে না। যদিও হিংস্র থাবা মেলে প্রবৃত্তি গ্রাস করতে চাইছে তাকে। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম কুণ্ঠা সৌজন্য বোধের বাধা কাটিয়ে উঠতে না পারায় তীব্র যন্ত্রণা তার স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ছে।

অশ্বপতি কোন কিছু না ভেবেই বলল ঃ মহারাজ, ক্ষুধার আকর্ষণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতি অনুমোদিত। সন্তান ক্ষুধা মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা আবেগবান বৃত্তি। জীবনের নতুন অঙ্গীকার নিয়ে চলার পথে একধাপ এগিয়ে যায় মানুষ, মানুষের সমাজ। বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার তাগিদে আপন প্রাণশক্তিতে দুর্দমনীয় হয়ে সে সৃষ্টি করে, নতুন হয়ে গড়ে উঠে আপন সন্তানের মধ্যে। সৃষ্টির এই আবেগ শুধু দেহগত নয় মনোগতও বটে।

অশ্বপতির কথা শুনতে শুনতে দশরথের তনু মন রোমাঞ্চিত হল। সৃষ্টিতত্ত্বের এবং শরীর তত্ত্বের এই অদ্ভুত নিয়মটা সে জানত না বলে আশ্চর্য হল। অশ্বপতির কথা থেকে প্রথম অনুভব করল জীবনধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজন সে রকম প্রকৃতি তার সৃষ্টি রক্ষার স্বার্থে জীবের মধ্যে যৌন আবেগের আকর্ষণকে দুর্জয় করে তুলেছে। কিন্তু সব ভুলে যাওয়া ডুবে যাওয়া আনন্দ স্বাদের মধ্যে সন্তান সৃষ্টির এষণার চেয়েও একটা দুর্লভ অব্যক্ত দৈহিক আনন্দ, সুখ ও অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও উত্তেজনা পাওয়ার জন্যে মানুষ মিথুনাসক্ত হয়। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আনন্দ উত্তেজনাতেই দশরথ নারী চেয়েছে এবং পেয়েছে। কিন্তু অশ্বপতি হঠাৎ তার সব হিসেব এবং ধ্যান জ্ঞান ওলোট-পালোট করে দিল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ধীরে ধীরে সে প্রশ্ন করল ঃ মহান রাজা অশ্বপতি, আমার বিকল চিত্তের উৎস তা-হলে নারী। নারীর মধুর সাহচর্য আমাকে সন্তানের জনক করবে, মনের কষ্ট লাঘব করবে, আমায় পরিপূর্ণতা দেবে। উত্তরকালের বুকে আমার চিরচিহ্ন যে এঁকে রাখবে তাকে কেমন করে পাব আমি ? আপনার কাছেই বা কিরকম সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি ?

বলতে বলতে দশরথের দুই চোখের দৃষ্টি দীপ্ত হল। মুখে খুশির ঝলক

লাগল। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসির ধার তার ব্যক্তিত্বকে বিশিষ্ট করে তুলল। অশান্ত তৃষ্ণা তার সব সংযম ভাসিয়ে দিল। কৈকেয়ীর মুগ্ধতা তাকে প্রগলভ করল। নিজের সঙ্গে কৌতুক করে বলল ঃ আঁখির কটাক্ষে মদনের মোহনধনুর নিশানা এখনও অব্যর্থ। পাহাড়ী ঝর্ণার উচ্ছল তারুণ্য আমার সর্বশরীরে ক্রীড়া করে। বক্ষে আমার মত্ত মধুপেব প্রেমের গুঞ্জন। শরতের টলটলে জলাশয়ের মত ঢল ঢল আমার রূপ যৌবন। এখনো দাদুরীর আচমকা ডাকে আমার হৃদয় উতলা হয়। মুগ্ধতা প্রত্যাশার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়। আশা জাগায়। তৃষ্ণা জাগিয়ে দেয় আকণ্ঠ।

দশরথের সারা মুখে আবেগের অভিব্যক্তি। কথাগুলি অসংলগ্ন। প্রকাশের ভাষা প্রলাপের মত। আসলে কিসের একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব অনতিক্রমনীয় বাধার মত তাব কণ্ঠরোধ করেছিল। তাই এক চিরজিজ্ঞাসার কাছে সে উৎকর্ণ, বোবা।

অশ্বপতি চমকাল। চোখে তাঁর সন্দেহ এবং অনুসন্ধিৎসা। মুখে আতঙ্কের ছায়া। ঘটনার আকস্মিকতা অনেকটা মেঘে ঢাকা ছায়ার মত মনের দিগন্ত জুড়ে রইল। প্রকৃতপক্ষে, কৈকেয়ী সম্পর্কিত এক অজ্ঞাত ভাবনা তাঁকে বিমর্ষ করল। তাই, দশরথের কথায় কোন জবাব দিলেন না। নিজের বিমর্ষ চিন্তায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে দেখলেন দশরথের মুখ।

নীরবতা অনেক সময় বার্তা থেকে তীব্র এবং গভীর। অশ্বপতির বিহ্বল বিভ্রান্ত নিবিড় দৃষ্টি দশরথের অনুভূতিতে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তা যেন এক ধাক্কায় মনের গভীরে অটল বাধার প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বলতে তার কোন কুণ্ঠা হল না। দশরথের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। বলল ঃ রাজকন্যা কৈকেয়ীকে দেখা থেকে মন আমার উতলা হয়েছে। কেকয় রাজ্যের মাটি থেকে আমি নির্মল সুন্দর এই মুক্তোটি কেড়ে নিয়ে আমার প্রেমের মালা গাঁথব। আমার প্রার্থনা পূরণ করে কৃতার্থ করুন। কেকয় রাজ্যের সঙ্গে অযোধ্যার আত্মীয়তা, রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ চমকের মত চমকাল অশ্বপতি। দুই চোখে তার ক্রোধ ঝিলিক দিল। প্রায় আর্তস্বরে প্রতিবাদ করে বলল ঃ অসম্ভব !

নির্বিকার কণ্ঠে দশরথ প্রশ্ন করল—কেন ? বাধা কোথায়, ?

অশ্বপাত বললেন ঃ বর্ণে গোত্রে আমরা এক নই। আমাদের বিবাদ আজন্ম।

এ হল ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ। আসলে আমরা কশ্যপের বংশধর। বিভেদ কলহ শুধু বাইরের ঘটনা। বার মহল ছেড়ে ভিতর মহলে ঢুকলে এই সব তুচ্ছ মান অভিমানের জটিলতা আর থাকবে না।

তবু পারি না।

মহান অশ্বপতি, দশরথ তার পাওনাকে কখন ভিক্ষে করে না। তবু প্রেমবশে হাত পেতে যে যা চাইল তা থেকে যদি বঞ্চিত হয় তা হলে বীর্যের গর্বে, পাশব পৌরুষবলে তাকে অধিকার করে। কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নেই। আমি জানি, অতিথিবৎসল রাজা, অতিথির সুখ ও তৃপ্তির জন্য নিজ কন্যাকে যখন তার আপ্যায়নে

নিযুক্ত করেছেন, তখন অতিথির প্রার্থনা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে অনর্থক তার আতিথ্যের অপমান করবেন না। এতে কেকয়রাজ্যের সুনাম ও সুযশ হানি হবে। অযোধ্যাপতির দাবিকে ভাগ্যের পরম প্রসাদ বলে মনে করা উচিত। রাজনৈতিক প্রয়োজনে কেকয় এবং অযোধ্যার মধ্যে একটা স্থায়ী সম্বন্ধ গড়ে ওঠা আবশ্যক। আত্মীয়তার সেই সুযোগও অযাচিতভাবে আমরা পেয়েছি।

দশরথের নরম গরম মেশানো ভাষণে অশ্বপতি বিস্ময়ে হতবাক হল। অপলক দুটি চোখে তাঁর মুগ্ধতা নামল। শান্ত গলায় বললেন: কৈকেয়ী কিশোরী। অপরিণত বালিকা।

শিশুকাল থেকে নারীজাতি জননী, গৃহিণী, প্রণয়িণী, প্রিয়ভাষিণী, সেবা পরায়ণা। নারীর সব লক্ষণগুলি কৈকেয়ীর দেহে মনে পরিস্ফুট। আমি চাই তার মন, প্রাণ, আত্মাকে। তার সান্নিধ্য আমাকে দুদণ্ডের শান্তি দিয়েছিল।

অশ্বপতি স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দশরথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। নিঃশব্দ কিছুমুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই সময়টুকুতে অশ্বপতির মস্তিকের মধ্যে অনেকগুলো কথা একসঙ্গে জেগে উঠল। দশরথের এই আবেগ তার মুগ্ধতা থেকে সঞ্চারিত। আবেগের নির্ঝরিণীতে তার মন প্রাণ প্লাবিত। কৈকেয়ীর রূপের ঝলক লেগে তার চোখ মন ধাঁধিয়ে রয়েছে। ভাল-মন্দ বিচারবোধ লুপ্ত হয়েছে। মুগ্ধতার আবেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ও পরিস্থিতির বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তনের জন্যে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—মহারাজ অজপুত্র যদি একান্তই আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হন, তা-হলে কুলপ্রথানুসারে আপনাকে কতকগুলি শর্ত পালন করতে হবে। আপনি রাজি হলেই তবে এই বিবাহ অনুমোদন করা যেতে পারে।

কি সে শর্ত?

প্রতিশ্রুতি ছাড়া তা বলা সম্ভব নয় অযোধ্যাপতি নেমি।*

দশরথ মুহূর্তের জন্যে থমকাল। পরক্ষণেই মুগ্ধতার আবেশের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে তার মনে হল কৈকেয়ীর জন্য সে সব করতে পারে। তাকে অদেয় কিছু নেই। শর্ত যত কঠিন হোক প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় তাকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। এর সঙ্গে তার নিজস্ব মর্যাদা এবং অনুরাগের সততা জড়িয়ে আছে। এই অনুভূতি তার মনে গাঢ়তর হল। অমনি সংকল্প জাগল। চোখের অপলক স্থির দৃষ্টিতে মুগ্ধ আবেগের রঙের ঔজ্জ্বল্য ঝলকিয়ে উঠল। চিন্তাহীন বিভ্রমে অশ্বপতি কথার প্রতিধ্বনি করে বলল: প্রতিশ্রুতি দিলাম।

অশ্বপতির মুখে বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল। শান্ত গলায় বলল: মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে গঙ্গাজল স্পর্শ করে অঙ্গীকার করতে হবে।

আমি প্রস্তুত। নির্বিকারভাবে বলল দশরথ।

শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে দশরথ অঙ্গীকার করল। পুরোহিতের সঙ্গে যন্ত্রবৎ উচ্চার

* (দশরথের অন্য এক নাম)

করল, কেকয়রাজের শর্ত মেনে কৈকেয়ীর পাণি গ্রহণ করব। অন্যথায় কৈকেয়ীর উপর কোন দাবি রাখব না। এমন কি বীর্যগর্বে পাশব শক্তিবলে তাকে অধিকার করব না। কখনও তার শত্রুতা করব না, শত্রুর চোখেও দেখব না।

শপথ শেষ হলে অনেকটা স্বপ্ন দেখার মত দুটি বিস্মিত সলাজ চোখে দশরথ অশ্বপতির দিকে তাকাল। অশ্বপতি ভুরু কোঁচকাল। গম্ভীর স্বরে বলল: অপরাধ মার্জনা করবেন। পঞ্চদশী কৈকেয়ীর সঙ্গে আপনার বয়সের ব্যবধান চিন্তা করেই শর্তগুলো আমাকে আরোপ করতে হচ্ছে। আমি পিতা। সব পিতাই কন্যার সুখ, শান্তি, সমাদর এবং নিরাপত্তার লক্ষ্য রেখে পাত্র নির্বাচন করে। আমিও তাদের ব্যতিক্রম নই। বহুপত্নীক অযোধ্যাপতির অন্যান্য রাণীদের মধ্যে কৈকেয়ী বোধ করি সর্বকনিষ্ঠা। স্বভাবতই তার কর্তৃত্ব উপেক্ষিত ও অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল অথবা রাজপ্রাসাদের অন্যান্য রাণী ও রমণীর ঈর্ষার পাত্র হবে সে। কৈকেয়ীকে তাদের ঈর্ষাধন্য হয়ে বাস করতে হবে। রাজ অন্তঃপুরে সে যাতে মর্যাদার সঙ্গে নিজের কর্তৃত্বে এবং অধিকারের জোরে বাস করতে পারে সে জন্যে কতকগুলো অতিসাধারণ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে মহারাজকে। শর্ত পালন করা না করা মহারাজের অভিরুচি। তবে, শপথের মধ্যবর্তী হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বর থাকলে সত্য রক্ষায় মহারাজ অবিচল থাকবে। এটাই বিশ্বাস আর কি!

দশরথের অধরে হাসি হাসি ভাব। নিজের অজ্ঞাতেই একটা আবেগ অনুভব করে বলল: নিশ্চয়ই।

অশ্বপতি মুখ টিপে হাসলেন। কিন্তু চোখের চাহনিতে তাঁর বিস্মিত জিজ্ঞাসা। কৈকেয়ীর জন্যে দশরথ সব কিছু করতে প্রস্তুত। এই সব ঘটনায় তার সঠিক ভূমিকা কি অশ্বপতি বুঝতে পারলেন না। দশরথের এত উন্মত্ততা কি জন্য? কোন নিষেধ সে শুনতে চায় না, কেন? এই কেন'র কোন উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না। উদ্বেগাকুল দংশনে সে বলল: অজপুত্র নেমি সত্যিই যদি আমার জামাতা হতে চাও তাহলে কেকেয়ীকে প্রধানা মহিষীর সম্মান দিতে হবে।* যদি কোন পুত্র সন্তান তার জন্মে তাহলে অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে সে। আর কারো দাবি গ্রাহ্য হবে না। অগ্রজ হলেও না। কৈকেয়ীর পুত্রের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে

Kaike i was the youngest and fairest wife of Dasarath. Fasciwated by her charms, he had solicited her hand at a fairly advanced age, though he had already two wives still alive and in the prime of life. Her father, King of Kekaya had accepted his proposal only on two conditions :-Firstly, the right of succession to the throne must discend to her son, whatever the taw of the country or the tradition of the family might say on the point; Secondly, if any or both of his first two queens attained to motherhood hereafter, whichever was the legar heir should be publicly disinherited. . But Dasarath made it for the sake of Kaikeyi.—p. 57

প্রসিদ্ধ রামায়ণ টীকাকার তিলক (ইনি বালগঙ্গাধর, তিলক নন) দশরথের প্রতিজ্ঞাপ্রসঙ্গে লিখেছেন: "তব পুত্রাং যো জনিষ্যতে তস্মৈ রাজ্যং প্রদাস্যামীতি প্রতিজ্ঞাবান্ ইত্যর্থঃ।"

প্রতিকূলচারী পুত্রদের নির্বাসনে পাঠাতে হবে। এই শর্তগুলি পালনে সম্মত হলে কৈকেয়ী আপনার ভার্যা হতে পারে।

শর্তের কথা শুনে দশরথ স্তম্ভিত। তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। কিন্তু কৈকেয়ীর নিষ্পাপ সরল সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানির অনির্বচনীয় লালিত্য ও মাধুর্য তার চোখের তারায় ভেসে উঠল। তার সমস্ত ভাবনা চিন্তার মধ্যে এই কথাগুলো কাঁটার মত বিঁধল। মনে হল, কৈকেয়ীর প্রসঙ্গে ইতি টেনে দেবার জন্যেই অশ্বপতি এই কৌশল করেছে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি প্রয়োগ করে অশ্বপতি দশরথের অসন্তোষ যেমন এড়ালেন তেমনি কৈকেয়ীকে বধূরূপে পাওয়ার অন্তরায় এক সৃষ্টি করলেন। অশ্বপতির এ এক বিচিত্র রাজনীতি। আপন কন্যাকে এ কোন ভয়ংকর রাজনীতি দাবা খেলায় তিনি নিয়ে এলেন? একি তাঁর ক্ষমতা দখলের লড়াই? অথবা প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা? সেই মুহূর্তে নানাবিধ জটিল প্রশ্নে দশরথের চিত্ত ভারাক্রান্ত হল।

অশ্বপতির এই ভীষণ প্রস্তাব মানতে গেলে নীতির দিক থেকে তাকে দেউলে হতে হবে। অশ্বপতি এ রকম একটা শক্ত শর্তের মারপ্যাঁচে ফেলে সে তার দুর্বার বাসনার গতিরোধ করবে, দশরথ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। এখন শর্ত মেনেই কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অশ্বপতির কূট কৌশল ব্যর্থ করার কোন রন্ধ্রপথ নেই। শর্তগুলো স্বীকার করা কোন দুরূহ ব্যাপার নয়। কেবল আত্মসম্ভ্রমের একটা প্রশ্ন ছিল। নিজের কাছে ছোট হওয়ার লজ্জায়, কষ্টে বুকের ভেতর চিন্‌চিন্‌ করছিল। প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় পরাজয়ের এই গ্লানিটুকু তাকে ভোগ করতে হবে। এ তার প্রয়োজনের পরাজয়। প্রকৃতপক্ষে এ পরাজয়ের ভেতর তার নিজেব ও অযোধ্যার মঙ্গল দেখতে পেল। এমনিতে তার কোন সন্তান নেই। কৈকেয়ী পুত্রবতী হয়ে যদি ইক্ষ্বাকু বংশের উত্তরাধিকারীর সমস্যা মীমাংসা করে তা-হলে সে তার সৌভাগ্য। অযোধ্যায় সিংহাসনে সেই হবে একমাত্র উত্তরাধিকার। সুতরাং অশ্বপতির প্রধান শর্তটি মানতে তার কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। অদৃষ্টই হয়ত তার অজান্তে জনকত্ব লাভের এই আয়োজন গোপনে করল। অশ্বপতি এখানে নিমিত্ত। পুত্রহীনতার ব্যথা অনুভূতি দশরথের বুকে নিদারুণ হয়ে উঠল। বন্ধ্যাত্বের জন্যে কৌশল্যা, সুমিত্রা সংসারধর্ম এক রকম পরিত্যাগ করেছে। দিবারাত্রির বেশির ভাগ সময় পূজার্চনা নিয়ে কাটায়। তার সঙ্গে রাণীদের সম্পর্কও অত্যন্ত শীতল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আর নিজের গোপন দুঃখ ভুলে থাকার জন্যে মৃগয়া এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনা নিয়ে সর্বক্ষণ মেতে থাকে। কিন্তু এ যে জীবন নয়, জীবনের প্রতারণা দশরথ তা অনুভব করে। একটি সন্তানের অভাবে অযোধ্যার সব শ্রী যেন অন্তর্হিত হয়েছে। অশ্বপতির কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে অযোধ্যার শ্রী ফিরে পাওয়া সম্ভব। কেকেয়ী তার জীবনে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হতে পারে। দশরথের মনের আকাশে যে মেঘ জমেছিল, তা একটু একটু করে ফিকে হয়ে গেল। লোভ, স্বার্থপরতা, কর্তব্য হীনতার কথা ভেবে সে একটু ভয় পেয়ে ছিল যা। এখন আর কোন দুর্ভাবনা

নেই। মনে মনে স্থির করেই ফেলল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার পর দশরথ ধীরে ধীরে বলল: আপনার প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েই আমি কেকেয়ীকে চাই। তাকে সমাদরেই রাখব আমি। রাজমহিষীর মর্যাদা দেব। তার পুত্রই অযোধ্যার রাজা হবে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে আমি তিন সত্যি করছি। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এই প্রতিশ্রুতির কথা জানবে না।

অশ্বপতি চমকালো। অভিভূত আচ্ছন্নতায় প্রস্তরীভূত অবস্থা তাঁর। দশরথের চোখে নীরব বিস্মিত চোখ রেখে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত বিড় বিড় করলেন। অশ্বপতি বললেন: প্রতিশ্রুতি দিলাম, অন্য কেউ জানতে পারবে না।

সাফল্যের গৌরবদীপ্ত দশরথের চোখে মুখে উজ্জ্বল হল। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। হাসি হাসি মুখে কৌতুক ভাব। ধীরে ধীরে বলল: এবার আমার কিছু বক্তব্য আছে।

বক্তব্য! বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না অশ্বপতির। অঙ্গীকার বদ্ধ দশরথের কোন প্রশ্ন কিংবা কোন দাবী থাকতে পারে অশ্বপতি ভাবতে পারেননি। ভেবেছিলেন ভাগ্যের স্রোত তাঁর দিকে বইছে। উচ্চাশার সিঁড়িগুলো একটা একটা করে উঠেছেন তিনি, সেই সিঁড়ি দশরথ তাঁর কাছ থেকে কৌশলে সরিয়ে নিচ্ছে মনে করে অসহিষ্ণু উত্তেজনায় অস্থির হলেন। মনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়াশীল হল। ত্রস্ত ব্যাকুলতায় প্রশ্ন করলেন: একবাব অঙ্গীকারের পর আর কোন শর্ত থাকে না।

দশরথের দুই চোখে কৌতুক অধরে মধুর হাসি। মৃদুস্বরে বলল: শর্ত! শর্তের কথা বলব কেন?

তেমনি ব্যস্ততার সঙ্গে অশ্বপতি বললেন: শর্তের কথা যদি ঘুরিয়ে হয়। তা-হলে মানব না।

দশরথ নম্র কণ্ঠে বলল: আশ্চর্য লোক আপনি। এত দাবি পূরণ করেও আপনার মন পেলাম না। আপনার সব দাবি পূরণ করেছি। প্রেমের জন্যে আমি কি-না করেছি, আপনি আমাকে দিয়ে দাসখৎ লিখে নিয়েছেন, তবু আপত্তি করিনি। কিন্তু এখনও আপনার মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আশঙ্কা। কেন?

অশ্বপতি নম্রহাসির সঙ্গে বললেন: জাত, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক গোষ্ঠী এসব বিভিন্নতার জন্যেই একটা পরিষ্কার বোঝা-পড়া, ও আন্তরিক দীর্ঘস্থায়ী করতে আমার এই উৎকণ্ঠা। আর্যদের রহস্যময় রাজনীতির খেলায় আমরা ঠকেছি, বারং বার হেরেছি, আবার কষ্ট করে জিতেছি। জোর করে নিজেদের দাবি ও অধিকার কায়েম করেছি।

কিন্তু আমিও চাই আপনার কাছ থেকে সহযোগিতার অঙ্গীকার। আমি যেমন আপনার সব কিছু মেনে নিয়েছি, আপনারও উচিত হবে আমার মান-সম্মান পুরো-পুরি বাঁচানো।

বর্তমানে আপনার ভূমিকা একেবারেই বুঝতে পারছি না।

না বোঝার মত কিছু নেই। শর্ত নয়, আপনার পূর্ণ সহযোগিতা।

তারপর হাসি হাসি মুখ করে দশরথ বলল ঃ আমার মান-সম্মান সবত আপনাকে সঁপে দিয়েছি। আপশোষের কাবণ না হয় এমন কিছু করুন।

সহসা হৃষ্ট হয়ে অশ্বপতি বললেন ঃ বেশ, আমিও অঙ্গীকার করছি সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করব না।

অশ্বপতির কণ্ঠের শেষ রেশটুকু সারা কক্ষেই যেন ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়ার আগে দশরথের ওষ্ঠে এক অনির্বচনীয় হাসি ফুটল। রাজনৈতিক চালে যে অশ্বপতি বাধা পড়েছে, এ অনুভূতি তার ছিল না। মানুষের মনের গতি, অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করার একটা সহজাত ক্ষমতা তার ছিল। তাই প্রেম ও কর্তব্যবোধের যে সংকট সৃষ্টি হল তার আশু মীমাংসার জন্য বিবাহকে ত্বরান্বিত ও দ্রুত করার প্রয়োজন তীব্র হল। এই বিবাহ দশরথের কাছে খুবই জরুরী এবং রাজনৈতিক।

কৈকেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাবর্তের যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা তার। এক ঢিলে দুই-পাখী মারার কৌশল আর কি! কেকয় রাজকন্যা দশরথের প্রিয়তমা মহিষী হয়ে তার সঙ্গে রথে অবস্থান করছে জানলে দস্যু শম্বর আশ্চর্য হবে। প্রিয়বন্ধু অশ্বপতির স্বার্থে, লোভে প্রভুত্ব আকাংখায় তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, একথা জানলে, সে ভীষণ হতাশ হবে। তার মনোবল ভেঙে পড়বে। ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে তার মন যত পুড়বে তত যুদ্ধে দিশাহারা হবে সে। তাকে পরাজিত করা তখন আর কঠিন হবে না। তা-ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেকে প্রদর্শন করার একটা সুযোগও সে পাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরেরা সুন্দর। সেখানেই তারা শৌর্য, বীর্য, দীপ্ত ব্যক্তিত্ব, তেজ সাহস পৌরুষ বেশি করে প্রদর্শন করে। ব্রহ্মাবর্তের যুদ্ধে পঞ্চদশী কৈকেয়ী তাকে বেশি করে পরিমাপ করতে পারবে! আর তাতেই তার প্রতি কৈকেয়ীর ভালবাসা দ্বিগুণ হবে। আসক্তি তীব্র হবে।

এইরকম একটা অনুভূতির তাড়না তাকে নেশার মত পেয়ে বসল। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে বলল ঃ এক প্রহরের মধ্যে হরপার্বতীর মন্দিরে কৈকেয়ীর সঙ্গে আমার বিবাহ সম্পন্ন করার সব আয়োজন করুন। প্রহরান্তে আমার ব্রহ্মাবর্তে যাত্রা করতে হবে। কৈকেয়ী আমার সহযাত্রিনী হবে। প্রিয়তমা মহিষীরূপে সর্বদা আমার পাশে পাশে থাকবে। আমার লক্ষ্যের ধ্রুবতারা হয়ে সে জ্বলবে।

সে কি? আকাশ থেকে পড়ল অশ্বপতি। বলল ঃ বিয়ে বললে কথা! না, না, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এত সত্বর কেমন করে সম্ভব? উঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে গোছের কথা বললে কি রাজকন্যার বিয়ে হয়?

দশরথের কণ্ঠস্বর জোরাল হল! বলল ঃ আপনি অঙ্গীকার বদ্ধ।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই! সামনে আমাদের দুরূহ সংকট। অযথা সময় অপচয় করব কোথা থেকে?

আমার আত্মীয়-পরিজন, প্রজা, বন্ধু, ছাড়া'ত এ বিয়ে হতে পারে না ?

কিন্তু দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ ভেরী আমাকে ডাকছে। বিপন্ন দেবতাদের উদ্ধারের জন্য আমাকে এখনই যেতে হবে। কৈকেয়ীও যাবে আমার সঙ্গে, থাকবে আমার পাশে। এর কোন নড়চড় হবে না আর।

শম্বর আমার বন্ধু। তার সাহায্যে আমি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

আমিও দেবতাদের কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। কৈকেয়ীর জন্যে যা যা করা দরকার তার সব আপনি অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। কৈকেয়ীর জন্যে আর কোন দাবি থাকতে পারে না। আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা-অসুবিধা মানতে আমি বাধ্য নই। এ জন্য নতুন কোন সর্তও আরোপ করা চলবে না। কৈকেয়ী আমার বাগদত্তা এখন। আপনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাকে কখনও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে উৎসাহিত করবেন না। এরকম প্ররোচনায় প্রতিজ্ঞা দুর্বল এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব আপনার অঙ্গীকার পালন করে সত্য রক্ষা করুন।

অশ্বপতির মুখে কথা সরে না। আয়ত চোখের কালো তারা অপলক স্থির স্নিগ্ধ হয়ে থাকে দশরথের চোখে। দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা নিবিড়, কিন্তু অনুসন্ধিৎসা গভীর। অশ্বপতিকে বেশ চিন্তিত ও বিপন্ন মনে হল। কথা যেন তার বুকের কাছে আটকে রইল। নিঃশ্বাসে তাই তীব্র ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। মুখের পেশীতে যন্ত্রণা কষ্ট। চোখের তারায় কি একটা বলতে না পারার অসহায়তা।

অশ্বপতির কাছে কৈকেয়ীর বিবাহ ছিল নিয়তির এক অমোঘ সংকেতের মত। আর দশরথকে মনে হয়েছিল কল্পতরু। দশরথের আকস্মিক প্রস্তর কঠিন দৃঢ়তা তার অনুমান ও সিদ্ধান্তের মধ্যে এক সংঘাত সূচনা করল। কিন্তু সাফল্যের গৌররতৃপ্তি দশরথের মুখের উপর, চোখের অপলক স্থির দৃষ্টিতে একপ্রস্থ রঙের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত করল। দশরথের ঐ মুহূর্তের অভিব্যক্তি তাকে অধিকতর সুন্দর করল। অশ্বপতি নিজেও মুগ্ধ অভিভূত হলেন। সম্মোহিতের মত ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। বললো ঃ উত্তম। তোমার অভিলাষ, আমার অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ করবে। কিন্তু সত্যরক্ষার নাম করে তুমি যে আমার কতখানি শত্রুতা করলে, এবং বিরূপ কলংকভাগী করলে তা তুমি চিন্তাও করতে পার না। এর দুঃখ অনুতাপ গ্লানি আমার মরলেও যাবে না।

হরপার্বতীর মন্দিরে খুব সংক্ষেপে বিনা আড়ম্বরে দশরথ কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করল। গুটিকয়েক গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজকর্মচারী এবং রাজপরিবারের লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না বিবাহ অনুষ্ঠানে।

সলাজ নম্র কম্পিত দুই-চোখে অনন্ত বিস্ময় নিয়ে কৈকেয়ী দশরথের দিকে তাকাল। দিব্যকান্ত তনু তার যৌবনের সৌন্দর্যে-সমুজ্জ্বল। অনিন্দ্যসুন্দর দীর্ঘ-দেহ অটুট

সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। হাল্কা গোলাপী রঙের পোষাক দশরথকে দর্শনীয় করে তুলেছে। তার বিশাল চেহারায় ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করে তুলেছে।

কৈকেয়ীর গভীর চাহনিতে কেমন একটা থমথমে ভাব। শান্ত সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টি দেবমন্দিরের বিস্তীর্ণ অলিন্দে প্রসারিত করে দিয়ে নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে গেল।

মেঘের অন্তরাল থেকে যে ভাবে বৃষ্টি ঝরে পড়ে, কৈকেয়ীর অবগুণ্ঠনে ঢাকা দুটি চোখ থেকে তেমনি ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। বিবাহকালে সব মেয়েরই পড়ে। তারপরেই আবার অশ্রু ভেজা মুখে ফুটে উঠে অদ্ভুত এক আনন্দের অভিব্যক্তি। জীবন রহস্যের সে কথা জানা সত্ত্বেও তীব্র-একটা অস্বস্তির কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হল দশরথের অন্তঃকরণ।

ধীরপদক্ষেপে কৈকেয়ীর হাত ধরে এগিয়ে চলল দশরথ। অজানিত একটা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। বাম হাতে ধরা কৈকেয়ীর ডান হাতখানা আরো কাছে টেনে নিয়ে তার দেহের ঘনিষ্ঠ হল। গায়ে গা লাগিয়ে তারা হাঁটছিল। বিশাল দেবভূমির প্রান্তসীমানায় অপেক্ষমান রথের কাছাকাছি হলে ক্ষীণ কণ্ঠে দশরথ অস্ফুটস্বরে বলল ঃ এস এখন আমার হাতে হাত রেখে ওঠ। পা তোল সাবধানে। আমি হব তোমার রথের সারথী।

কৈকেয়ী যন্ত্রচালিতের মত রথে উঠল। হাওয়ার বেগে ছুটল রথ। গিরি, বন, কানন নিমেষে দৃষ্টির অন্তরাল হতে লাগল। পশ্চাৎভাগ ধুলোয় আচ্ছন্ন হল। দৃশ্যের পর দৃশ্য সরে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন কিছুতেই মন ছিল না কৈকেয়ীর। জড়সড় হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল সে। তার চোখের তারাব বিষণ্ণ বেদনা থম থম করছিল।

পাশাপাশি দুই নদী শতদ্রু সরস্বতী যেখানে মিশেছে সেই মোহনার মাঝখানে এসে দাঁড়াল দশরথ। ইন্দ্রলোকের যাওয়ার ঐ রাস্তার মুখ অবরোধ করে আছে তিমিরধ্বজ। বিশাল সেনাবাহিনী সর্বক্ষণ সেখানে পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখ এড়িয়ে কিছু করার ছিল না। অতএব ইন্দ্রলোকে যাওয়ার পথ বন্ধ। অগত্যা সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না দশরথের। উদ্দেশ্য শম্বরের স্নায়ুর উপর কিছু চাপ বৃদ্ধি করা।

সৈন্যশিবির স্থাপনের জন্য এবং শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য নিকটের অরণ্য থেকে বড় বড় গাছ কেটে এনে কাঠের উঁচু প্রাচীর তৈরী করা হল। প্রাকার ভেদ করে বা ডিঙিয়ে এসে শম্বরের বর্বর সৈন্যেরা যাতে শিবিরে হামলা করতে না পারে সেজন্য প্রাকারের গায়ে গায়ে সৈন্যদের শিবির এবং সেনাপতিদের কক্ষ নির্মাণ করা হল। আর তার সামনে বেশ কিছুটা জায়গা খোলা রাখা হল, যাতে মুখোমুখি

ছোটখাট সংঘর্ষ সৈন্যরা করতে পারে। চতুর্দিক ঘেরা প্রাকারের মধ্যস্থলে দশরথ ও কৈকেয়ীর থাকার গৃহ নির্মিত হল। সৈন্যশিবির পাহারার সুবন্দোবস্ত করতে কোন ত্রুটি করল না সেনাপতিরা।

আরো উত্তরে শম্বরের সৈন্য শিবির। ইন্দ্রলোক অবরুদ্ধ করে রেখেছে অর্ধবৎসরের অধিককাল। দুরারোহ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর ইন্দ্রলোক অবস্থিত হওয়ায় সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ পেল না শম্বর। তাই চারদিক থেকে ইন্দ্রলোক অবরুদ্ধ করে তাদের আত্মসমপর্ণে বাধ্য করার নীতি নিয়েছিল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করে দিল। জমানো রসদ কতদিন ভোগ করবে? অস্ত্র, খাদ্যের অসুবিধা একদিন তাদের দেখা দেবেই। সেদিন তাদের প্রতিরোধেব শক্তি থাকবে কোথায়? শম্বর সেই দিনের প্রতীক্ষায় ছিল। এজন্য যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয় তবু করবে শম্বর। যতদিন ইন্দ্রের অমরাবতীর প্রাসাদ চুড়াটি মাটিতে ভেঙে পড়ে ততদিন এই প্রতীক্ষা করবে তারা।

তবু আত্মসমর্পণের পর্ব ত্বরান্বিত করার জন্যে শম্বর তার সৈন্যদলকে নির্দেশ দিল: চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রাম, নগর লোকালয়গুলির উপর হামলা করতে, অত্যাচারে উৎপীড়নে অধিবাসীদের জীবন জর্জরিত করে তুলতে। শম্বরের আদেশ সৈনিকদের বর্বর নিষ্ঠুর করে তুলল। দুর্বল নারীদের ধরে এনে তারা যৌন লালসা চরিতার্থ করল। পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করল। শিশুদের ক্রীতদাস করে রাখল। শম্বরের উৎপীড়ণ এখানে থামল না। ক্ষেত খামারগুলি পুড়িয়ে দেশে প্রবল খাদ্যাভাব সৃষ্টি করল। গ্রাম জ্বালিয়ে মানুষকে নিরাশ্রয় এবং গৃহহীন করল। জনপদ অবাধে লুটপাট করে তারা স্বদেশের ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলল।

অসহায় মানুষের দুর্বিষহ কান্না, বুকভাঙা বেদনা দশরথকে বিচলিত করল। তার বীররক্ত যুদ্ধের উম্মাদনায় নেচে উঠল। প্রতিবেশী দেশের নিরীহ প্রজাদের উপর শম্বরের পৈশাচিক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করা অধর্ম। ঘোরতর পাপ মনে হল। এতে অত্যাচারীর অত্যাচার প্রশ্রয় পায়। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা প্রকট হয়। এই ভাবে তার স্পর্ধাকে বাড়তে দেয়া কাপুরুষতা। সুতরাং স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে সে। কার্যতঃ এ পথে অসুরকে কখনো দমানো যাবে না। একমাত্র মুখোমুখি লড়াইয়ে বর্বরদের উচিত শিক্ষা হবে। তাই সমস্ত বীর আর সৈন্যদলকে জড়ো করে দশরথ বলল: দুর্গত, দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য তোমরা অস্ত্র তুলে নাও হাতে। অশ্ব, রথ সব প্রস্তুত কর। বীর কখন মরতে ভয় পায় না। সম্মুখ রণে মৃত্যু বীরের একান্ত কাম্য। শম্বরের সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড় তোমরা। অসহায়, দুর্গত বান্ধব রাষ্ট্রের প্রতিবেশীদের জীবন ও সম্পত্তি শম্বরের হাত থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত চলবে এই সংগ্রাম। যতক্ষণ না শম্বরের মৃত্যু হচ্ছে, তার সেনাবাহিনীর সমস্ত সৈন্যের ধ্বংস হচ্ছে ততক্ষণ চলবে এই যুদ্ধ। চুড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ থামব না। অসংখ্য প্রাণের মুল্যে আমাদের এ যুদ্ধে জিততে হবে—এই শপথ হবে আমাদের সকলের। আমৃত্যু আমিও যুদ্ধ করব

তোমাদের সাথে। যুদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ কর। বল ঃ জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।

দশরথের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ভেরী বেজে উঠল। সৈন্যেরা যে যার যুদ্ধের জন্য তৈরী হল। তারপর বন্যার স্রোতের মত তারা প্রাকার থেকে নির্গত হল।

শম্বরের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে দশরথ ভয়ঙ্কর ভাবে আহত হল। সেই রথে কৈকেয়ী ছিল তার সহযোগী। শুধু তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ক্ষিপ্রগতিতে রথ চালনার অসামান্য দক্ষতায় দশরথ সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচল।

রক্তে দশরথের শরীর ভিজে গিয়েছিল। ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। মুখের রঙ তার ফ্যাকাশে হল। দুই চোখ নিমীলিত। নিথর নিস্পন্দ দেহে প্রাণ আছে কি নেই বোঝা গেল না। বিশাল রথে সে মৃতবৎ শুয়েছিল। বুকের মৃদু ওঠা নামাতে তার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রকট হল। দশরথের এই অবস্থা কৈকেয়ীকে হতবুদ্ধি করল না। সাধারণ রমণীর মত নিজেকে সে অত্যন্ত বিপন্ন বা অসহায় ভাবল না। চিন্তা বা বিবর্ণ ভয়ে অস্থির হল না। ঠাণ্ডা মাথায় সে তার কর্তব্য স্থির করল। এক্ষুনি দশরথের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা আবশ্যক। তাকে অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেয়া দরকার। কিন্তু কে রথ চালাবে? রথের সারথীও ভীষণ জখম হয়েছে। হাত দুটি অকেজো হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় দেহ বেঁকে যাচ্ছে। কণ্ঠ দিয়ে একটানা কাতর স্বর বেরোচ্ছে।

শম্বরকে রথ নিয়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসতে দেখল। অমনি কেমন একটা খিল ধরা ভয়ে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বুকের ভেতর একটা আশ্চর্য সাহস নিজেকে সে শক্ত রাখতে চেষ্টা করল। সমস্ত মনোবল সংহত করে, মরীয়া হয়ে সে রথ চালাতে লাগল। বায়ুবেগে চলল রথ। শম্বরের সাধ্য ছিল না কৈকেয়ীর যন্ত্রচালিত রথের পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে।

শিবিরে বসবাসকালে দশরথ প্রেমবশে তাকে যন্ত্রচালিত রথ চালানোর কলাকৌশল দেখিয়েছিল এবং পাশে বসিয়ে রথ চালনা করতেও শিখিয়েছিল। কিন্তু সে শেখা যে এত ভাল হয়েছিল আগে জানার অবকাশ হয়নি কৈকেয়ীর। আর সে শেখা যে এ রকম করে কাজে লেগে যাবে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। সাফল্যের গৌরব তৃপ্তি তার মনে সুখ দিচ্ছিল।

কিন্তু এই অনুভূতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। একলহমার জন্যে মনে এসে মিলিয়ে গেল। চোখে তার যুদ্ধের দৃশ্যগুলো ভাসছিল। কত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দশরথ যুদ্ধ করছিল। চোখের পলক না পড়তে দশদিকে অনায়াসে রথ ঘুরিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ রচনা করছিল। এই বিশেষ রণকৌশল একমাত্র অযোধ্যাপতি নেমির

ছিল। তার এই আশ্চর্য ক্ষমতা এবং কৃতিত্বের জন্য সে দশরথ নামে পরিচিত হল। শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে কৈকেয়ী স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেল। এরকম আশ্চর্য যুদ্ধ সে আগে কখনও দেখেনি। রথীশ্রেষ্ঠ দশরথ সম্পর্কে তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব জাগল। এরকম একজন বীরের পত্নী হওয়ার জন্য নিজেকে সে সৌভাগ্যবতী মনে করল। সেই সুখ, আনন্দানুভূতি থেকে বিধাতাকে বঞ্চিত করবে কি? এরকম একটা আতঙ্কিত সন্দেহে এবং উৎকণ্ঠায় তার দুই চোখ সহসা অশ্রুসজল হল। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদল।

অনেকটা পথ এসে থামল বনের ধারে। অচৈতন্য অবস্থায় দশরথ যন্ত্রণায় আঃ! উঃ! করে কাতরাচ্ছিল। কৈকেয়ী তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করল। মমতা উজাড় করে দিয়ে তার আহত জায়গাগুলোর উপর হাত বোলাল। ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করল। ইঙ্গুদি তেল লাগাল। গভীর ক্ষতের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে কাঁচ দূর্বা পিষ্ট করে চেপে ধরল। পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়ে আঁট করে বাঁধল। বসনের অনেকখানি ক্ষতস্থান ঢাকতে লেগে গেল। তারপর ঝরণার জলে আঁচল ভিজিয়ে তার চোখে মুখে বুলিয়ে দিল। রক্তমাখা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শুকনো রক্তের দাগ ঘষে ঘষে তুলল। তারপর রথ চালকের জখম স্থান ভালো করে কাপড় দিয়ে জড়াল।

প্রাথমিক পরিচর্যার কাজ শেষ হয়ে গেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বুকের গভীর থেকে উঠে এল। সেবার অনাবিল আনন্দে মনে খুশি খুশি ভাব জাগল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় মাথাটা ভার হয়ে থাকল। তাড়াতাড়ি এবং নিরাপদে পিতৃরাজ্যে ফিরে যাওয়ার সমস্যা তাকে ভাবিয়ে তুলল।

দীর্ঘ পথ। বেশ কয়েকদিন লাগল যেতে। কিন্তু কোন পথ কোথা দিয়ে গেছে কিছু জানা নেই তার। একমাত্র ভরসা রথের চালক। তার নির্দেশে চন্দ্রভাগা নদী পার হয়ে কেকয়ের পথ ধরল।

পথের দুধারে গাছপালা দ্রুত পেছন দিকে সরে যেতে লাগল। সামনের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে স্নিগ্ধ শীতের ঠাণ্ডা রোদ্দুর। কি জানি কেন, সমস্ত আকাশটা যেন তারই মত উদ্বিগ্ন। শঙ্কায় কাতর।

দশরথের সুস্থ হতে বেশ কয়েক মাস লেগে গেল। এর মধ্যে কেকয় থেকে অযোধ্যায় তার আহত হওয়ার খবর গেল। মন্ত্রীবর বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, ধৌম্য'র সঙ্গে দশরথের আরো দুই রাজমহিষী কৌশল্যা এবং সুমিত্রা কেকয়ে এল।

কৈকেয়ীর স্বামী সেবা, পরিচর্যা, নিবিড় সাহচর্য তাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করল। শুধু তাই নয়, কৈকেয়ীর প্রীতি স্নিগ্ধ আচরণ, সেবায় স্বাচ্ছন্দ্যে আতিথেয়তায় অন্তরঙ্গতার এত অপরূপ যে কৌশল্যা এবং সুমিত্রার মনে যেটুকু বিরূপ প্রতিক্রিয়া জেগেছিল তা ঘুচে গেল। কৈকেয়ীর সমাদরে সুখী হল তারা। তার অন্তরঙ্গ

ব্যবহারে তাদের মন ভরে গেল। কৈকেয়ীর মুখের সরল নিষ্পাপ হাসি তাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিল। মনে হল, কৈকেয়ী ভালবাসার প্রতিমূর্তি। ভালবাসায় সব কিছু সুন্দর করে দেয়। সেই ভালবাসার যাদুমন্ত্রে সে তাদের সম্মোহিত করে রাখল। কৌশল্যা, সুমিত্রার অন্তরে সপত্নীগত বিদ্বেষ বলে আর কিছু ছিল না। কিন্তু মনের গভীরে ঈর্ষা তুষের আগুনের মত জ্বলছিল। কিন্তু অতলান্ত মনের সেই অভিব্যক্তি ছিল না তখন। বরং একটা গৌরব আর বিস্ময়ে আবিষ্ট ছিল তাদের মন। বিস্ময় কৈকেয়ীর শিষ্ট আচরণ আর মিষ্ট আলাপ নিয়ে, গৌরববোধ ছিল দশরথের মুখের দিকে তাকিয়ে। আহত স্বামীকে যেভাবে সেবা শুশ্রূষা করে কৈকেয়ী সুস্থ করেছে সেজন্য কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল। কৈকেয়ী ধীরে ধীরে কৌশল্যা এবং সুমিত্রার অত্যন্ত আপনজন এবং অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। দশরথ এ হেন রূপসীকে পত্নী করে ঠিকই করেছে। কৈকেয়ীর জন্যে দশবথকে তারা জীবিত দেখল। এ হল দশরথের বিধিলিপি। ঈশ্বরের অনন্ত করুণায় দশরথ কৈকেয়ীর মত সর্বকর্ম নিপুনা স্ত্রীরত্ন লাভ করেছে। এখন বেচারা স্বামী তাদের সুখী হোক এটাই তাদের একান্ত কামনা। সন্তান বাসনা যদি তাঁর পূর্ণ নাও হয় তাহলে কৈকেয়ীর রূপ তাকে তৃপ্ত করবে এটুকুই তাদের সান্ত্বনা। দশরথ সুখী হলে, শান্তি পেলে তারা সবচেয়ে আনন্দিত হবে। তাতেই তাদের অন্তরে পরিতৃপ্তি বাড়বে।

অযোধ্যার প্রাসাদে কৈকেয়ী দশরথের সুখদুঃখভাগিনী প্রিয়পত্নী হয়ে জীবন সুরু করল। নবজন্ম হল তার। সে আর কেকয়ের রাজকন্যা নয়, অযোধ্যার রাজমহিষী।

॥ দুই ॥

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

কৈকেয়ীকে নিয়ে দশরথ যেদিন অযোধ্যায় ফিরল সেদিন থেকে পক্ষকাল ধরে চলল নববধূ বরণের উৎসব। গোটা নগরীকে উৎসবের রূপ দেয়া হল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের আনাগোনা বেশ কয়েকদিন ধরেই চলল। প্রজারা দেখতে এল তাদের নতুন রাণীকে।

প্রজাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। দশরথ দেবলোকে যুদ্ধ করতে গিয়ে সিংহের মত শিকার করে এনেছে রূপসী কিন্নর কন্যা কৈকেয়ীকে। ভুবনের আলো এসে রাজার প্রাসাদ আলো করে রেখেছে। তার রূপ দেখে রাজা থেকে রাণী পর্যন্ত মুগ্ধ, দাস-দাসী, আত্মীয়, পরিজনের মন ভরে আছে তার সুন্দর আচরণে আর মিষ্টি ভাষণে। রাজপ্রাসাদে সর্বত্র খুশীর স্রোত বইছে। হৃদয় মাধুর্যে সে জয় করে নিয়েছে সকলকে। প্রজারাও তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়েছে। কৈকেয়ীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং সেবার গল্পে তাদের অন্তর ভরে রইল।

প্রজাদের খুসির কথা পরিচারিকা মন্থরা কৈকেয়ীকে জানিয়েছিল। অযোধ্যার প্রাসাদে নতুন পরিবেশে কৈকেয়ীর কোন অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য কেকয়রাজ একজন চতুরা, প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন বুদ্ধিমতী রমণী মন্থরাকে তার মন্ত্রণাদাত্রী করেই অযোধ্যায় পাঠিয়েছিল। অযোধ্যাবাসীর অন্তরে কৈকেয়ীর হৃদয় মাধুর্য,নতুন রাণীর বিস্মিত শ্রদ্ধা, রোমাঞ্চিত গর্ব ও সম্মানকে অনির্বাণ করে জ্বালার জন্যে প্রকাশ্য দরবারে জনসমক্ষে উপস্থিত হতে বলল তাকে। নতুন রাণীর বাসনা পূরণ করতে দশরথও প্রকাশ্য দরবারের আয়োজন করল।

রাজপ্রাসাদের বিশাল চত্বরে বিপুল লোকের সমাবেশ হল। মাথার উপর তাদের নানা রঙের কাপড়ে তৈরী বিশাল চাঁদোয়া। জনতাকে সুশৃংখলে রাখতে তকমাধারী বিভিন্ন রাজপুরুষ তাদের নিয়ন্ত্রণ করছিল।

রাজা রাণী আগমনের সংকেত-বাদ্য বেজে উঠল। তারপর সূচনা হল মধুর সঙ্গীত এবং নৃত্য। অনুষ্ঠান শেষ হলে মঞ্চে এসে দাঁড়াল রাজা রাণী। উল্লসিত জনতাকে দু'হাত করবদ্ধ করে অভিনন্দন করল রাণী। প্রজাদের মধ্যে নতুন রাণীকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। চিৎকার, অভিনন্দন করতে লাগল। রানী যে পরমাসুন্দরী কৈকেয়ী! তার রূপের কোন তুলনা হয় না। সে অপরূপা। অনন্ত বিস্ময় তার শরীরে। সোনালি নধর আপেলের মত তার রঙ। নীলোৎপলের মতো স্বপ্নালু দুই আঁখি। সারা অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে জুঁই'র সুবাস। সেই সুবাসে বাতাসের প্রাণে খুশির নেশা লাগল। তার হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ল জনতার অন্তরে।

প্রাসাদ অলিন্দের সংলগ্ন উঁচু মঞ্চে স্বর্ণ সিংহাসনে বসেছিল দশরথ। তার দক্ষিণ পাশে রক্ষিত স্বর্ণ সিংহাসনে কৈকেয়ী আর বাম পাশে কৌশল্যা। আর পিছনের সারিতে ছিল পাত্র-মিত্র পরিজন।

অযোধ্যার সকল লোক জানল, কৈকেয়ীর রূপ রমণীর ঐশ্বর্য। তার অলংকার ঐশ্বর্যের দ্যুতি। কৈকেয়ী রূপবতী—সাজসজ্জায় অলংকারে মনোলোভা। শুধু তাই নয়, গুণেরও শেষ নেই তার। গুণের জন্যেই সে দশরথের এবং অযোধ্যার মনের মত রাণী। কেকয়রাজ অশ্বপতি কন্যাকে সর্বগুণে গুণান্বিত করেছেন। শিক্ষাতেই কৈকেয়ী প্রিয় হয়ে উঠল সবার। কৃতিত্ব কৈকেয়ীর চেয়ে অশ্বপতির অধিক। জনতার মধ্যে এ ধরণের গুঞ্জন মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে মঞ্চ পর্যন্ত এসে পৌঁছল। কৈকেয়ী সিংহাসনে বসে নিবিষ্ট মনে তা শুনল। বুকের ভেতর কথাগুলো বীণার তারের মত রিণ্ রিণ্ করে বাজতে লাগল।

নিজের ভাবনায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে অনুভব করল, সে দশরথের নির্জন নিভৃতের কামিনী নয়, কিংবা তার পতিব্রতা পত্নী শুধু নয়, সে এ রাজ্যের রাণী। শুধু সংসার বা প্রাসাদটুকুতে নয়, রাজ্যেরও অনেক দায়িত্ব তার। এ রাজ্য, প্রজা তো তারই। তাদের উপর কর্তৃত্ব ও পরিচালনা স্বাভাবিকভাবে তারও কিছু আছে। এমন করে নিজের অধিকারের কথা ভাবতে ভাল লাগছিল কৈকেয়ীর। এই ভাবটাই তার কাছে সত্য মনে হল। কারণ মানুষ সারা জীবন ধরে শুধু পাওয়ার নেশায় ঘুরছে। পেয়ে তার সুখ নেই। তাই এক পাওয়া শেষ হতেই আর এক পাওয়ার আকাংখা জাগে বুকে। রাজারও ক্ষমতায় তৃপ্তি নেই, পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়ার স্বপ্ন তার দুই চোখে। সাগরে মিশে নদীর সুখ। এর মানে জীবন থেমে থাকে না, জীবন ক্রমাগতই চলে। চলতে চলতে কখনও সে অচলায়তনে গিয়ে শেষ হয়, আবার কখনও অনন্তে গিয়ে পরিপূর্ণতা পায়। পাওয়াটাই আসল পাওয়া।

নিজের অজান্তে নিজেকে আবিষ্কার করল কৈকেয়ী। আর অবাক হল। এ কোন নতুন দুনিয়া খুলে গেল তার সামনে? এর কোন সংবাদই তার জানা ছিল না। হঠাৎ কোন অদৃশ্য দেবতার অমোঘ নির্দেশে এই সব কথা মনে হল তার? কী ভীষণ ভয়ংকর চিন্তা! ভয়ংকর কেন না, কথাগুলো মনে হওয়া থেকে বুকের ভেতর একটা অসহ্য উত্তাপে জ্বালা করছিল।

কে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, তার যাত্রাপথের মাঝখানে অচলায়তনের মত দাঁড়িয়ে আছে কৌশল্যা। সে এক এমন বাধা যে তার মনে হল, সামনে চলার বুঝি আর পথ নেই! কৌশল্যা শুধু দশরথের মহিষী নয়, স্নেহময়ী গৃহিণী। কৌশল্যার শ্রীময়ী মূর্তির অনিন্দ্য প্রকাশ প্রাসাদের দাসদাসী এবং কর্মচারীর প্রতি সস্নেহ মধুর ব্যবহারে ও নিপুণ কর্তব্যপালনে এবং আমন্ত্রিতের পরিচর্যায়। সকলেই হৃষ্টচিত্তে রাণীর প্রশংসা করে। দাসদাসীরা কৌশল্যাকে মান্য করে। তার নির্দেশ শোনে। তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তার মরমী মনের মধুর বিশাল সংসারটাকে সাজিয়ে রেখেছে ছবির মত। কোথাও এতটুকু অসংগতি নেই। রাজমহিষী কৌশল্যার সংসার শুধু প্রাচুর্যে

ভরা নয়, শ্রীমণ্ডিত। শুধু সংসার প্রাসাদে নয় রাজাও তার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করে। কৌশল্যাকে ঈশ্বর কর্তৃত্বের দেবী করে পাঠিয়েছে। তার কোন তুলনা হয় না। নারীসুলভ যাবতীয় ঈর্ষায় কেকেয়ীর বুকের ভেতর চিন্ চিন্ করে। সব নারী চায় গৃহে সাম্রাজ্ঞী হতে। কিন্তু কৌশল্যা থাকতে সে সাম্রাজ্য কোথায় পাবে কৈকেয়ী? অনুচিত মুগ্ধতায় তার মস্তিষ্ক পাপে বিদ্ধ হয়। সুন্দর মুখের সুকোমল পেশী শক্ত হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয় ক্রমে। কৈকেয়ী কোন কথা বলল না। পুঞ্জীভূত বাসনার দাহ স্নায়ুতে স্নায়ুতে। কেবল নামহীন ইন্দ্রিয় জোনাকির মত টিপ টিপ করে জ্বলছিল। সেই চকিত আলোর বিন্দুতে ওর অনুভূতি নিজের কাছে সাড়া দেয়। সচকিত হয়ে নিজেকে সে মনে মনে প্রশ্ন করল কেন এমন হয়? এ তার কিসের সূচনা?

অমনি কৈকেয়ীর মস্তিষ্কের অন্ধকার সীমায় এক বিস্মিত জিজ্ঞাসার ঝিলিকে কৌশল্যা ঝলকে উঠল। কি আশ্চর্য সুন্দর স্নেহ আর মমতা দিয়ে কৌশল্যা তাকে বরণ করল। সপত্নীগত বিদ্বেষ, ক্ষোভ, দুঃখ বেদনায়, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, ঈর্ষা তার আবরণে প্রকাশ পেল না। কৌশল্যার সংযত শান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর দেবীমূর্তি দেখে কেকেয়ীর কখনও মনে হয়নি স্বামীর মুখ চেয়ে কৌশল্যা তাকে বরণ করেছিল। বরং জননীর মত তাকে আপ্যায়িত করার জন্য ভাল ভাল খাবার পরিপাটি করে সাজিয়ে তার সামনে ধরল। নিজে পাশে বসে তার তদারকি করতে লাগল। সুমিত্রাও বসেছিল তার কাছে। বসে বসে সে চামর দোলাচ্ছিল। তার পাশে গোল হয়ে আরও সব পুরনারীরা বসেছিল। কত হাসাহাসি, তামাসা, কৌতুক, গল্প তাকে নিয়ে হতে লাগল। মেয়েদের ভীড়ের মধ্যে বসে বসে অনেক মেয়েলি কথা তার কানে এল। কৈকেয়ী খাচ্ছিল না। কেমন উদাস অন্যমনস্কের মত মাথা নীচু করে হাত নাড়ছিল। থালার উপর আঙ্গুলের দাগ কাটছিল। কেকেয়ীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কৌশল্যা দরদী গলায় বলল : বাড়ীর কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে তাই না! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ বোন এ কষ্টত সইতে হবে। বিয়ের আগে আমারও বায়না ছিল কত! মাকে ছেড়ে এক তিল থাকতে পারতাম না। এখন সে সব যে কোথায় চলে গেল-মনেও পড়ে না। দুদিনবাদে তোমারও হয়ে যাবে। সবই কপাল। মেয়েমানুষের জীবনটা বিধাতা এক আশ্চর্য ধাতু দিয়ে গড়েছে। ছোটবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে অন্য লোকের হাতে দিয়েছে। সেই অজানা অপরিচিত মানুষটা তার ভাগ্যবিধাতা। তারই খেয়াল খুশি ইচ্ছার পুতুল। সংসার, ছেলেপুলে ঘরকন্না নিয়ে তার জীবন। এটুকুই তার অবলম্বন। তার জগৎ। তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে সব রমণী মেতে থাকে, নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। নিজের সঙ্গে তার নিজের এই বঞ্চনা প্রতিমুহূর্ত। তাই নিরন্তর একটা বিরোধ লেগে রয়েছে তার মনে, বাক্যে এবং সংকল্পে।

কৌশল্যার কথাগুলো কৈকেয়ীর মন ছুঁয়ে গেল। এসব অনুভূতি জন্মানোর মত তার বয়স হয়নি। কৌশল্যা তার চেয়ে বয়সে বড়। অনেকদিন সে স্বামীর ঘর করছে।

তার অভিজ্ঞতাও বেশি। কৌশল্যা অনেকদিন ধরে জীবন দিয়ে যা জেনেছে, কৈকেয়ী সেই অভিজ্ঞতা এবং জীবনদর্শনের যোগফল একমুহূর্তে জানল। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তবে, এটা বোঝা গেল যে, জীবনকে সে উপলব্ধি করে, তার প্রতিটি ব্যাপারকে মর্ম দিয়ে জেনে নেয়। কেন জানে ? আর কোন নারীর মুখে জীবনকে এত গভীর করে বলতে শোনেনি। এর কারণ, কৌশল্যার প্রাসাদ চত্বরে বন্দী নারী অন্তরে কোথাও একটা যন্ত্রণা অথবা কষ্ট আছে। না হলে এসব অনুভূতি কেমন করে এল তার মনে ? অথচ বাইরে থেকে দেখে মনের এসব দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা বিক্ষোভের কোন প্রতিক্রিয়া যা তার অনুভূতিতে প্রতিমুহূর্ত ক্রিয়াশীল তার কিছুই অনুমান করতে পারা যায় না। কৌশল্যার উপেক্ষিত কষ্টের চকিত অনুভূতি তার বুকে টন টন করছিল। কষ্টের মধ্যেই অনুভব করল—কষ্ট, দুঃখ, বেদনা বাদ দিয়ে কোন মানুষ বেঁচে নেই। সে নিজেও একটা কষ্টে আতংকে দিনাতিপাত করছে।

এই ভাবনাসূত্রে তার আরো মনে পড়ল ; কৌশল্যার পরিতাপিত অন্তরের নিগূঢ় মর্মকথা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কৌশল্যা পুনরায় বলল ঃ তুমি নতুন। সব জান না। অভিজ্ঞতাও কম। তবু সব জেনে রাখা ভাল। মেয়ে মানুষের তৃপ্তি সুখ কোন রাণীর ভাগ্যে দেয় নি ঈশ্বর।

নিজের অজান্তে প্রশ্ন করল কৈকেয়ী—কেন ?

চোখের পাতায় নিবিড় ব্যথার ছায়া ঘন হল কৌশল্যার। বলল ঃ স্বামীকে নিজের করে পাওয়া রাণীদের কপালে থাকে না। পেয়ে হারায় তারা। আর সে হারানোর দুঃখ যে কত ভয়ানক, জান না তুমি।

কৈকেয়ী কোন জবাব দেয়নি। জবাব দেবার মত কোন কথাই ছিল না তার। দুই চোখ তার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ছিল। উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় তার মুখ থম থম করছিল।

ঢোক গিলে কৌশল্যা বলল ঃ মহারাজের জীবনে আমি প্রথম নারী। কিন্তু আমিও পাইনি তাকে। যেদিন এ প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করলাম, সেদিন মনে হল স্বর্গ পেলাম। পুরুষের তপ্ত ভালবাসা ধন্য করল আমাকে। এই সুখ, আর আরামের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। কিন্তু দু'দিন বাদে প্রশ্ন জাগল, এই কি সুখের নমুনা ? কিছু কালের ভেতর নতুনের নেশা কেটে গেল। জীবনের ফাঁক ও ফাঁকি ভরাতে ক্রমেই রাজাকে পাওয়া দুর্লভ হল। প্রমোদ কক্ষেই কাটে সারাক্ষণ বিয়ে-বিয়ে খেলা করে। তাদের হাজার খেয়াল আর বিলাসিতার মধ্যে বিয়ে, বৌ আর এক বিলাস। রাণী হওয়া একটা বৃহৎ পরিহাস।

কৈকেয়ী, কৌশল্যার মুখের দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট হয়ে কথা শুনছিল। চোখে মুখে তার গভীর আগ্রহের ভাব ফুটে উঠল। কারণ, জীবনের এসব কথা সে জানে না। নতুন শুনছে। তাই তার ভিতরটা একটা ভয়ংকর ভয়ে শক্ত হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বলল ঃ আমার ভীষণ ভয় করছে।

কৌশল্যা একটু ত্রস্ত হয়। নিবিড় কালো দুই চোখের তারায় এক তীব্র

উৎকর্ণতা। নিচু গম্ভীর উদ্বিগ্ন স্বরে বলল : নিজেরও তো প্রয়োজন বলে বস্তু আছে। নিজের প্রয়োজনের বন্ধনটাই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধন। কিন্তু সে বন্ধন মহারাজের ছিল না। সুন্দরী ললনাদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছেন সর্বক্ষণ। গৃহিনীর মনের সংবাদ রাখার সময় কোথায় তার? আমরা তাদের আশ্রিত। অনুগৃহীত। ঘর সাজানোর বিলাস দ্রব্য। আমার নারী জন্ম বৃথা। নারী হয়ে পারি না পুরুষকে আকর্ষণ করতে, তাকে কাছে টানতে। ধরে রাখার কিংবা বশ করার মন্ত্রও জানি না। ব্যর্থতার এই দুঃখে মন পোড়ে, হৃদয় জ্বলে। পুরুষের চিত্ত জয়ের শক্তি বিধাতা নারীকে দিয়েছেন। কিন্তু আমায় দেয়নি কেন? মহারাজকে যাদু করেও রাখতে পারলাম না। হেরে যাওয়ার এই গ্লানিতে মন পোড়ে বুক জ্বলে। বলতে বলতে কৌশল্যার কণ্ঠস্বর তীব্র আবেগে ভারী হল। চোখের পাতায় উপেক্ষিত অসম্মানের ছায়া সুনিবিড় হল। কেকেয়ীর কিশোরী প্রাণের মধ্যে অতর্কিতে অপমানের বেদনা এতো গভীর ভাবে বেজেছিল যে, নিঃশব্দে চোখ মুছতে মুছতে সে উঠে গেল। চকিতাবিন্ধ কষ্ট তার আচ্ছন্নতার মধ্যে দীর্ঘ স্থায়ী হল।

কৌশল্যা এমন অনায়াসে কথাগুলো বলল, যে কেকেয়ী চিন্তাই করেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় কৌশল্যার বুকের ভেতর ঝটিতি অজস্র ক্ষোভ জিজ্ঞাসা একসঙ্গে এমনই উথালি পাথালি করতে লাগল যে একটি কথাও সে উচ্চারণ করতে পারল না। নীরব শ্রোতার ভূমিকায় তার কিশোরী মনের আবেগ অনুভূতি লজ্জায় আবিষ্ট হল। নিরালা ঘরের নির্জনতায় নানান অনুভূতির মধ্যে দশরথ কৌশল্যার সম্পর্ক তীব্র-ভাবে আবর্তিত হতে লাগল। মনে একটা জিজ্ঞাসা মিশ্রিত অনুভূতি প্রবল হল। দশরথ কৌশল্যার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর। কিন্তু তাতে প্রেম নেই, আকর্ষণ নেই, আবেগ নেই। এমন কি অধিকারবোধও সংকুচিত। সম্পর্কটা তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক। সুবিধা আর স্বার্থের। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতখানি উত্তাপহীন এবং নির্বিকার হলে তবে এরকম অসহায় অভিসম্পাতের মত মনে হয় নিজের অবস্থাকে। কেকেয়ীর মস্তিষ্কে কথাটা বিদ্যুতের মত ছুঁয়ে যায়। অমনি যন্ত্রণা বিদ্ধ এক কষ্টে বুক তার টনটন করে। অনুরূপ আতঙ্কে বিবর্ণ হল তার মুখশ্রী। পেশী শক্ত হল। প্রাসাদে নিজেকে তার ভীষণ একা এবং নিঃসহায় মনে হল। রুদ্ধ অভিমানে সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর, আত্মহারা আবেগে অনেকক্ষণ একা একা কাঁদল। কেঁদে হালকা হল।

নিজের অজান্তে কেকেয়ী ভাবতে লাগল কৌশল্যা যা যা বলল সব সত্যি? এর একবর্ণও মিথ্যে নয়? তাকে ধোঁকা দেয়ার কৌশল'ও হতে পারে? কর্তৃত্ব রক্ষার স্বার্থে অথবা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেও কৌশল্যা তাকে ভয় দেখাতে পারে। স্বামী সম্পর্কে কৌশল্যা যে তার মনে একটা ঘৃণা বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ, দুর্ভাবনা এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করছে না তার কি প্রমাণ আছে? এ সবই হয়ত কৌশল্যার ছলনা। তার উপর দশরথের আত্যন্তিক আকর্ষণ, টান এবং প্রেম কৌশল্যা ঈর্ষান্বিত করেছিল। তাই দশরথের কাছ থেকে দূরে সরানোর জন্য তার প্রেমকে সংকুচিত

করবার জন্যে নিজেকে নিয়ে হয়ত সত্য মিথ্যার গল্প বানিয়েছে কৌশল্যা। এ সব সন্দেহ ও সংশয়ে তার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। তথাপি, নারীর প্রত্যাখ্যাত যন্ত্রণার নিদারুণ পরিতাপের কথা ভেবে সে একটু বিচলিত এবং অশান্ত হল। তার সারা মনে গ্লানি জমল। কিন্তু দেহ মনের ক্ষুধা, চাওয়ার তীব্রতা, জয় করার নেশা, নীড় রচনার স্বপ্ন, জীবনের কাছে অনেক চাওয়া পাওয়ার আকাংখা তাকে জীবনের এককুল থেকে আর এক কুলের দিকে প্রবলবেগে টানতে লাগল। তাই, কৌশল্যার কথাগুলো তার চিন্তায় মনেতে দীর্ঘস্থায়ী হল না। বলাবাহুল্য এই বোধই তাকে আত্মসচেতন মহিলা করে তুলল। রাজপ্রাসাদের আলোর রোশনায়, প্রাণের প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, বিলাস, ভোগ সুখের মধ্যে আত্মার কৃচ্ছ্র সাধন, এবং দারিদ্র্য বেমানান। নিজের সত্তাকে মনকে পঙ্গু নিঃশেষ করে শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে কোন গৌরব নেই। নিঃস্ব শীতের শাসনে নিঃশেষ হয়ে যায় গাছের পাতা। যারা ঝরে গেল তাদের কেউ মনে রাখে না—গাছও না। বাঁচার জন্যে প্রয়োজন আনন্দ আর তৃপ্তি। চরিতার্থতার সুখ। ওই অনুভূতি তার সারা মনে একটা নতুন সুরে জাগল। কৌশল্যার কথাগুলো যদি সত্য হয়, তাহলে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে কি একটা নিবিড় আতঙ্ক আর ঘৃণায়! নিজের কর্তব্য সে করেনি। পত্নীর দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই, আজ নিজেকেই নিজে ঘৃণা করে সে। জীবনের কোন পাওয়া কোন তৃপ্তিতে তার অধিকার নেই। তাই শুধু কাঁদে, হা হুতাশ করে। কিন্তু তাদের সে ভুল পথে কেকেয়ী গেল না। দশরথ তাঁর জীবনে প্রথম পুরুষ। তার স্বামী। তার প্রেম, তার জীবন। তাকে প্রেমে বশ করেছে, সেবায় জয় করেছে। দশরথ তার সব পাওয়ার স্বপ্ন। সারাজীবনের ব্যাকুল কামনা। তার সেই অধিকারের ওপর আর কারো ভাগ সে রাখবে না। দশরথ শুধু তার একার। একান্ত নিজের। প্রতিদ্বন্দ্বী তার অসহ্য। কৌশল্যা···সুমিত্রাকে নিজের অজান্তে ঈর্ষা করতে লাগল।

নিজের ভাবনায় ডুবে ছিল কেকেয়ী। আত্মমুগ্ধ সমাধিস্থ ভাব তাকে এমন নিরাসক্ত এবং নির্বিকার করে রাখল যে দরবারে বিভিন্ন ঘোষণা এবং নিয়ম মাফিক কাজকর্ম কিছুই দেখছিল না। জনতার উল্লাস, হর্ষ, কোলাহল, জয়ধ্বনি তার কানে আসছিল, কিন্তু তাতে তার একাগ্রতা নষ্ট হল না। কিংবা তার প্রতি কোন আগ্রহ বা কৌতূহল প্রকাশ পেল না। শূন্যদৃষ্টিতে সে জনতা দেখছিল। তার অন্যমনস্ক ঔদাসীন্যের দিকে তাকিয়ে দূরে আকাশের চিকুর হানা চমক লাগল দশরথের মনে। কেকেয়ী প্রস্তরমূর্তিবৎ, বধির। তার চোখে ছিল একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ।

উৎকণ্ঠায় দশরথের দুই চোখের চাহনি সুনিবিড় হল। রহস্যের সুমুখে একটি গভীর জিজ্ঞাসায় ভুরু টান টান, অপলক দৃষ্টি। নিচু স্বরে উচ্চারণ করল ঃ ছোট রাণী!

কেকেয়ী চমকে উঠল। সম্মোহিতের মত সাড়া দিল তার ডাকে। বলল ঃ হুঁ।

কেকেয়ী কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দশরথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু হাসার চেষ্টা করে বলল ঃ কিছু বলবে?

দশরথ মাথা নাড়ল। বলল ঃ এই দরবার তোমার জন্যে। অথচ, তুমি নির্লিপ্ত নির্বিকার, উদাসীন। এর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই ?

কী করব বল ?

দশরথ সেই মুহূর্তে জবাব দিতে পারল না। তার চোখের দিকে তাকাল। তারপর, উদ্ধত বুকের দিকে। দৃষ্টিতে তার অসহায়তা ফুটল। খুব আস্তে নিচু গলায় জিগ্যেস করল ঃ এখানে আসার পর থেকে তুমি কেমন বদলে গেছ। কিসের দুঃখ তোমার কাছে বড় হয়ে উঠল, জানতে ইচ্ছে করে। তোমার কষ্ট দেখলে আমারও কষ্ট হয়।

কৈকেয়ী হাসল। ভারী গলায় বলল, দুঃখ নিজে থেকেই অনেক বড়। তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। বুক থেকে উঠে আসা একটা কষ্টের সঙ্গে উচ্চারণ করল। আর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল সেই সাথে।

দশরথ কষ্টে মাথা নাড়ল। ফিস ফিস স্বরে বলল ঃ তোমার কোন দুঃখই থাকবে না একদিন ; দেখ।

দশরথ ও কৈকেয়ীর কথাবার্তার মধ্যে মন্ত্রীবর বশিষ্ঠ সশরীরে উপস্থিত হল। সবিনয়ে নিবেদন করল ঃ মহারাজ, ছোটরাণীর হাত থেকে প্রজারা অন্ন, বস্ত্র এবং স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণের জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু পরিশ্রম স্বীকার করে তাঁকে একাজ করতে হবে নিজের হাতে। এটাই এ রাজ্যের কুলপ্রথা।

গরীব দুঃখী প্রজাদের অন্ন-বস্ত্র-ধন বিতরণ করতে কৈকেয়ীর বার বার মনে হতে লাগল সে নিজেই এ রাজ্যের অধীশ্বর। অসীম তার ক্ষমতা। এই রাজ্য প্রজা সব তার। সে এর রক্ষক, পালক, শাসক।

গভীর রাত।

পৃথিবী নিস্তব্ধ। রাতের আকাশে তারারা শুধু জেগে। নীচের পৃথিবী ঘুমিয়ে। সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। পাহারা দেবার জন্য কেউ জেগে নেই। প্রাসাদের প্রহরীরাও থামের বুকে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

দশরথ চুপি চুপি তার শয্যা থেকে উঠল। পায়ে পায়ে সে কৌশল্যার কক্ষের সামনে দাঁড়াল। বন্ধ দরজায় হাত দিতে খুলে গেল। পা টিপে টিপে কক্ষে ঢুকল। কৌশল্যার পালঙ্কের উপর বসল। নিদ্রিত কৌশল্যাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। পরিধানের স্বচ্ছ পাতলা বসন নিদ্রার মধ্যে শয়নে এলোমেলো ও বিস্রস্ত হয়েছিল। আর তার আড়ালে অবারিত হয়েছিল বক্ষবাসের আবরণমুক্ত কোমল, নরম সুডৌল মসৃণ দুটি স্তনভাণ্ড, গুরুনিতম্বে অস্পষ্ট ছায়াভাস এবং কটিতলের উলংগ জঙ্ঘা। খর যৌবনবতী সেই অনির্বচনীয় অনাবৃত সৌন্দর্যের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি

কামনায় আবিল হয়ে উঠল। আর গলা মোমের মত তরল স্রোত তার মেরুদন্ড দিয়ে বইতে লাগল। নিদারুণ উত্তেজনায় দেহমন তার বিবশ হয়ে গেল। রাত্রির সেই মধ্যযামের নিথর নিস্তব্ধতার ভেতর চুপ করে বসে থাকতে থাকতে তার সারা অঙ্গে লাগল কামনার জোয়ার। নদীতটের মত পড়ে থাকা শরীরটার উপর ঢেউর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দলাই মালাই করতে ইচ্ছে হল। নদী হয়ে তার দেহে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তবু পারল না দশরথ।

তুষারাবৃত পাহাড়ের মত হিমশীতল আর কঠিন তার দেহ। কেবল আঙুলগুলো লুব্ধ আর মত্ত হয়ে উঠল। পরম আদরে তার বুকে আলতো করে হাত বোলাল।

নিদ্রিত কৌশল্যার স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে গেল তার শিহরণ। অমনি কৌশল্যা চমকাল। চোখ খুলল। ধড়ফড় করে উঠে বসল ফেননিভ কোমল শয্যায়। সদ্য ঘুমভাঙা দুই চোখে তখনও একটা আতঙ্ক, উদ্বেগ জড়িয়ে ছিল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল। এক অব্যক্ত বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা দশরথকে দেখেই যেন থমকে গেল। অবাক চোখ অবাকতর করে সে দশরথের দিকে তাকাল। ঠোঁটে তার ধরা পড়ে যাওয়ার গ্লানিকর লজ্জার আভাস। তার সমগ্র অভিব্যক্তিতে একটি ভীরু অপরাধ-বোধের আর্তি যেন তার মার্জনা চাইছিল। কিন্তু তাতেই চল্লিশ বছরের দশরথকে এত সুন্দর লাগছিল যে তাতে ত্রিশ বছরের কৌশল্যার রক্ত থরথরিয়ে উঠল ; বাইরে না, ভিতরে মুহূর্তে কৌশল্যাকে অন্যরকম লাগল। প্রগাঢ় প্রেমানুভূতির তীব্রতায় জ্বল জ্বল করছিল বয়স্ক দুটি চোখ। দশরথের বুকের খুব নিকটে দাঁড়িয়ে কৌশল্যার বিস্ময়মথিত স্বরধ্বনিত হল ঃ তুমি ! এত রাতে !!

তোমাকে দেখব বলে চুপি চুপি এসেছি। কতকাল পাই না তোমায়। নিভৃতে দুটো মনের কথা বলতে এলাম।

কৌশল্যার বুকের ভেতর অশান্ত সাগরের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস। নিজেকে তার কেমন অশক্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, একটা কিছু আশ্রয় না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তথাপি, কেমন একটা সহিষ্ণুতায় সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দশরথের দিকে তাকিয়ে বুক উজাড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে বলল ঃ রাত্রি এত মধুর, প্রেম এত সুন্দর, আগে কখনও অনুভব করিনি। কতকালের পিপাসাকাতর মরুভূমির উপর নামল ভরা শ্রাবণের স্নিগ্ধ বর্ষণ। আনন্দের এই অসহনীয় আবেগ আমি রুখব কি করে ?

কৌশল্যা মুহূর্তে দশরথের গলা জড়িয়ে ধরল। শরীরের নিবিড় স্পর্শ দশরথের অনুভূতিতে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করল। আগ্রাসী তৃষ্ণার চুমুকে নিজেকে পরিপূর্ণ দান করার আনন্দের মধ্যে ডুবে গিয়ে কৌশল্যা বলল ঃ ওগো এটা কোন্ ঋতু ? ঋতুরাজ বসন্ত কি আমার তিরিশ বছরের জীবনে ফিরে এল ? তাই বুঝি পৃথিবীতে এত সবুজের সমারোহ, গাছে গাছে পাখীর কাকলি। বসন্তের মলয়ে প্রাণ-জুড়োনোর আবেশ। বুকের ভেতর ঝর্ণার কলরোল। তাই খোলা চোখে দেখছি নীল আকাশের

আকুলি। আজ আমার একি হল ? আমি কি জানতাম, আমার সুখের স্বপ্ন এমনি করে পায়ের তলায় অনুগত রাত্রির মত লুটিয়ে পড়বে ?

দশরথের নীরব! চোখে তার উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল। ভীষণ মৌন এবং গম্ভীর তার মুখ। কৌশল্যার আবেগে ঘোরলাগা আচ্ছন্নতা তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে পাক খাচ্ছিল। আর একটা তীব্র অপমানবোধে তার বুক টাটাচ্ছিল। আপন মনের জটলায় কষ্ট পাচ্ছিল। কেমন একটা অসহায় ক্লান্তিতে ধুঁকছিল। কাঁটার মত মনের ভেতর খচখচ করে ফুটছিল কৌশল্যার প্রগলভ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীর। তীব্র অসহায় যন্ত্রণায় কৌশল্যা তাকে আঘাত করেছিল। এ তার প্রাপ্য। তবু তার চৈতন্য জুড়ে কৌশল্যার নিষ্ঠুর কৌতুক তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল। আস্তে আস্তে নিজের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়ে তার ভুরু কুঁচকে গেল। ভীরু চমকানো কণ্ঠবিবদ্ধ অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল তার কণ্ঠে। বলল ঃ মহিষী তোমার বিদ্রূপ বড় নিষ্ঠুর, ব্যঙ্গ ভীষণ নির্মম।

কৌশল্যার দুই চোখে বিভ্রান্ত বিস্ময়! সম্মোহিতের মত উচ্চারণ করল ঃ আমার সব পাওয়ার মাঝে এমন নিষ্ঠুর হলে কেন মহারাজ ? তোমার সামান্য করুণা, সহানুভূতি যার জীবন ধন্য হয়ে যেত তাকে অনুগ্রহ দেখালে না কেন ? ভুলেই'ত ছিলাম। তবে, কেন বসন্তের বার্ত্তা নিয়ে এলে তুমি ? একি শুধু ছলনা ? কিন্তু আমি'ত একবারও তা মনে করিনি। স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল রাত্রি। তুমি কেন তার তালভঙ্গ করলে ? কেন স্বপ্ন ভেঙ্গে খান্ খান্ করলে ? মুখে তোমার হাসি নেই, চোখে নেই সোহাগভরা দৃষ্টি। কেন ? কি হয়েছে তোমার ? আমি তোমার সকল দুঃখের সাথী। আমাকে খুলে বল। লুকিয়ো না কিছু।

দশবথ অভিভূত। কারণ মনে মনে সে অবাক হয়েছিল এই ভেবে যে কৌশল্যার দুর্জয় ক্রোধ, অভিমান, আক্রোশ প্রকৃতপক্ষে তার ভালবাসার অভিমান। দশরথকে নিজের করে পাওয়ার সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার একটা দুর্জয় অভিলাষ কোন না কোন কারণে তার আকর্ষণের মধ্যে সংঘাত বাধাল। এজন্য দায়ী ছিল দশরথ ও কৈকেয়ীর দু'জনের জীবনকে দেখবার ভাববার ভঙ্গী আর চিন্তা। যে পরিবেশের ভেতর তাদের জীবন প্রবাহ স্বাভাবিক হতে পারত দশরথ তার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তাই, কৌশল্যার অন্তরে আকর্ষণ বিকর্ষণের সংঘাত নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল ও অস্বাভাবিক। এই অসংগতি কৌশল্যার স্বরে রীতিমত বিদ্রূপের মত বেজেছিল। পরক্ষণে দশরথের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা মিশ্রিত অনুভূতি কৌশল্যার মস্তিষ্কে ঝলকে উঠে দপ্ করে নিভে গেল। বুক তার তীব্র অনুশোচনায় হাহাকার করে উঠল। কৌশল্যা সম্পর্কে দশরথের এই অনুভূতি তার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাই কথা বলতে পারল না দশরথ। খানিকটা অসহায়ভাবে ডাকল ঃ মহিষী!

রাজা! দুরন্ত আলিঙ্গনে আমাকে একটু কাছে টেনে নাও। বল, আমি তোমার। চিরকালের মত আমার।

উতলা হোয়ো না রানী। দশরথ তোমারই থাকবে। শরতের মেঘ মাঝে মাঝে ঢেকে দেয় সূর্য। কিন্তু সেটা সাময়িক।

রাজা তোমার কথার মধ্যে সন্দেহ, প্রতিশ্রুতির মধ্যে বিশ্বাস ভঙ্গের বেদনা। তুমি সব খুলে বল।

দশরথ ভগ্নকণ্ঠে করুণভাবে বলল ঃ রানী বাজে কথায় শুধু দুঃখ বাড়ে। মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই সব কথা শুন না।

কৌশল্যার মুখে যেন ঝড়ের ঝাপ্টা লাগল। তার দৃষ্টি আচমকা আঘাতে বেদনাহত। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সে। কৌশল্যার আঁচল বুকের কাছ থেকে খসে পড়ল। কাঁচুলীতে ফিঁতের ফাঁস ছিল না। মুক্ত বক্ষের মসৃণ চিক্কণ ত্বক দেখা যাচ্ছিল। কৌশল্যা আঁচল টেনে বুক ঢাকল না। খোলা বুকের উপর দশরথের দুই চোখ জ্বলছিল।

কৌশল্যার স্বরের মধ্যে কেমন একটা আচ্ছন্নভাব। ভাঙা গলায় বলল ঃ তবু বল তুমি। আমি সব সইতে পারি। জন্মলগ্ন যার অশুভ, জীবন চির দুঃখের—তাকে ভেঙে পড়লে চলবে' কেন? আমি'ত জানতাম ছোটরানী আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে দেবে। এর চেয়ে অধিক দুর্ভাগ্যের সংবাদ তুমি আমায় কি দেবে?

দশরথ খানিকটা হতভম্বের মত কৌশল্যার দিকে তাকিয়ে থাকল। সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল ঃ তা কেন হবে?

রাজা, সে তোমার জীবনদাত্রী। তোমার রূপমুগ্ধ প্রণয়িণী। তাকে পেয়ে তুমি সুখী হয়েছ, শান্তি পেয়েছ। সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই তোমার বিরুদ্ধে। তুমি শুধু আমাকে দুঃখের ভাগ দাও। তাতেই আমার শান্তি।

দশরথ কিঞ্চিৎ বিব্রত এবং অসহায় বোধ করল। তার মুখের পেশী শক্ত হল। ঠোঁটের দু'কোনে কাঠিন্য ফুটে উঠল। দৃষ্টি প্রখর হল। কণ্ঠস্বর তার কঠিন ও গম্ভীর হয়ে ধ্বনিত হল। বলল ঃ ছোটরাণীকে তুমি ঈর্ষা কর। তোমাদের দু'জনের বণিবণা হচ্ছে না। দু জনা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে জ্বলছ। তোমাদের দুজনের সহবস্থান এক জায়গায় আর সম্ভব নয়।

কৌশল্যার বুকের মধ্যে কেঁপে গেল। মুখে কষ্টের ছায়া সুনিবিড় হল। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল ঃ এ সব কথা কেন আসছে?

জানি না। দশরথ রুদ্ধ স্বরে মাথা নাড়ল। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে তোমাদের দু'জনের থাকার আলাদা আলাদা প্রাসাদ হওয়া ভাল।

কথা শেষ করার জন্য দশরথ দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। চোয়াল শক্ত আর কঠিন হল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল ঃ আগামী ফাল্গুনের শুভ তিথিতে সরয়ূর তীরে নবনির্মিত বিশাল রাজপ্রাসাদে আমি তোমাকে নিজে নিয়ে যাব। এখানকার রেষারেষিতে তোমাকে মানায় না। রাজমহিষীর একটা আলাদা মর্যাদা থাকা দরকার। আমি তোমাকে সেই গৌরবে রাখব। কাশীরাজ্যের সমুদয় গ্রাম, নগর আমি তোমায় দান করলাম; তুমি হবে তার একমাত্র শাসনকর্ত্রী, তার রক্ষক। সাম্রাজ্ঞীর সম্মানে তুমি বাস করবে নতুন

প্রাসাদে। প্রজাদের দেয় রাজস্বে, উৎপাদিত পণ্যের আয়ে তোমার রাজকোষ পূর্ণ হবে। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের কোন সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। তুমি হবে রাণী, লোকমাতা। তোমার দেখা শোনা করবে সুমন্ত্র।

দশরথের কথা শুনতে শুনতে কৌশল্যা উদাস অন্যমনস্কতায় কেমন গম্ভীর এবং শান্ত হয়ে গেল। অসম্ভব পটুতার সঙ্গে দ্রুত নিজেকে সহজ করার শক্তি সংগ্রহ করল। নিরীহ মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল ঃ শুধু এই নাটক করতে এত রাতে ছুটে এলে ? আমি ভাবি কি না, কি ? দুর্ভাগ্যের এই সুসংবাদ'ত দিনেও দেয়া যে'ত। এজন্যে মিছেমিছি আরামের ঘুমটা ভাঙ্গালে কেন মাঝরাতে ?

দশরথ যেন কেমন অপরাধী হয়ে উঠল। অসহায় অভিসম্পাতের মত মনে হয় তার নিজের অবস্থাকে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হতাশ গলায় বলল ঃ সব আমার অদৃষ্ট। বিশ্বাস কর এক আশ্চর্য গল্প শোনাতে এসে আর এক গল্পের অবতারণা করতে হল।

আশ্চর্য গল্পই'ত শুনলাম। তবু আক্ষেপ তোমার—

কৌশল্যা ! বিশ্বাস কর, অন্য কথা বলতেই এসেছিলাম। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। যা বলতে চাইলাম, তা বলা হল না। একেই বলে নিয়তি।

ঠিক বলেছ, একথাটা আগে মনেই হয়নি। নিয়তিই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী,—আমি তুমি নিমিত্ত। খাসা যুক্তি। কী অদ্ভুত ছলনা। অথচ, তুমিও জান, আজ না হলেও দুদিন পরে তুমি বলতে। কী দরকার এই মুখোশের।

কৌশল্যা তোমার বাক্য বড় নির্মম।

কৌশল্যার ঠোঁটে বিচিত্র হাসি খেলে গেল। বিদ্যুতের মত দুই চোখে মুহূর্তের জন্যে দপ করে জ্বলে নিভে গেল। শ্রাবণ মেঘের মত সুনিবিড় ছায়া ঘনাল চোখের কোণে। কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর কাঁপল। বলল ঃ কি পেয়েছি তোমার কাছে ? সন্তান ? সংসার ? প্রেম ? স্নেহ ? আদর ? সান্নিধ্য ?—কিছু দাওনি। তোমার প্রাসাদে একটা বাঁদী আমি। স্বামীর কোন্ কর্তব্য তুমি করেছ ? স্ত্রীর কোন্ কথা শুনেছ ? আমার ভালবাসার মালাগাছটি ছিঁড়ে কুটি-কুটি করেছ। স্বেচ্ছাচার, ব্যাভিচার আর নির্লজ্জ কামাচারে আকণ্ঠ ডুবে আছ। তুমি পশু। নিজের সুখ আর স্বার্থে মত্ত। আমরা তোমার ঘরের সাজানো পুতুল। যখন ইচ্ছে হয় অনুগ্রহ আর কৃপা দেখিয়ে ধন্য কর। এ তোমার একধরণের সুখ আর বিলাসিতা। তোমার এই মজার খেলা যে কত নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর তুমি তার হিসাব রাখ না। নারী সব সইতে পারে, পারে না স্বামীর অবহেলা আর অপমান সইতে। প্রেমের অপমান আর দেহের লাঞ্ছনা সহ্য করা যে কত কষ্ট তা তুমি পুরুষ হয়ে জানবে কি করে বল ? একনিষ্ঠ প্রেমের কি মূল্য তোমরা দাও ? সমস্ত দিবস-রজনী যার কথা ধ্যান করে দিন কাটে, যার জন্য থাকে অধীর প্রতীক্ষা, যাকে জীবন সর্বস্ব করে সব সঁপে দেয়, বিনিময়ে কি পায় তার কাছে ? অথচ একদিন পুরুষের মত নারীও ছিল স্বাধীন। কিন্তু বহুপুরুষের রমণযন্ত্র হয়ে থাকার গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করার

জন্যে এক পুরুষের উপর নির্ভরশীল হল। এতে দেহের শুচিতা রক্ষা পেল। কিন্তু মনের গ্লানি কাটল না। কৌশলে পুরুষ বহু নারী ভোগের অধিকার নিজের হাতে রাখল। লোভী, ক্ষমতাবান পুরুষ কৌশল বদলে নারীর পায়ে বেড়ি পরিয়ে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাকে সেবাদাসী করল।

কৌশল্যা! তোমার অভিযোগ মর্মান্তিক! আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে।

মহারাজ, আমার কথা শেষ হয়নি। আমাদের অনুভূতিটা তুমি বুঝতে চেষ্টা কর। সমস্ত নারীর হয়ে আমি তোমার কাছে এক করুণ আবেদন রাখছি। পুরুষের এই বহুনারী বরণ নারীর প্রেমের অভিশাপ। অন্য নারীতে উপগত হয়ে কোন পুরুষ যখন আর এক স্ত্রীর প্রেমের মন্দিরে পা রাখে তখন একদিকে নারীর স্বামী সংস্কার অন্যদিকে তার প্রেম ও মর্যাদাবোধের মধ্যে যে তীব্র দ্বন্দ্ব ও গোপন সংঘাত সুরু হয়ে যায় তার খোঁজ পুরুষ রাখে না। স্বামীকে বরণ করতে তার অন্তর ঘৃণায় কুঁকড়ে যায়। ভীষণ অশুচি আর অপবিত্র মনে হয় তার প্রিয়তমকে। এক দুর্বিষহ অভিমান তার বুকের মধ্যে পাক খায়। তবু অসহায় নারী যখন তার সঙ্গে সহবাস করে তখন কষ্ট হয়, তার। প্রেমের বিশ্বাসভঙ্গকারী স্বামীর প্রতি তখন কোন দরদ, মমতা, প্রেম, প্রীতি থাকে না। অভ্যাসের বশে নিরুপায় সোহাগ দেখানোর অভিনয় করতে হয় এক দেহোপজীবিনীর মত। তখন নিজেদের বেশ্যা মনে হয়। নিরুপায় এই আত্মদানের যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত হয় তার অন্তরাত্মা। বহু পত্নীক স্বামীর অংশীদারীকে স্বীকার করতেও তার কষ্ট। একমাত্র ভুক্তভোগী নারী ছাড়া এই মর্মছেঁড়া যন্ত্রণা আর কেউ বুঝবে না। তোমার কাছে এসব কথা বলার কোন মানে হয় না। তবু জেনে রাখ, তোমার নির্লজ্জ কামুকতাকে আমি ঘৃণা করি। তোমাকে করুণা কিংবা অনুগ্রহ করে আমি শুধু নিজের মহত্ব প্রকাশ করি। আমার কৃপা গ্রহণ করে তুমি যখন অনুগত ভৃত্যের মত খুশি হও তখন একটা ভীষণ মজা লাগে। নিজের আনন্দের জন্যে আমি তোমাকে প্রশ্রয় দিই। কিন্তু আমার চোখে তুমি একজন কৃপাপ্রার্থী ছাড়া অন্য কিছু নও। তোমাকে করুণা দেখানোই আমার কাজ।

দশরথ শান্ত কণ্ঠে বলল: তোমার তিরস্কার আমার প্রাপ্য। কিন্তু আজ আমার স্ত্রীদের কাছে অনেক দাবি। আমি চাই প্রেম ; চাই তার কাছে একটি সন্তান। যার মধ্যে আমার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখব। মহাকালেব বুকে অক্ষয় অমর করে রাখব আমার রক্তের বীজ। সেই গল্প শোনাব বলে চুপি চুপি তোমার কাছে আসা। কিন্তু ঘটনার স্রোতে খড় কুটোর মত ভেসে গেল আমার সে ইচ্ছা। এখন এককুলে আমি, আর এক কুলে তুমি। মাঝখানে বেজায় ফাঁক।

দশরথের কথায় কৌশল্যা চমকে উঠল। জিজ্ঞাসানিবিড় দৃষ্টি মেলে ও দশরথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টিতে নির্বাক জিজ্ঞাসা। সন্তানোৎপাদনের শক্তি দশরথ রাতারাতি পেল কোথা থেকে? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা একবাক্যে বলেছে বয়ঃসন্ধিক্ষণ থেকে অতিরিক্ত রমণী সম্ভোগের ফলেই তার প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট

হয়েছে। হৃত প্রজনন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই তার নেই। এই সংবাদ দশরথকে আরো অসংযমী ও স্বেচ্ছাচারী করল। সন্তান বাসনায় শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় অসংখ্য রমণীর পাণিগ্রহণ করল। রাজ অন্তঃপুর দশরথের শত শত স্ত্রীতে পূর্ণ হল। তবু কোন মহিষী প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না। পুরুষত্বহীনতার লজ্জা, গ্লানি ও পরিতাপের কষ্ট এড়াতে সে নতুন মহিষীদের ছায়া মাড়াত না। তাদের কক্ষেও যেত না। কৌশল্যার কাছে আসতে কেবল লজ্জা ছিল না তার। অকপটে নিজের মনকে একমাত্র তার কাছেই উন্মুক্ত করতে পারত। আর তাতেই কৌশল্যার দশরথকে নিবিড় করে পাওয়ার সাধ মিটত। তাতে ফাঁক-ফাঁকি যাই থাকুক, অন্যদের সঙ্গে নিজেদের অবস্থা তুলনা করে কৌশল্যা গর্ব অনুভব করত। নিজেকে তার ভাগ্যবতী মনে হত। বিজয়ীর গর্ব ও সুখে মন ভরে থাকত। কিন্তু সেই সুখ ও আনন্দ থেকে হঠাৎ বঞ্চিত হওয়ার অসহায় কষ্টকর অবস্থা কৌশল্যার বুকের ভেতর নারী মনের জটিল জিজ্ঞাসায় আর দ্বন্দ্বে আবর্তিত হতে লাগল। দশরথের দ্বিধাহীন স্বরের প্রতিটি শব্দের মধ্যে এবং আমূল প্রোথিত রক্তের মধ্যে পুরুষের আকাংখা এবং দাবির বলিষ্ঠ প্রার্থনা শুনল কৌশল্যা। সহসা চমক খেয়ে প্রশ্ন করল ঃ তার মানে ?

দশরথের মুখে হাসি হাসি ভাব। মিষ্টি কৌতুকে কাঁপছিল ঠোঁট। বলল ঃ তার মানে যা হয় তাই—

তৎক্ষণাৎ একটা মুগ্ধ মুহূর্ত, তীক্ষ্ন বিদ্ধ সন্দেহের মধ্য দিয়ে, অনুরাগ বিরাগ, মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে শরীরী মত্ত আবেগের পূর্ণতায় উদ্ভাসিত হল চিত্ত। সুখানুভূতির আবেশে বিহ্বল হল শরীর। সত্তার শূন্যতা পূরণের জন্য শরীরের প্রতি কোষে যে এত উল্লাস ও যাতনা লুকিয়ে থাকে কৌশল্যা এত বয়সেও জানতে পারেনি। হঠাৎ তাই বদলে গেল তার অভিব্যক্তি। চোখের চাহনিতে এখন তার সন্ধি স্থাপনের আর্তি। একমাত্র গর্ভস্থ সন্তান পারে দুটি উন্মুখ বিচ্ছিন্ন সত্তাকে এক করতে। কিন্তু দশরথের পুত্রোৎপাদনের ক্ষমতা কোথায় ? অক্ষম পুরুষাঙ্গ চাঙ্গা হবে কোন মন্ত্রবলে ? অবশ্য তার ভাবনা চিন্তার জগৎ গণ্ডীবদ্ধ এবং সংকীর্ণ। দশরথের জগৎ বৃহৎ, বিস্তৃত, অবাধ, অনন্ত, কোন সীমায় বাঁধা নয়। সুতরাং কোথা থেকে কখন কি হয় আর হতে পারে সে সম্পর্কে তার ধারণাই বা কতটুকু ? নিজের মনের জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে কৌশল্যা বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দশরথের দিকে অপলক চোখে তাকাল। মনে হল, দশরথ যেন অসীম আকাশ ; আর সে এক ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মত গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আকুল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দশরথের চোখেও একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগ, যা তার অপরাধবোধের দ্বিধা থেকে তীব্র কষ্ট দিচ্ছিল। কথা বলার সময় তার ভুরু কুঁচকে গেল, ঠোঁট কাঁপল। বলল ঃ বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্য শৃঙ্গ যোগ বিদ্যাবলে পুরুষের নষ্ট-পুরুষত্ব ও তার হৃত প্রজনন শক্তি ফিরিয়ে আনার গুপ্ত বিদ্যা জানেন। তাঁর সাধন-

শক্তিতে বন্ধ্যা ধরিত্রী সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হয়। অনাবৃষ্টির দেশে বর্ষা নামে, মরুভূমি সবুজ শষ্যে ভরে উঠে। ঋষ্যশৃঙ্গ বিশ্বাস করে, ধরিত্রীর মত নারী কখনও বন্ধ্যা হয় না। বন্ধ্যাত্ব একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। সেই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা কোন কঠিন নয়। লোকের কাছে তিনি আজ প্রবাদ পুরুষ। তাঁকে নিয়ে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প আছে। সব গল্পই অদ্ভুত।

কৌশল্যার কালো ডাগর দুই চোখে স্বপ্নের বিহ্বলতা নামল। অজান্তে দশরথের আরো কাছে এসে দাঁড়াল।

সরযূতীরে নবনির্মিত প্রাসাদে কৌশল্যা চলে গেলে পায়ে পায়ে দশরথ কৈকেয়ীর কক্ষে এল। স্বহস্তে কেশবিন্যাসে ব্যস্ত সে তখন। অসময়ে দশরথের আকস্মিক আগমন তাকে অবাক করল। দশরথের চোখে মুখে, কেমন একটা অশান্ত-উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। বোবা দৃষ্টিতে অশান্ত-অস্থিরতা। কৈকেয়ীর উৎকণ্ঠা তীব্র হল। দশরথের চোখে চোখ রাখল। বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল। বুকের আঁচল স্তনের উপর টেনে দিতে দিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মূর্ছাবিকার আক্রান্ত রোগীর মত দশরথের চোয়ালের হাড় শক্ত, নিশ্চল। কৈকেয়ী আতঙ্কিত হল। হঠাৎ কেমন আবেগাপ্লিত হয়ে উঠল। প্রশ্ন করতে গিয়ে থমকাল। দশরথের বন্ধ ঠোঁটে ঝড়ের স্তব্ধতা। কৈকেয়ী অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে উঠল। একটা কিছু ঘটনার আশংকায় আত্মরক্ষার মগ্নতাকে সে অন্যমনস্কতার রূপ দিল। মুখে কপট হাসির বেখা চিক্ চিক্ করতে লাগল। দশরথের কথা শোনার অপেক্ষায় কৈকেয়ী বিভ্রান্ত বড় চোখে একভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু দশরথ কোন কথা বলল না। কৈকেয়ীর বিস্মিত জিজ্ঞাসার ঝিলিকে কৌশল্যা ঝলবিয়ে উঠল। কিন্তু সেজন্য কোন লাঞ্ছনার অনুভূতি স্পর্শ করল না; কিংবা কোন গ্লানি বোধও জাগল না তার অন্তঃকরণে। কেবল যা বিঁধে ছিল হৃৎপিণ্ডে তা হল মানবিক সহানুভূতি, বিবেক এবং অস্পষ্ট পাপবোধ। স্মৃতি বিস্মৃতির দোলায় কৌশল্যার তার চেতনায় বাস্তব এখন।

আকস্মিক আবেগে কৈকেয়ীর অন্তঃকরণ দগ্ধ হতে লাগল। দমকা বাতাসে নিভে যাওয়া প্রদীপের দগ্ধ স্থান থেকে যেমন অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া নির্গত হয় তেমনি একটা আত্মশোচনার কষ্ট তার অনুভূতির ভেতর পাকিয়ে উঠল। নিজের অজান্তে সে দশরথের গা ঘেঁষে বসেছিল। তার কাঁধে মাথা রাখল। তীব্র অপরাধবোধে তার বুকের ভেতর টাটাচ্ছিল। আর ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল।

দশরথ তার শিথিল হাতখানা মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আসলে সে একটা অবলম্বন খুঁজছিল। কৈকেয়ীর কোমল হাত তাকে ভিতরে ভিতরে সেই শক্তি দিচ্ছিল। নিজেকে চাঙ্গা করতে দশরথের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বিমর্ষ গলায় বলল: প্রাসাদ শূন্য করে কৌশল্যা চলে গেল। দাস-দাসীরা

মাতৃহীনা হল। এ প্রাসাদের কর্ত্রী করে গেছে তোমায়। তোমার উপর তার কোন অভিযোগ বা বিদ্বেষ নেই। নিজের মন্দ ভাগ্যকেই সে শুধু দায়ী করেছে।

কৈকেয়ী কোন কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কেটে গেল। দশরথের বুকে কৈকেয়ীর নিঃশ্বাস লাগল। কাঁধে রাখা হাত দিয়ে গলা বেষ্টন করল দশরথের। শরীরের কোমল স্পর্শ দশরথের শরীরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চুঁইয়ে পড়ল। কৈকেয়ীর স্পর্শের মধ্যে এক অসহায় অপরাধবোধ আকাংখায় স্ফুরিত হল। দশরথ বাঁ হাত দিয়ে তাকে চেপে ধরল। বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে আচ্ছন্নস্বরে বলল : কৌশল্যা যাত্রার সময় তোমার কুশল সংবাদ নিতে ভোলেনি। প্রতিদিন তোমার ও প্রাসাদের কুশল বার্ত্তা পাঠাতে বলেছে। পিতা মাতার দেয়া নাম তার সার্থক। জীবনের সমস্ত দুঃখ আনন্দ হতাশার বেদনার মধ্যেও যে অবিচল থেকে অন্যের এবং বিশেষ করে তার—

কথা অসম্পূর্ণ রেখে দশরথ কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। তারপর, কাঁধ থেকে হাতখানা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিয়ে বাতায়নের সামনে এসে দাঁড়াল। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর উদাস বিষণ্ণ গলায় প্রসঙ্গ শেষ করতে বলল : কুশল কামনা করে বলে ওর নাম কৌশল্যা।

অভিমানে দুঃখে, কৈকেয়ীর দুই চোখ জল টলটল করছিল। অভিমানে তার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হল। বলল : আমায় তুমি কি শুধু তিরস্কার করবে?

দশরথ নির্বিকার। খোলা বাতায়নের দিকে মুখ করে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল : এখন তুমি একা। হয়েছ সুখী?

কৈকেয়ীর দুই চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। একটা দুরন্ত প্রতিবাদ তার চাহনিতে ফুটে বেরোল। সমস্ত শরীরটা তার কেঁপে উঠল। লুকোন একটা যন্ত্রণার কষ্টে তার বুক চেপে ধরল। অনেক বর্ষা, অনেক শরৎ এবং বসন্তের গভীর অস্বস্তির দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছিল তার কৈশোর স্বপ্নে। বহু বল্লভা নরপতির কৃপাধন্য পত্নী হয়ে নয়, তার একমাত্র প্রিয়া ও মহিষী হওয়ার প্রবল বাসনা তার সমস্ত অনুভূতিতে সর্বদা ক্রিয়াশীল। কিন্তু ভাগ্যের ছলনায় তার সাধ পূরণ হল না। মনে হল জীবন, স্বপ্ন, আকাংখা ব্যর্থ। স্বপ্নের রাজপুত্র রূপকথার প্রেম সোনার দেশ সব মিথ্যে। নিজেকে তার ভীষণ শূন্য লাগল। বুকের রক্তে আক্রোশে আগুন ধরে গেল। বুকের অতলে তুষের আগুনের মত জ্বলছিল। নিতান্ত বাধ্য হয়ে, এক নিরুপায় অবস্থায় দশরথের পত্নীত্বকে মেনে নেয়ার ব্যাপারটাকে কিছুতে ভুলতে পারছিল না। তবু এক কঠিন কর্ত্তব্যবোধের শৃংখলে বাঁধা পড়ল তার মন। মনে মনে অনুভব করল মানুষটাকে সে সত্যিই ভালবাসে। মেয়েরা বোধ হয় এই রকমই হয়। পুরুষের স্পর্শ পেলে তাদের মনের ভেতর প্রেমের ফুল ফোটে। কিন্তু অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে পা দিয়ে ধারণা হল, সব ভুল। এক সীমাহীন দীনতা তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হতে হতে বুকের ভেতর তৈরী হল সুবিশাল এক বারুদের স্তূপ। স্বামীর উপর প্রেমের একাধিপত্য, সংসারে অবাধ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের পথে বাধা তাকে ক্রমেই অসহিষ্ণু করে তুলল। বাসনা ও আকাংখার সঙ্গে সামান্য সুযোগের নিরন্তর সংঘর্ষ বুকের

অতলে ছাই চাপা আগুনের ইন্ধন যোগাল। তুচ্ছ উপলক্ষ্যে মনের আগুন আক্রোশে, তেজে, ক্রোধে, ঈর্ষায় চোখে জ্বল জ্বল করে উঠে। কিছুতে সে আগুন নেভে না। আগুনের সুখ দহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার যন্ত্রণা যে কি জ্বালা তা আগুনই জানে। তবু শিখায় তার উল্লাস। অঙ্গারে দাহ। কষ্টের সে দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে ধোঁয়ার সৃষ্টি। তেমনি একটা তীব্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে কৈকেয়ী অস্ফুট স্বরে উত্তর করল ঃ মহারাজ সুখ'ত চাইনি। চেয়েছিলাম রাজ রাজেশ্বরী হতে।

হয়েছ রাজেন্দ্রানী!

আমি জয়ী শুধু?

কত বড় তোমার গর্ব!

না, ব্যঙ্গ করছ?

সত্যি বলছি।

সত্যি বলার সাহস তোমার কোথায়? তোমাদের জাতের রক্তের মধ্যে পাপ আছে। এ দেশের মেয়ে বিয়ে কর লালসা চরিতার্থ করতে। তোমার উপপত্নীর সংখ্যা নগণ্য নয়। পত্নীর কোন্ অধিকার গৌরব, সম্মান পায় তারা? মোহ ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রমোদ কক্ষে পাঠাও। একদিন হয়ত আমারও ঐ দশা হবে। রূপ যৌবন কারো চিরদিন নয়। পদ্মপত্রে নীড়। এই আছে এই নেই। তোমাদের মত ক্ষমতাবান বহুপত্নীক পুরুষের কাছে রূপসী নারীরও কানাকড়ি দাম নেই। তোমাদের জাতের লোকেরা এ দেশের মেয়েদের রূপ যৌবন সম্ভোগ করছে। তাদের নিংড়ে নিচ্ছে, কিন্তু তাদের প্রতি এতটুকু দরদ মমতা তোমাদের নেই। ভালবাসাও নেই। এমন কি তোমাদের প্রতিশ্রুতিরও কোন দাম নেই। পিতাকে তুমি যে কথা দিয়েছ তার কিছুই করনি। সত্যভঙ্গ করেছ তুমি। কৌশল্যা থাকতে সংসার সাম্রাজ্যে আমার যে কোন অধিকার নেই একথাটা স্পষ্ট করে বুঝেছি। আরো জানি অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। অধিকার আদায় করে নিতে হয়। আমি তাই পথের কাঁটা সরিয়েছি। নির্লজ্জের মত দখল করেছি আমার সাম্রাজ্য, আমার অধিকার, যেমন তোমরা পররাজ্য জয় করে নিজের কর্তৃত্ব ও রাজাধিকারকে প্রতিষ্ঠা কর। এতে যদি তোমরা লজ্জা না পাও, তা হলে আমারও কোন লজ্জা নেই।

খর যৌবনবতী কৈকেয়ীর দুই চক্ষু সর্প চক্ষুর মত জ্বলজ্বল করছিল। সাপের মত ক্রোধে হিস্ হিস্ করে সে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। তার উত্তেজিত উদ্ভ্রান্ত মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে দশরথ স্তব্ধ হয়ে গেল। নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর অমূর দুটো চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তীব্র একটা অস্বস্তিতে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল তার অন্তঃকরণ। অকস্মাৎ কৈকেয়ীর কথার মধ্যে বুকফাটা আর্ত্ত চিৎকার করে উঠল দশরথ। আমি আর শুনতে পারছি না। তুমি চুপ কর। চুপ কর।

দশরথের বুকের গভীর থেকে উঠে আসা আর্ত্তস্বরে কৈকেয়ী কেঁপে উঠল। তার ব্যথিত বিহ্বল দুই চোখের তারায় একটা আর্তি ফুটে বেরোচ্ছিল। অমনি একটা কষ্টে সহানুভূতিতে কৈকেয়ীর বুকটা হায় হায় করে উঠল। নিজেকে ধিক্কার দিল;

ক্রোধের বশে খামকা দশরথকে কতকগুলো কটু কথা বলে তাকে দুঃখু দিল। নিজেকেও অকারণ ছোট করল। এ সব কথার কোন মানে নেই, তবু মুখে এল। তাই, একটা নিদারুণ আত্মানুশোচনায় বুক জ্বলা করতে লাগল। কষ্টকর লজ্জা ও দুঃখের অনুভূতি অগ্নিদগ্ধ মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল। আকুল স্বরে বলল: জানো, নিজের উপর ক্রোধ হয়, দুঃখ্য হয়। কেন? কেন তোমাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাওয়ার তৃষ্ণা জাগল বুকে? মন থেকে তোমাকে মুছে ফেলতে কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। নিজের কাছে যত হেরেছি ততই তোমাকে জয় করার এক দুর্মর জেদ আমার বুকে কেশর ফোলা সিংহের মত কেবল রাগে গজরাতে লাগল। আমি পারলাম না নিজেকে বশে রাখতে। আমার প্রতি তোমার দুর্বলতা অনন্ত। তবু তোমার মন, দেহ, আত্মা আমার একার নয়। আরো অনেকের ভাগ আছে তাতে। এই শরীকানা আমার অসহ্য। তাই, তোমাকে দেখলে আমি কেমন হয়ে যাই। আমি তখন আমার মধ্যে থাকি না। হিংস্র বাঘিনী যেমন অব্যর্থ লক্ষ্যে তার শিকারের দিকে এগিয়ে আসে তেমনি করে আমিও তোমার দুর্বলতার উপর চোখ রেখে সন্তর্পণে এগিয়েছি। কিন্তু উত্তেজনা বশতঃ ঠিক রাখতে পারিনি নিজেকে। নিষ্ঠুর কথায় ক্ষত বিক্ষত করতে একটা বর্ব্বর আনন্দ পাই। কিন্তু যে মুহূর্তে তোমার মুখখানা করুণ হয়ে উঠে, কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণা ফোটে, অমনি কেমন একটা মায়াতে, কষ্টেতে আমার বুক টনটন করে।

আত্মানুশোচনায় কেমন ভিজে ভিজে মনে হল কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বর। জলভরা দুচোখে একটা নিবিড় ব্যথা ঘনিয়ে উঠল। ধরা গলায় বলল: বিশ্বাস কর, বড় রাণীর জন্যে আমারও কষ্ট হচ্ছে। বুকফাটা হাহাকারের মত তার কথাগুলো শোনাল।

বিস্ময়ে দশরথের চোখদুটো ছটফট করে উঠল।

কৈকেয়ী দু'চোখে ছাপানো উদ্গত অশ্রু গোপন করতেই যেন দ্রুত অস্থির পদক্ষেপে কক্ষান্তরে চলে গেল।

সরযূর নবনির্মিত প্রাসাদের সবটা কৌশল্যার এখনও ভাল করে দেখা হয়নি; তবু এখানে আসার দিন থেকে সে ভীষণ অস্থির। অশান্ত মনকে কিছুতে শান্ত করতে পারছিল না। একা একা আনমনে কাটায় সর্বক্ষণ। কয়দিনে সে রোগা হয়ে গেছে। অনেক কান্নার চিহ্ন পড়েছে চোখের কোনে। চুলে এলোমেলো ভাব। পোশাকে পারিপাট্য নেই। কেমন একটা দুঃখী-দুঃখী ভাব।

অযোধ্যায় প্রাসাদ যে তার জীবনে কতখানি জুড়ে আছে তা যেন এতদিনে খুব স্পষ্ট ভাবে অনুভব করল। শূন্যগর্ভা একাকীত্বে ভরা দিনগুলো তার কাছে অযোধ্যার প্রাসাদের কত স্মৃতি বহন করে আনে। মনোরম কক্ষ, সুন্দর উদ্যান, প্রজাদের নীরব ভালবাসা, শ্রদ্ধার পূজা, নিজের হাতে রচনা করা সংসারের স্মৃতি এসব ছেড়ে এখানে

থাকতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। প্রাসাদ যে শুধু ইট কাঠ পাথরে তৈরী নয়! মানুষের মমতা, স্নেহ ভালবাসা প্রেম দিয়ে তৈরী এক নীড়। ঐ প্রাসাদে যা কিছু আছে, সব কিছুর মধ্যেই একটা জীবন ছিল। সেসব এখানে কোথায় পাবে? বহুকাল ধরে একটি পরিবারের মধ্যে সুখে দুঃখে, আনন্দে বসবাস করতে করতে সেখানে একদিন প্রাণ জেগে উঠেছিল। আজ তার শূন্যতা বুক ভাঙা এক শোকের মত অনুভব করতে লাগল।

হৃদয় মথিত করে কৌশল্যার বুক ঠেলে এক কান্না বেরিয়ে এল। যে কান্না গিলে গিলে সে বিস্ময়ভরা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তবু অশ্রু বাধা মানল না। চোখ বেয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ল।

সুমিত্রা কৌশল্যার সঙ্গেই থাকে সর্বক্ষণ। কৌশল্যার বেদনাঘন করুণ মুখখানার দিকে পিপাসার্তের মত করুণ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর নিজের মনেই কাপড়ে ফুল তুলতে লাগল। মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছিল।

কৌশল্যার আবেগমথিত কান্নার চাপা শব্দে সুমিত্রা চমকাল। অমনি সেলাই ফেলে তার কাছে ছুটে গেল। মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে চোখ মুছিয়ে দিল। ভেজা গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ কেঁদোনা মহারাণী।

কৌশল্যা আরো ফুঁপিয়ে উঠল। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সুমিত্রার বুকে। সুমিত্রার দু'চোখ বেয়ে ধারা গড়িয়ে পড়ল। দু'জনে দু'জনকে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল। কেঁদে হাল্কা হল। তারপর যখন আর কাঁদতে পারছিল না, তখন তাদের ভীষণ ক্লান্ত এবং অবসন্ন দেখাচ্ছিল। কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে সুমিত্রা কান্না জড়ানো গলায় বলল ঃ তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না। কৈকেয়ী নামে ওই হিংস্র রাক্ষসী তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী।

সুমিত্রার বুকের উপর মাথা রাখল কৌশল্যা। ক্লান্ত স্বরে উচ্চারণ করল ঃ ভগিণী আমি যে তাকে ছোট বলে বিশ্বাস করেছিলাম।

জানি বোন। তুমি রাক্ষুসীকে সঠিক পরিমাপ করতে পারনি। সক্ষম হওনি তার হৃদয়ের গভীরে প্রমত্ত ক্ষমতা লালসা পরিমাপ করতে। অযোধ্যার গৃহে তোমার মহিমা তাকে ঈর্ষায় হন্যে করেছে। তোমার গৌরব নষ্ট করার জন্য রতিপ্রিয় রাক্ষুসী চৌষট্টি কামকলায় রাজাকে একেবারে সাপের মতন দেহের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে তার মন প্রাণ, বুদ্ধি-বিবেক-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। মেয়ে মানুষের দেহকে কাজে লাগিয়ে যে, পুরুষকে ভেড়া বানানো যায়, তাকে দিয়ে যা খুশি করা যায় রাক্ষুসী তা ভালই জানে। মায়াবিনীর খপ্পরে পড়ে রাজা হয়েছে অমানুষ।

হাঁ, আমি সব জানি। গভীর কালো চোখ তুলে বলল কৌশল্যা। বুদ্ধি আর শরীরের সৌন্দর্য'ই ওর ঐশ্বর্য। তার বাণী রাজার কানে মধুবর্ষণ করেছে। সে বাণী প্রিয়তর হয়ে উঠেছে রাজার। আমরা'ত রমণী, পারলাম কোথায় রাজাকে আমাদের করে নিতে? পুরুষকে বশ করার শক্তি নারীর কি নরকুল, কি

দেবকুল—উভয় কুলে ধন্য। বিশ্বের অধীশ্বর ভোলা মহেশকে যেমন মহেশ্বরী তার পদপ্রান্তে দীন আশ্রিতের মত রেখে দিয়েছে তেমনি কৈকেয়ী নারীশক্তির নিগূঢ় প্রেরণায় মহারাজকে আপন বশে রাখার শক্তি যদি দেখিয়ে থাকে তাহলে তাকে নিন্দা করব কোন্ দুঃসাহসে? বলিষ্ঠ উষ্ণবীর্য পুরুষ জীবনের যে বিরাট অংশে তার এক নির্জন নিরাত্মীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল কৈকেয়ী হঠাৎ তাকে পূর্ণ করে দিল। তার প্রখর উত্তাপ আমার স্নিগ্ধ অস্তিত্বকে প্রবল ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দিল। ছোটর জ্বলন্ত যৌবনের আগুনে দগ্ধ হল মহারাজ। পতঙ্গের মত সে আগুনে নিজেকে দগ্ধ করতে তিনি এক উল্লাস অনুভব করছেন। জীবনেরই অমোঘ অলিখিত দুর্বার অনিয়মে তিনি কৈকেয়ীর আকর্ষণে ধরা পড়েছেন। আর এক অজ্ঞান সম্মোহনের তন্ময় প্রভাবে তুমি আমি তুচ্ছ হয়েছি তাঁর কাছে। এই নির্লজ্জ উল্লসিত অধ্যায়ের আমরা যে কেউ নই তাঁর!

সুমিত্রা অবাক হল। কৌশল্যার কণ্ঠস্বরে রাগ নেই। শুধু বেদনা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল সুমিত্রা। তারপরে তার কণ্ঠে বিদ্বেষ ফুটে উঠল। বলল: তোমার বাণী তোমারই উপযুক্ত। তবু রাক্ষুসী শত্রু তোমার। তোমার প্রতি তার ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা অশ্রদ্ধার কথা মনে রেখে কিছু কর। তোমাকে যে রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়েছে তাকে ক্ষমা করতে মন সায় দেয় না আমার।

মেজ, যে রাজ্য সুখ আর ঐশ্বর্য ত্যাগ করে এসেছি তাকে ফিরে পাওয়ার কোন লোভ নেই। ছোট রাণীর ভয় আমাকে নিয়ে। তার সুখের কাঁটা হয়ে তার সঙ্গে বাস করা অপমানকর। তাই এই স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করে মহারাজ এক আসন্ন বিরোধ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে রাখলেন। সংঘাতের অস্ত্ররূপে মহারাজকে কেকেয়ী যাতে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য আগে থেকে সে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে অকেজো করে দিলেন। কারণ, কৈকেয়ীর সংগে বিরোধ বাধলে আমরা হেরে যাব। সেই হার ঠেকানোর জন্যে এই নয়া ব্যবস্থা।

তুমি খুব সরল দিদি। মহারাজ যা হোক একটা কিছু বলে তোমাকে বুঝিয়ে দিল। আর তুমিও তা বিশ্বাস করলে। এর উল্টোটা যে হয় বা হতে পারে সে কথা ভাবলে না কেন?

সংশয় বাড়িয়ে দিওনা আর। আমিও জানি কৈকেয়ীর আসা থেকেই পারিবারিক অন্তর্বিরোধের অন্তঃস্রোতে রাজপরিবারের স্বাস্থ্য ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হচ্ছিল। তার সে সূক্ষ্ম ক্ষয় প্রথম প্রথম চোখে পড়ত না। তারপর, আমার ও তার রেষারেষিতে, ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাত ক্রমে তা গভীর ও জটিল হল। তার অবনতি আরো হলে, হঠাৎ রাজপরিবারের স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে পারে। এ ধরণের বিরোধের প্রশ্রয় দেয়া সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই সময় থাকতে তাকে অকেজো করে দেয়া হল। মহারাজ এসব আমায় খুলে বলেছেন। মহামাত্য সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠ আছেন আমাদের দেখা-শোনা করতে। কর্তব্যের আহ্বানে তাঁদের যা করা উচিত বলে ভাববেন, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব না।

সুমিত্রার নীরব বিস্মিত চোখ কৌশল্যার চোখের উপর স্থির। তাদের নির্বাসনের পেছনে এতবড় একটা পারিবারিক কলহ লুকোন আছে আগে কখনও জানত না সে। ভাবিনি, তাদের দিয়ে এমন এক কুৎসিৎ আত্মসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে দশরথ। কিন্তু এ রাজনৈতিক কূটবন্ধনের মূল কোথায়? দশরথ আত্মরক্ষায় কেন অসহায় বোধ করছেন? কৈকেয়ীকেই বা তাঁর ভয় কেন? অনেক মিথ্যে, অনেক ছলনা দিয়ে কোন্ জয়লাভ তাঁর উদ্দেশ্য? বিরোধের কোন্ ঘূর্ণিপাকে রাজঅন্তঃপুর এমন জড়িয়ে পড়ল যে, তার থেকে মুক্তির পথ আর খোলা নেই? বড় রাণী ছোট রাণীর রেষারেষি রাজনীতি হয়ে গেল কেন? রাজ পরিবারের বিরোধ রাজ্যের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করবে কেন? কেন রাজ্যের সঙ্গে রানীদের ব্যক্তিগত জীবন রাজনীতি হয়ে উঠল? কেন?

এই সব প্রশ্ন সুমিত্রার বুকের ভেতর পাক খেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাই সে কথা বলতে পারল না। এক বিমর্ষ ভাবনায় তার গৌরবর্ণ মুখখানা পাণ্ডুর হয়ে রইল।

সুমন্ত্র বশিষ্ঠের মত ধুরন্ধর মন্ত্রীদের গোপন অবস্থানের মূলে যে এক কূট-রাজনীতি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই রাজনীতির চেহারা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছিল না। বশিষ্ঠের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আছে। রাজমহিষীর প্রতি জননীসুলভ শ্রদ্ধা ও আস্থা আছে। সুমন্ত্র অসাধারণ, ধূর্ত্ত, কর্মে ও সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষিপ্র। দশরথও জানেন এই দুজনের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে অযোধ্যায় রাজত্ব করা যায় না। অথচ এঁরা দুজন কৌশল্যার অত্যন্ত প্রিয় ও অনুগত বান্ধব। এঁদের কাছ থেকে কৌশল্যা সর্বদা উঁচুদরের সহযোগিতা এবং পরামর্শ পাবে। সেকারণ এঁদের চটানো যায় না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কৌশল হিসাবেই হয়ত তাদের কৌশল্যার রাজনৈতিক মন্ত্রনাদাতা করে পাঠিয়েছে। রাজনীতির গোলক ধাঁধায় সুমিত্রা তার চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল। বুকের ভেতর থেকে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস তার নেমে এল। বিমর্ষ ভাবনায় মুখের হাসি বাঁকা হল। বলল: মহারাণী, রাজপুরীতে তোমার সম্মান, গৌরব, খ্যাতি যে তোমার নিজের জন্যে হয়েছিল, আজ বুঝলাম। তোমার দুর্বলতার যেমন শেষ নেই, তেমনি শক্তিতেও তুমি অসামান্যা। মহতের সঙ্গে মহৎ ব্যবহার কর তুমি। আবার কাঁটা দিয়ে পায়ের কাঁটাও তুলতে পার।

সুমিত্রার আন্তরিক স্পষ্ট ভাষণে চমকে উঠল কৌশল্যা। কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সুমিত্রার কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে তার বেশ সময় লাগল। তারপর ম্লান হেসে বলল: তুই আমার প্রিয় সখি। সুমিত্রও বটে। তোর কাছে কোন কথা গোপন করব না। রাজনীতির নোংরামি আমার সহ্য হয় না। তবু একটা ঠাণ্ডা লড়াই আমার ও কৈকেয়ীর মধ্যে ছিল। সেটা যে প্রকৃত কিসের লড়াই, আর কেন যে অপছন্দ তাকে ঠিক করে বুঝিয়ে বলতে পারব না। একদিন সুমন্ত্র চুপি চুপি আমায় বলল: অযোধ্যার রাজগৃহে আমার শত্রু

অনেক। এখানে থাকা একটুও নিরাপদ নয়। রাজধানীর বাইরে প্রাসাদ তৈরী হয়েছে। সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে। কৈকেয়ীর দৃষ্টি এড়িয়ে থাকাই নাকি দরকার। রাজনীতি, দলনীতি বুঝি না। ওরা আমার সন্তানের মত। প্রকৃতপক্ষে, ওরা ছাড়া নির্বান্ধব পুরীতে আর কোন বান্ধব নেই আমার।

হাসি হাসি মুখ করে সুমিত্রা বলল: তোমার কথা শুনতে বড় মজা লাগছে। বিস্ময় বাড়ছে।

কৌশল্যা নিঃশ্বাস চেপে নীরব হল। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল খুব ধীরে। বলল: ভাগ্যের হাতে এক অসহায় বন্দী আমি। আশা, নিরাশা, হতাশা যন্ত্রণার কি গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে যে ভুগছি আমি, তার কোন হিসাব নেই। আমার ভয়ংকর মানসিক সংকট চলছে। আমি নিঃসহায় বেদনায় ক্লান্ত। আমার স্বার্থ কি উপায়ে নিরাপদ করা যেতে পারে তার ভাবনা মন্ত্রীদের। কিন্তু আমি'ত এসব কিছু চাই না। তবে কাকে নিয়ে কিসের লড়াই? সে লড়াইর খেলায় কোন্ বিজয়মাল্য পাব আমি, তাও জানি না? কেবল রাজমহিষীর কর্ত্তব্যবোধে, রাজ্যের স্বার্থে এক কঠিন কাজ করছি।

সুমিত্রার বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল: তোমার কোন কথা আমার মাথায় ঢুকল না। এক নারীকে নিয়ে ভাগ্যের এই লড়ালড়ি কেন? সর্বনাশিনীকে রাজা কেন দূর করে দিচ্ছে না?

কৌশল্যা চুপ করে ছিল। স্বামী নিজের হাতে তার জীবনের কপালের উপর খিল এঁটে দিল। সেখানে চেঁচিয়ে কোন ফল নেই। করাঘাত করে লোক জানাজানি করা আরো লজ্জার এবং বিপদের। শরবিদ্ধ হরিণীর মত অসহায় দৃষ্টিতে করুণ চোখে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে রইল।

স্বপ্নের মত দিনগুলো মিলিয়ে যেতে লাগল। দিনে দিনে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া নামল কৌশল্যার প্রাসাদে। সর্বংসহা শান্ত ভাষিণী রাণী কৌশল্যার চোখে দিন দিন ফুটে উঠতে লাগল কৈকেয়ীর সর্বনাশিনী রূপ। মায়াবিনীর যাদুতে ভুলে আছে রাজা। কৈকেয়ীর কথা শুনলে কৌশল্যা ভয়ে শিউরে উঠে। আজকাল দশরথকেও তার সন্দেহ। দশরথকে দেখলে তার অন্তর ডুকরে কেঁদে উঠে। স্বামীর এত অনাদর, অবহেলা আর সইতে পারে না। এর চেয়ে মৃত্যু হল না কেন? কৈকেয়ী অযোধ্যায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য দেবতা কেন তার প্রাণটা নিল না? প্রাসাদের শূন্য কক্ষের অত্যন্ত নির্জনতায় এক সব হারানোর আর্ত্তনাদ গুমরে উঠল তার বুকে। পাগলের মত বলল, ঠকিয়েছ! তোমায় বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি রাজা।

বর্ষা নামল।

উপরে জমাট কালো মেঘ নিথর নিস্তব্ধ। নীল আকাশের চিহ্নমাত্র নেই।

অঝোরে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। অসহায়ের মত গাছপালা, বন পাহাড়,

নদী উদ্যান সব ভিজছিল। ছাই ছাই অন্ধকারের মধ্যে সবকিছু অস্পষ্ট। দূরে উদ্ভাসিত নদীরেখাও অস্পষ্ট। বট, শাল, মেহগিনি, অশ্বত্থের মত বনস্পতিরা প্রবল বাতাসে এদিক ওদিক করছিল। তাদের পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় এক দুর্বোধ্য জটলা। প্রকৃতিতে বর্ষার সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস। মাটির ঢাল বেয়ে তর্ তর্ করে বৃষ্টির জলধারা গড়িয়ে চলেছিল। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা টেপা টেপা হয়ে ভেসে যাচ্ছিল ঘোলা জলে।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় কক্ষসংলগ্ন ছোট্ট ঢাকা ঝুলান বারান্দায় বসে দশরথ রূপসী বর্ষার রূপ সম্ভোগ করছিল। অনাগত দিনের এক বিচিত্র অভিব্যক্তিতে বর্ষাঋতু নিজে স্তম্ভিত। নীরব অধরা রূপসী বর্ষার উদাস, শান্ত বিষণ্নতা তাকে মুগ্ধ করল। দু'চোখে তার খুশি উপছে পড়ল। এই বিচিত্র বর্ষা ঋতুর সঙ্গে তারও যেন কোথায় একটা নিবিড় যোগ রয়েছে।

এক না জানা পরম তৃপ্তির আবেশে মন ভরে গেল দশরথের। ভাষাহীনতার অনুভূতিতে কেমন উদাস অন্যমনস্ক সে। ভাষাহীন অতল স্তব্ধতার রাজ্য তার গহন অতল বুকে এক নির্বাক ভাবনা জাগিয়ে তুলল। নিজের অন্যমনস্কতায় ডুবে গিয়ে সে যে কখন, আত্মমুখী বর্ষার মত নিজের কথা ভাবতে সুরু করেছিল নিজেই জানে না।

তিন রাণীই সন্তান সম্ভবা। তারই ঔরসে গর্ভবতী তারা। এই দারুণ সংবাদে মন তার নবীন বর্ষার মত খুশি হয়ে উঠল। একটা সুন্দর অনুভূতিতে বুক শিরশির করতে লাগল। স্নেহের আবেগ উথলে উঠল বুক। তিনটে কাল্পনিক মুখ ভেসে উঠল তার চোখের তারায়। সন্তানকে কোলে করে রাণীরা শিশুর তুলতুলে কচি মুখপানে তাকিয়ে নিজের মনে কত কথাই রচনা করছে। শরীরে হিল্লোল তুলে কথা বলছে। কথা নয় জননীর প্রলাপ। ঠোঁটে মুগ্ধ হাসির ঝলক। জননীর স্তনভরা অমৃত ধারা সন্তানের মুখে গুঁজে দিয়ে প্রসন্ন চিত্তে তার নরম দেহতে হাত বোলাচ্ছে। আর এক অসীম তৃপ্তিতে দুই চোখ বুজে আসছে। চুলগুলো হাত দিয়ে আঁচড়ে চূড়া করে বাঁধছে। চোখে কাজল পরাচ্ছে। কপালের মাঝখানে অসীম সুখে এঁকে দিচ্ছে ছোট্ট কাজলের টিপ। তারপর তার নরম গালের উপর গাল রেখে আদর করে, চুমা দিচ্ছে। স্নেহ ঢালছে। তিন রাণীর ছায়া ছায়া মূর্তি যেন এক হয়ে গেল দশরথের কল্পনায়। পৃথিবীর সব জননীই বোধ হয় কতকগুলো জায়গায় এক। তাই তিন রাণীর পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না কল্পনার ভেতর। জননী সত্তাতে তারা প্রতিভাত হল। মাতৃস্নেহের কতকগুলো পরিচিত দৃশ্য তার মন ছুঁয়ে রইল।

দশরথের বুকে রাণীদের মত স্নেহের ধারা নামল। তবে তার প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। জননীর মত নয়, কিন্তু স্নেহের আবেগের ধারা দুজনের এক রকম। দশরথের সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে আবর্তিত হল এক অদ্ভুত ভাবনা। নারী যে সন্তান গর্ভে ধারণ করে তার দেহ, আত্মা পুরুষের বীর্যে রক্তে তৈরী হয়। এই হিসাবে সে একজন স্রষ্টা। একজন সার্থক বীর্যবান পুরুষ। অথচ কিছুকাল আগেও এই অনুভূতি তার ছিল

না। পুরুষত্বের অভাবে তার ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার। বর্তমান তার অস্তিত্বকে নিয়ে টিম্ টিম্ করে প্রদীপের মত জ্বলছিল। মৃত্যুর পরেই সে আলো চিরতরে নিভে যেত। নিঃশব্দে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব নিঃশেষ হয়ে যেত। কিন্তু রাণীরা সন্তান সম্ভবা হওয়ায় এক অদ্ভুত সুখ, আনন্দ, আকাংখা, স্বপ্ন, সাধ তার ধমনীর মধ্যে তরল আগুনের স্রোতে বইছিল।

দশরথের মুখে আনমনা হাসি হাসি একটা ভাব। স্বপ্নের ঘোরে নিশ্চুপ, অকম্পিত স্থির দুই চোখের তারায় কৈকেয়ীর মুখ। সে মুখ কোনকালে ভোলার নয়। কৈকেয়ীর স্বর, দৃষ্টি কৈকেয়ীর মত ছিল না। দশরথ তাই থমকে অপ্রস্তুতের মত চমকে জিগ্যেস করেছিল ঃ তোমাকে এত অশান্ত ত কখনও দেখিনি ছোট রাণী ? শরীর ভাল'ত ?

কৈকেয়ীর চোখের ঝটায় আগুন ঝলকাল। মুখে কৌতুকপরায়ণতার অভিব্যক্তি নেই। উত্তেজিত আচ্ছন্নতায় তার ভুরু কোঁচকাল। দশরথের কথায় কৈকেয়ীর ক্রোধ দুর্বিষহ হল। সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে একটা তীব্র অতৃপ্তি মনের বীণায় ঝংকারে বাজছিল কেন ? কেন ? আর সেই বারংবার প্রশ্ন তার বুকে আঘাত হানছিল। অসহিষ্ণু আবেগে কাঁপছিল তার দুই অধর। কপট অবাক স্বরে ব্যঙ্গ করল। বলল ঃ মহান রাজার করুণার অন্ত নেই ! সব দিকেই তার দৃষ্টি। কেবল মহিষীর অশান্তি দূর করার উদ্যোগ নেই।

কৈকেয়ীর বাক্যে দশরথ মর্মাহত হল। তবু কৈকেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে তার অকারণ রাগ বিতৃষ্ণার কারণ খুঁজল। অবাক জিজ্ঞাসু চোখে অপরাধীর মত তাকিয়ে আফশোষ করে বলল ঃ ইদানীং তোমার কি হয়েছে যেন ? আমাকে মোটেই সহ্য করতে পার না !

কৈকেয়ীর ভ্রূকুটিমুখ শক্ত হল। নাসারন্ধ্র স্ফীত হল। কঠিন গলায় ভর্ৎসনা করে বলল ঃ স্বার্থপর পুরুষ মানুষ শুধু নিজের সুখ আর তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রী কি চায়, কি পেলে তার সুখ হয়, মন ভরে উঠে, তার খোঁজ নিয়েছ কখনও ? আমি যে মা হতে চাই, এই কথাটা নিজের মুখে না বললে কি নয় ? জননীত্ব নারীর রক্তের বীজ। এটুকু না পেলে তার জীবন মরুভূমি হয়ে যায়। জীবনের অবলম্বন, আশ্রয় বলে কিছু থাকে না। বুকের ভেতর তার খাঁ-খাঁ করে। জীবনটা অভিশপ্ত মনে হয়। নিজেকে বড় অসহায় লাগে। নিবীর্য পুরুষ নারীর জীবনে অভিশাপ।

অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দশরথ শুনল। কোন জবাব দিল না। কেবল অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাথা নাড়ছিল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কাটার পর দশরথ হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অসহায় ভাবে বলল ঃ তোমার তিরস্কার আমার পাওনা। প্রতিবাদ শোভা পায় না।

দশরথের নির্বিকার জবাব কৈকেয়ীকে অবাক করল। প্রথমটা তাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে তার মুখের ভাব, চোখের চাহনি বদলে

গেল। নিষ্ঠুর উদাসীন স্বামীর উপর তার প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা ক্ষণিকের জন্য তাকে উন্মাদ করে তুলল। দাঁতে দাঁত দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করলঃ তোমার এই চিকিৎসা চিকিৎসা খেলা শেষ হবে কবে? বৈদ্যমশাই বলেন কি? তাঁর ঔষধে কৈকেয়ীর জননী-সাধ পূরণ কি হবে?—কবে? আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে আমাকে? তোমার মত একজন অক্ষম পুরুষ স্বামী হওয়ার অযোগ্য। এতগুলো মেয়ের জীবন নষ্ট করার কোন অধিকার তোমার নেই। তবু তুমি সেই কাজ করলে, কেন? তাদের সুখ, আনন্দ থেকে কেন বঞ্চিত করলে? এদের জন্য তোমার কষ্ট হয় না? তাদের শুকনো মুখে হাসি ফোটানোর কোন্ দায়িত্ব স্বামী হয়ে তুমি পালন করলে? আমরা শুধুই কি তোমার খেলনা? মেয়েমানুষ বলে কি আমাদের হৃৎপিণ্ড নেই, মগজ নেই, বোধশক্তি নেই?—সাধ-ইচ্ছা আকাংখা বলে কিছু থাকতে নেই? বল রাজা, বল?

কৈকেয়ীর জিজ্ঞাসা এত আকস্মিক ছিল যে দশরথ কথা বলতে পারল না। এরকম একটা প্রশ্ন সে প্রত্যাশা করেনি। কৈকেয়ীর জিজ্ঞাসার মধ্যে এমন একটা ইংগিত ছিল যা তার অযোগ্যতাকে বিদ্রূপ করছিল। আর ভিতরে ভিতরে একটা ভীষণ লজ্জা তাকে নুইয়ে দিচ্ছিল। ব্যর্থতা তার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে তাকে ব্যঙ্গ করছিল। কৈকেয়ী সব জেনেও তাকে অপমান করল কেন? এর অর্থ, তার জীবন যে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে সেটা বুঝিয়ে দেয়া। অনিবার্য ব্যথার মধ্যে এক অভূতপূর্ব লজ্জা আত্মানুশোচনায় ঝংকারে বেজে উঠল তার ধমনীতে। আগেও বার বার বেজেছিল কিন্তু তার মধ্যে এত স্পষ্টতা ছিল না। কৈকেয়ীর অতৃপ্ত কামনা অনুভূত হয়েছিল তার প্রতি অঙ্গে। আর ভয়ে সংশয়ে প্রত্যাশায় সে নিজেকেও আবিষ্কার করল যে শরীরের প্রতি কোষে কোষে তারও যেন কোন এক অজ্ঞাত সত্তার উল্লাস যন্ত্রণা দিচ্ছে। মনে মনে এক অন্য পুরুষ হয়ে ওঠার সংকল্প জাগল।

কৈকেয়ী এক গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। দশরথ নীরব। তার থম থমে মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করলঃ কেন এই লোকটা ছাড়া সে আর কিছু ভাবতে পারে না। এই নিষ্ঠুর উদাসীন পুরুষটা তাকে যাদু করেছে। দশরথ তার জীবনে এক অদ্ভুত জটিল রহস্য।

দশরথকে তিরস্কার করে তার বুকটা হাল্কা হল। দশরথের কষ্টে তার বুক আবার চন্ চন্ করে উঠল। হঠাৎ কোথা থেকে বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, গভীর ভালবাসা। সেই দুকুল ছাপানো ভালবাসার আবেগে তার বুকে অনুশোচনা জাগল। কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ল তার মূর্ছনা। বল রাজা এটা কি জীবন? জীবন আমাকে কি দিল, আমিই বা কি দিলাম তাকে? আমার বুকের ভেতর যে স্নেহ সাগর টলটল করছে সেখানে অবগাহন করার সুখ কে দেবে আমায়? নারীর স্থান ছোট্ট গৃহকোণে। ধন নয়, মান নয়, ঐশ্বর্য নয়, সাম্রাজ্য নয়, শুধু মাতৃত্ব। বুকের ভেতর থেকে একটা কিছু নিষ্কুণ্ডল হয়ে পাক খেতে খেতে মুখের কাছে উঠে আসে। অথচ আমার স্বামী আছে—। কথাটা যখন মনে আসে তখন কি

মনে হয় জান? অনেক কিছু আমার মনের মধ্যে হয়, আর আমি নিজেও তার সব বুঝি না। তুমি যদি জিগ্যেস কর আমি বলতে পারব না।

কৈকেয়ী আবেগের ঘোর লাগা আচ্ছন্ন দুই চোখে দশরথের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর দশরথ বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে কৈকেয়ীর যন্ত্রণাকাতর আর্ত্তি সম্যক উপলব্ধি করল। তথাপি কোন জিজ্ঞাসাই তার কণ্ঠস্বরে ফুটল না। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দ আর্ত্তনাদে মাথা কোটে। কৈকেয়ীর এতো সাহসী প্রগলভতা দশরথ কল্পনা করেনি। জীবনের বাস্তব কি আশ্চর্য। স্থান ও কালের পরিস্থিতির এই মুহূর্ত্তটি দশরথের কাছে অদৃষ্টের এক অমোঘ সংকেতরূপে আবির্ভূত হয়। নিজের অজান্তে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকল ছোট! ভুলে যাও আমি তোমার স্বামী। ভাববে আমি মৃত। ছায়ার মত আছি তোমার সঙ্গে। আমার জীবনের এক পিঠে তুমি, আর এক পিঠে মরণ। বলতে বলতে দশরথের গলার স্বর হারিয়ে যায়। রুদ্ধতা গ্রাস করে। বাঁধা তারের মত যন্ত্রণায় ঝংকার তখনও রিন্ রিন্ করে বাজে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভাঙা গলায় কাঁপা স্বরে বলল: বিশ্বাস কর এরকম চোরের মত আর লুকিয়ে থাকতে পারছি না। আত্মগ্লানি, ধিক্কার প্রতিমুহূর্ত্ত আমাকে মারছে। আমিও তোমাদের মত দুঃখী। আমারই বা কে থাকল, বল? এই লুকিয়ে থাকা, পালিয়ে বেড়ানো থেকে আমিও নিস্কৃতি চাই। কিন্তু পাচ্ছি কৈ?—হঠাৎ যেন ভিজে ওঠে দশরথের কণ্ঠস্বর। কালো চোখের কোণ জলে চিক্ চিক্ করছিল, যদিও কান্নার চেয়ে যন্ত্রণা আর কষ্টের ছাপ তার মুখে গভীর।

বাইরে ঝম ঝম করে তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। পাতার মর্মরে, ঝিল্লীর স্বরে, ভেকের হর্ষে, বর্ষার নিজস্ব সঙ্গীতের এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরী হল। দশরথ একদৃষ্টে দূরের ঝাপ্সা দিগন্তের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। এক আত্মতৃপ্ত প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যেতে মনে পড়ল ঋষ্য শৃঙ্গের মুখ। প্রভাতের নবোদিত সূর্যের মত স্নিগ্ধ মনোরম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ঋষ্যশৃঙ্গের সর্বাঙ্গ থেকে। শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত কোন ঈশ্বরের মূর্ত্তির মত সুঠাম তনু তার। মসৃণ ত্বক বিশিষ্ট এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবা পুরুষ। ঢুলু ঢুলু দুই চোখে ধ্যানের ঘোর। শান্ত, নির্বিকার বেদনাহীন দুই চোখের দৃষ্টিতে কিসের একটা মুগ্ধতা। বিচিত্র এক শিহরণে দশরথের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত কেঁপে গেল। তরুণ তাপসের মাথা ভরা জটা চুড়া করে বাঁধার জন্যে তাপস মূর্ত্তিতে জ্বলজ্বল করছিল। তার কণ্ঠে, বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। রিক্ততার সৌন্দর্যেই অপরূপ লাগছিল তাকে। সম্মোহিতের মত তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দশরথের মনে হল, স্বর্গলোক থেকে যেন নেমে এসেছে দেবদূত। অলৌকিক যৌবনশ্রী। নারীসুলভ দেহ সৌষ্ঠবের ভেতর কি যেন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য লুকোন ছিল যার দিকে একবার তাকালে দৃষ্টি ফেরানো কঠিন হয়। স্নিগ্ধ, নম্র, শান্ত দুই চোখে এমন এক অপার্থিব দীপ্তি ছিল যা তার গোপন গভীর এক শক্তির সংকেত দিচ্ছিল। দশরথের সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বল স্বপ্ন। ঋষিপুত্র কোন যাদুমন্ত্রে তার অন্তরের ক্লেদ, পঙ্কিলতা নিঃশেষে মুছে দিয়ে এক অনির্বচনীয়, শান্তি,

সুখ আর তৃপ্তি তার হৃদয়পাত্র কেমন করে ভরিয়ে তুলল, চিন্তা করে পেল না। অভূতপূর্ব আবেগে আর আনন্দে তার দুই চোখ বুজে এল। আর বুকেতে তরুণ তাপসের মধু নিঃসৃত কণ্ঠের বাণীগুলো মন্ত্রের মত নিঃশব্দে রণিত হতে লাগল।

রাজা, জনকত্বের সব লক্ষণ তোমার শরীরে আছে। নির্ভাবনায় রাজ্যে ফিরে যাও তুমি। শীতের শেষে, নব বসন্তের প্রথমে তোমার রাজধানীতে যাব। বৎসরকাল ধরে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করব। ঐ সময় কতকগুলো বিধি তোমাকে পালন করতে হবে। যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নারী সংসর্গ করবে না। কঠিন সংযমে থাকবে। স্ত্রীলোকের চিন্তা থেকে চিত্ত বিরত রাখবে। মোহের বশে কিংবা রিপুর তাড়নায় ভ্রষ্ট হলে যজ্ঞ ফল ব্যর্থ হবে। অগ্নিকুণ্ডু নিভে যাবে। নিস্ফল অশুভ ফল ভয়ংকর। একমাত্র আত্মসংযমী এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির এই যজ্ঞ করার অধিকার। তাদের উপর প্রতিনিয়ত আমার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

দশরথের সমস্ত সত্তার ভেতরে ভেতরে দূরাগত স্নিগ্ধ গম্ভীর মন্ত্রস্বরের মত বাজতে লাগল তার মধুশ্রাবী কণ্ঠের সেই বাণী। রাজা তুমি সংযমী হও তা হলেই সন্তানের মুখ দেখবে।

ঋষ্যশৃঙ্গ সত্যিই তার স্বপ্ন সার্থক করল। তার জীবনের এক নতুন গ্রন্থের সূচনা করল। জনকত্বের অনুভূতি, উপলব্ধি, আনন্দ বোধ হয় প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পৃষ্ঠা। আর তার উপক্রমণিকা ঋষ্যশৃঙ্গের গল্প। গল্পই বটে। সাধারণ গল্প নয়, অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প। ছোট্ট একটা জীবনে কত ঘটনার ছায়া পড়েছে তার সীমা পরিসীমা নেই। ঋষ্যশৃঙ্গ সত্যিই তাকে এবং সকলকে অবাক করেছে। যা পাওয়ার কথা নয়, তাই পেল সে জীবনে। এক অদ্ভুত আশ্চর্য পাওয়া। এর স্মৃতি ভুলবার নয়। আর সকলের মত একটা স্বপ্ন নিয়ে সেও ছিল মশগুল।

কিন্তু দিন যত গেল ততই অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাগুলো আরো স্বচ্ছ হয়ে উঠল বুদ্ধির বিশ্লেষণে। তার পুরুষত্ব অর্জনের গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অথচ কি সুন্দর ধর্মের মলাট লাগানো হয়েছে তাতে। মলাটটা না খুললে ভিতরের ছবি দেখা যাবে না। কিন্তু এই মলাট ব্যাপারটার সঙ্গে মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস এমন ওতপ্রোত মিশে আছে যে, তাকে বিচ্ছিন্ন করা শক্ত। তবু এক জিজ্ঞাসু মন তার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হল। ধর্মমলাট ছিঁড়ে এর রহস্য দেখার কৌতূহল জাগল দশরথের। ঋষ্যশৃঙ্গের যাদুমন্ত্রই বা কি তার রহস্য ভেদ করতে ইচ্ছে হল।

মুহূর্তে অসংলগ্ন চিন্তাগুলো কেমন শৃংখলিত হয়ে গেল তার চেতনায়। চোখের তারায় ফুটে উঠল যজ্ঞের দৃশ্য।

পরিধানে কষায় বস্ত্র এবং গায়ে উত্তরীয় জড়িয়ে দশরথ প্রতিদিন সস্ত্রীক যজ্ঞ দর্শন করত। নিবিষ্ট মনে যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষ করত। তারপর, যজ্ঞ সম্পন্ন হলে ঋষ্য শৃঙ্গের স্বহস্তে প্রস্তুত চরু ভক্ষণ করত। এই চরু সোমলতা, দেশীয় গাছ গাছালির মূল ও পাতা, দ্রাক্ষারস, মধু, উৎকৃষ্ট তণ্ডুল সহযোগে পাক হত। সুস্বাদু

বলবর্ধক এই চরু রাণীদের সঙ্গে তাকে একত্রে ভক্ষণ করতে হত। এইভাবে এক ঋতু কাটল। পূর্বের মত ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ভাবটি দশরথের আর বোধ হল না। আরো একটি ঋতু যেতে বুঝতে পারল তার ভিতর একটা পরিবর্ত্তন ঘটছে। মনের হর্ষে আরো দুটি ঋতু গত হল। আগ্নেয় গিরির ঘুম ভাঙতে লাগল। দেহের কোষে কোষে নিদ্রিত পুরুষত্বের ঘুম ভাঙার সব লক্ষণগুলি প্রকট হল। রক্তের মধ্যে এ তার কোন দ্বিতীয় সত্তার জন্ম হল? আর মাত্র অবশিষ্ট এক ঋতু। এ ছিল এক কঠিন পরীক্ষা কাল। আশ্চর্য সেই স্মৃতি! অসিধারা ব্রতের মত এক নিষ্ঠুর, কঠিন আত্মসংযমের খেলা করতে হল প্রধানা মহিষী কৌশল্যার সঙ্গে। তার নীরব নিস্পৃহ নিরাসক্তিকে কৌশল্যা ভাবল নিষ্ঠুর প্রত্যাখান। স্বামীর অবহেলা মনে করেই কৌশল্যা নিজের মনের আগুণে জ্বলতে লাগল। তার অভিব্যক্তি থেকেই দশরথ বুঝতে পেরেছিল। আর তাতেই তার বুকের ভেতরে পাক দিয়ে উঠেছিল ছলো ছলো কান্নার ঢেউ। মনের যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তার বুকে। তবু চিত্ত চঞ্চল হয়নি দশরথের। পাষাণ মূর্ত্তির মতই সে নিষ্ঠুর আর বেদনাহীন ছিল। আগুনে পোড়া একটা সাপের মত ছটফট করতে করতে কৌশল্যা বাইরের বারান্দার ঘন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হল।

পরের দিন গতরাত্রির স্মৃতির নিদারুণ একটা গ্লানিকর অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন কৌশল্যা। নারীত্বের লজ্জা, অপমানের কষ্ট তার ঘন কালো আয়ত দুটি চোখের তারায় থমথম করতে লাগল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল ঋষ্যশৃঙ্গ। স্নিগ্ধ হাসি পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার মুখাবয়বে। মৃদু ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল: জননী তোমার চেতনার ভেতর সমস্ত সত্তার ভেতরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা পাকিয়ে উঠছে। কিন্তু কেন? সাধ্বী রমণী তুমি। এটুকু বোঝ না কেন; তুমি হারলেই মহারাজ জয়ী হবে, তার সাধনার সাফল্য হবে গৌরবময়। অনাচারে মহারাজ যা হারিয়েছিল, সদাচারে তা ফিরে পেল। সঠিক পথ থেকে তাঁর স্খলন ঘটানোর যন্ত্রণায় তোমার মন যদি বিদ্ধ হয়, অনুতাপে দগ্ধ হয় তাহলে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য যে যজ্ঞাশ্ব তুমি নিজে পরিচর্যা করতে তাকেই যজ্ঞ বেদীতে বলিদান করে আত্মগ্লানি মুক্ত হও। কামরূপী অশ্বকে বলি দিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ কর। এ রকম একটা কিছু হতে পারে ভেবেই অশ্বপালনের দায়িত্ব প্রথানুসারে মহিষীকে করতে হয়। কারণ ভবিষ্যৎ অজানা, একটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা মানব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। তোমার কাজের ফলশ্রুতিতেই তোমার ব্যর্থতা বা জয় আসবে। এটি নির্ভর করবে তোমার হৃদয়ের পবিত্রতার উপর। কাজের পরিণামেই আসবে গৌরব বা লজ্জা। এখন তোমার ভাগ্যে যা লিখিত তাই হবে। এটাই এ যজ্ঞের বিধি।

কৌশল্যার সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল। সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়াল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ঋষ্যশৃঙ্গের রক্তপদ্মের পাঁপড়ির মত পা দুটো জড়িয়ে ধরে কৌশল্যা অনেকক্ষণ

কাঁদল, প্রণাম করল। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে চলল যজ্ঞবেদী পার হয়ে যূপকাষ্ঠের দিকে।

অকস্মাৎ মাথার ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। আলোড়িত হয়ে উঠল তার চেতনা। ঋষ্য শৃঙ্গের যজ্ঞের ব্যাপারটা নিছকই একটা তুক্‌তাকের ঘটনা মনে হল। মানুষের সরল ধর্ম বিশ্বাসকে একটি দুরূহ জটিল চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে যুক্তি বুদ্ধির অতীত এক গল্প করে তুলল। লুকোন রহস্য দশরথের কাছে আচমকা ধবা দিল যেন। যাকে অলৌকিক স্বর্গীয় মনে হচ্ছিল তা যে একান্ত বাস্তব এবং সত্য এই অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসাই তীক্ষ্ন সন্দেহে মস্তিষ্কের মধ্যে আবর্তিত হতে লাগল। তালগোল পাকানো চিন্তাগুলো একটু একটু করে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হতে লাগল। আসলে কৈশোর থেকেই সে অতি স্বেচ্ছাচারী এবং অসংযমী। অতিরিক্ত রমণী সম্ভোগের ফলে তার প্রজনন শক্তি লোপ পেয়েছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ কার্যতঃ তার সেই প্রজনন শক্তি ফিরিয়ে আনতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান করল। ধর্মভীরু অসংযমী রাজাকে ধর্মের নামে সংযমী করতে বৎসর কাল ধরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করল। ধর্মীয় আচরণ বিধি পালনের নাম করে প্রকৃত পক্ষে চলতে লাগল চিকিৎসা। রাণীদের সঙ্গে তাকেও একসাথে হবি দান করতে হত যজ্ঞে। এর অর্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাকে আরো সজাগ ও সতর্ক করা। নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আরো যত্নশীল করে তোলা। যজ্ঞাগ্নিতে প্রস্তুত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর চরু হল বলবর্দ্ধনকারী ঔষধ। তার ও রাণীদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি এবং প্রজনন শক্তি পুনরুদ্দীপিত করতে এই চরু ছিল অসাধারণ। বলবর্দ্ধক এই ঔষধই প্রকৃতপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গের যাদু। গোটা ব্যাপারটা ছিল চিকিৎসার অঙ্গ। কৌশল্যা কর্তৃক অশ্ববলিদানের ঘটনাও একটা প্রতীকী ব্যাপার। দশরথ যে রাণীদের গর্ভোৎপাদনে সক্ষম এই সত্যটি বোঝাতে অশ্বকে বলি দেওয়া হল। অর্থাৎ তার দেহটা পুত্র সৃষ্টির জন্য উৎসর্গ হতে পারে এই শুভ সংকেত দিল।

হঠাৎ, অন্তঃপুরে মুহূর্ত মুহূর্ত শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। অন্যমনস্কতার ভেতর চমকে উঠল দশরথ। স্বপের ঘোর টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শঙ্খধ্বনি তার সমস্ত অনভূতি ধরে নাড়া দিল। অন্তঃপুরের কোন্ দিক থেকে, কার কক্ষ হতে এই শব্দ ভেসে আসছিল—উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে সে বাইরের দিকে তাকাল।

বৃষ্টি থেমেছে। রোদ উঠেছে। ঝির ঝিরে বাতাসে গাছের শাখা দুলছে, প্রজাপতি ফুলের পাঁপড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। দূরের সরোবর থেকে রাজহংসীর ডাক ভেসে আসছে বাতাসে। পাখীরা আহারের অন্বেষণে আবার ডানা মেলে দিয়েছে শূণ্যে। ঋতুরাজ বসন্ত প্রকৃতির রূপরাজো রূপ রঙের পশরা মেলে দিয়েছে। দশরথের মনেও একটি পরম স্পর্শের স্বাদ এনে দিল যেন ঋতুরাজ বসন্ত।

অন্তঃপুরে কে যেন কাকে ডেকে কী বলছে! নিচু গম্ভীর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা যাচ্ছে। থমথমানো স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা। সময়ের গতি তখন নিরন্তর, অবাধ্য। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা জাগে। তবে কি কোন রাণীর সন্তান হল? নবজাতক;

পুত্র, না কন্যা ? এইসব প্রশ্ন তার কাছে অর্থহীন মনে হল, এভাবে বসে থাকাটা, যেন লুকোচুরি খেলার লুকিয়ে থাকার মত।

পায়ের খস্ খস্ শব্দ হচ্ছিল। ক্রমে শব্দ আরো নিকট এবং স্পষ্ট হল। খোলা দরজার দিকে তাকাল। বুকের ভেতর কেমন যেন দামামা বাজতে লাগল। বুকের দ্রুত স্পন্দন তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। পায়ে পায়ে সে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। দালানের বারান্দায় বশিষ্ঠকে দেখা মাত্র তার চোখের মনি দুটো যেন উদ্দীপ্ত আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে চোখের পাতায় একটা নিবিড়তা নেমে এল। উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল: মন্ত্রীবর এ শঙ্খধ্বনি কিসের ?

বশিষ্ঠের চোখে কৌতুকের ঝিলিক। কণ্ঠস্বরে বিশ্বাসযোগ্য সহৃদয়তা। বলল: মহারাজ, ছোটরাণী কৈকেয়ীর যমজ পুত্র হয়েছে। * মহিষী কৌশল্যারও নবদূর্বাদল শ্যাম বর্ণের এক পুত্র হয়েছে। সময়ের সামান্য হেরফেরে উভয়েই একসাথে সন্তান প্রসব করেছেন। ** মেজরানী সুমিত্রার এখনো কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। প্রসব বেদনায় তিনি কষ্টভোগ করছেন।

* The Marathi poets take Bharat and Satrughna to be the twin-sons of Kaikeyi; because both were hand and glove with each other; both lived together for a long time in Kekaya; and both ruled together in Ayodhya after the departure of Rama to the forest. Indeed, the Ramayana has no incident to report in which Satrughna was ever seen with Lakshmana. The view of the Marathi poets gains further support from the set order in which the four names are pronounced-Rama, Lakshmana, Bharata and Satrughna. P-62.

** Three queens gave birth to four sons in all at short intervals. That Rama and Bharata were all brought to bed on the same day and in the same hour... P. 61

॥ তিন ॥

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে দশরথ কেমন যেন হয়ে যায়। তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কষ্টে ভারাক্রান্ত হয় বুক। শান্ত নীরব রজনীর মত নিজেকে তার ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ এবং অসহায় মনে হয়।

পৃথিবী থেকে আলাদা করে নেয়া মনটা অন্ধকারের মত রহস্যময় হয়ে উঠল। কত দার্শনিক চিন্তা মনে এল। অবাধে ছড়িয়ে পড়ল মস্তিষ্কে।

ঘুম এল না চোখে।

ফুরফুরে হাওয়ায় অবিরাম সরযূর ঢেউ ভাঙার মৃদু মন্দ শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

ঘরে দীপ জ্বলছিল।

থমথমে অন্ধকার নিস্তব্ধতাকে গভীরতর করে তুলল। প্রবল অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল দশরথ।

সারারাত কি ভাবে সে, নিজেই ভাল করে বুঝতে পারে না। অদ্ভুত সব ভাবনা চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু কোন চিন্তাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না মস্তিষ্কে। শরতের যাযাবর মেঘের মত তারা মন জুড়ে বিচরণ করে। কোথাও থামার অবসর নেই। জমিয়ে বসার দায় নেই। আপন খেয়ালে ঘোরে-ফেরে, যায়-আসে। দশরথের ঘুমহীন দুই চোখের পর্দায় তেমনি জীবনের অসংখ্য ছবি ভাসে। অদ্ভুত সব স্মৃতি হানা দিয়ে তার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

সরযূর বুক থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছিল। এলোমেলো হাওয়ায় মাথার চুল ওলোট পালোট হল। তবু মস্তিষ্কের বদ্ধ কুঠুরির মধ্যে যে প্রদাহ ধিক্ ধিক্ করে অঙ্গারের মত জ্বলছিল তার জ্বালা জুড়োল না।

প্রকৃতি শান্ত নির্বিকার। সীমাহীন আকাশ নীরব। চরাচর স্তব্ধ। মাঝে মাঝে নিশাচর প্রাণীর কর্কশ কণ্ঠধ্বনি নিথর নিস্তব্ধ রজনীর বুকে প্রগাঢ় যন্ত্রণার যেন থাবা বসিয়ে দেয়। বিমর্ষ আচ্ছন্নতার মধ্যে চমকে উঠল দশরথ। না কোন ব্যথা বা বেদনা নয়, জ্বালা নয়। বুকের গভীর অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার শরীর আকুল হল। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

আকাশ নির্মেঘ। দেবতাদের চোখ কোটি কোটি নক্ষত্র হয়ে তার দিকে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে। তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে নিজেকে দশরথের অপরাধী মনে হল। পুঞ্জীভূত অপরাধবোধ সুতীব্র আত্মাভিমানের সঙ্গে মিশে সমুদ্রের মত বুকে তোলপাড় করে উঠল।

কষ্টে শক্ত হল শরীর। চোখ জ্বালা করতে লাগল। কান গরম হল। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ করছিল। ভুরু কুঁচকে গেল। বিষাদে মলিন দেখাল মুখ। ঘৃণায় বেদনায় সর্বশরীর রি-রি করে উঠল। মানুষের লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে কোথায় যে তাকে নামিয়ে আনল, সে কথা মনে হলে দশরথের আর কিছু ভাল লাগে না। নিজেকে তখন তার ভীষণ অপরাধী মনে হয়।

কক্ষের আধ আলো অন্ধকারে হঠাৎ একটা ছায়া নড়ে উঠল। অন্যমনস্কতার মধ্যে চমকে উঠল দশরথ। একধরণের নিষ্পলক চোখে ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

অবয়ব এখন স্পষ্ট। ভয় পাওয়ার কিছু নেই দশরথের, তবে আশ্চর্য হয়। ছোট রাণী কৈকেয়ীকে মধ্য রাতে প্রত্যাশা করেনি। তাই যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহলে তার চোখে মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেল। সকৌতুকে চেয়ে রইল তার দিকে।

এই কৈকেয়ী থেকে তার যত দুর্ভাবনার উৎপত্তি? পুত্রদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও পুঞ্জীভুত হতে লাগল মনে। পল, নিমেষ, মুহূর্তের সূক্ষ্ম বিচারে রাম জ্যেষ্ঠ। কিন্তু তাও যে যথার্থ কতখানি তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। তবু এই ব্যাপারে কেকয়াধিপতি অশ্বপতির সঙ্গে তার একটা প্রচ্ছন্ন মন কষাকষি ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে তাকে হৃদয়ঙ্গম করার কোন উপায় ছিল না। রাজনৈতিক কূট খেলায় কে কাকে হারাতে সক্ষম তারই এক নীরব উত্তেজনাহীন গোপন প্রতিযোগিতা দশরথকে ভাবিয়ে তুলল। এ বিরোধ কার সঙ্গে? তারই এক সন্তানের সঙ্গে আর এক সন্তানের। পিতা হয়েও দুই সন্তানকে সে সমান চোখে দেখতে পারল না। ভরতকে কেমন যেন শত্রুর চোখে দেখতে লাগল। মনে হল, সে যেন তার পথের কাঁটা। এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তাকে এড়ানোর জন্যে কত না প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে তাকে। অথচ যাকে নিয়ে এত বিরোধ সংঘর্ষের আয়োজন সে কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গ জানে না। কোন ভ্রূক্ষেপও নেই তার। দশরথের বিরূপ পিতৃহৃদয় এই সন্তানের প্রতি কোন স্নেহপোষণ করে না। ভরতকে তার অবাঞ্ছিত মনে হয়। কৈকেয়ীর এই সন্তানটি পুত্র না হয়ে যদি কন্যা হত তা-হলে কোন ভাবনাই ছিল না। পুত্র হওয়ার জন্যে নিরন্তর একটা উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় তার মন ক্ষত বিক্ষত হয়। ভরতের কথাটা দশরথ কোন সময়ে ভুলে থাকতে পারে না। ভরত তার সুখ শান্তি, সব কিছু আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভরত ও রামকে নিয়ে একটা রজেনৈতিক নাটক অযোধ্যার রঙ্গমঞ্চে জমে উঠল। কিন্তু তার মহড়া দশরথের মনে। নাট্যকার সে নিজে। দৃশ্যপট অযোধ্যার দরবার কক্ষ। কুশীলব সে ও অশ্বপতি। রাজনীতির বিষবৃক্ষটি নিজের হাতে রোপন করেছিল সে। আজ তা শাখায় প্রশাখায় আয়তনে বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র একটি লোভ, অসংযম আর হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ফাঁদে অশ্বপতিকে আটকাতে গিয়ে সে যে নিজে তার সঙ্গে আটক হয়েছিল, জানত না। এখন চারদিকে তার কারাগারের দেয়াল। নিষ্ক্রমণের কোন পথ তার সামনে নেই। বিচিত্র রাজনীতির জটাজালে বন্দী হয়ে সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল।

দশরথ এখন এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি। রাজধানীতে কেকয় রাজ অশ্বপতির আকস্মিক আগমন তার আশংকাকে জটিল করল। নতুন সংকটের শুধু পূর্বাভাস বলে মনে হল।

রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে কেকয় রাজ্যের সঙ্গে দশরথের, অযোধ্যার সঙ্গে অশ্বপতির। দশরথ পুত্র রামকে এবং অশ্বপতি দৌহিত্র ভরতকে সেতু করে অযোধ্যার সিংহাসনের কূলে পৌঁছতে চাইল। অযোধ্যার সিংহাসনের উপর অবিমিশ্র আর্য রক্তধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং রামকে সিংহাসনে বসাতে দশরথ এক গোপন চেষ্টা চালাল।

অপরপক্ষে, অশ্বপতি অযোধ্যার সিংহাসনের উপর নিজ কর্তৃত্ব ও অধিকার চিরস্থায়ী করতে কতকগুলি সর্তে কৈকেয়ীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে, কন্যা কৈকেয়ীকে সামনে রেখেই অনার্যত্বকে আর্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করার এক আকস্মিক সুযোগের নিপুণ সদ্ব্যবহার করলেন অশ্বপতি। কিন্তু তার উদ্দেশ্য আজ আর গোপন নেই। সূর্যালোকের মত পরিষ্কার। ক্ষণিক দুর্বলতার রন্ধ্রপথ ধরে এদেশের মাটিতে থাবা গেড়ে বসার এক ফন্দী করলেন। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত তাঁর লক্ষ্য লাভের উপায়। ' শুধু এই কারণে ভরত সম্পর্কে দশরথ নিস্পৃহ, উদাসীন এবং ভাব নির্বিকার।

আশ্চর্য তার ভাগ্য! কোনদিন সন্তানের জনক হতে পারবেন এই বিশ্বাস তার ছিল না। তাই রূপসী সুন্দরী কৈকেয়ীকে জীবন সঙ্গিনী পাওয়ার জন্য সব সর্তই মেনে নিল। কিন্তু সে যে এরকম অভিশাপ হয়ে ফিরে আসবে তার উপর, কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। অশ্বপতির লোভকে নিছক পরিহাস করতে শর্তগুলো নিয়ে একপ্রকার কৌতুক করতে চেয়েছিল। প্রেম প্রেম খেলায় জেতার মন নিয়েই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল। কখনও ভাবেনি সে জনক হবে একদিন। জনক হওয়ার চিন্তা করে কৈকেয়ীকে বরণ করেনি। কৈকেয়ী পুত্রবতী হবে একথা জানলে মোহের বশেও বিবাহ করত না তাকে। কারণ, অনার্য দেশের মাতৃতান্ত্রিক সমাজবিধি মতে কৈকেয়ীর পুত্রের উপর কেকয় বংশের দাবি দাওয়া প্রতিষ্ঠিত হবে। তার সমস্ত উত্তরাধিকারিত্ব কেকয় রাজ্যের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য বলে গন্য হবে। অযোধ্যার সিংহাসনের উপর কৈকেয়ীর সন্তানের উত্তরাধিকারীত্ব এবং স্বত্ব স্থাপিত হওয়ার অর্থ নিজের হাতে ইক্ষ্বাকু বংশের গৌরবদীপ নিভিয়ে দেয়া। আর অশ্বপতিকে বিনা রক্তপাতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি করে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল কর্তৃত্ব করতে দেয়া। তাই অশ্বপতি কৌশলে দশরথকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিল। নিজের সঙ্গে নিজের কৌতুকের পরিণতি এমন যে বিষময় হবে বা হতে পারে স্বপ্নেও মনে হয়নি। অথচ আজ সবটাই বাস্তব। এই চিন্তা দরশথকে সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক করে রাখে। এক অস্বস্তিকর অবস্থার ভেতর দিবারাত্র সে যন্ত্রণায় ছটফট করে।

কৈকেয়ীর আগমনে তার কোন ভাবান্তর হল না। ভ্রূকুটিবদ্ধ দুই চোখের দৃষ্টি কেমন সুদূর হয়ে উঠল।

অনিদ্রায় চোখের কোল বসে গিয়েছিল। মুখে কালি পড়েছিল। একটা কষ্টের আর্তি সারা মুখাবয়বে প্রকট হল।

কৈকেয়ী এক পা এক পা করে কাছে এল। অন্যদিনের মত দশরথ তাকে দেখে কলকলিয়ে উঠল না। এগিয়ে এসে তার কুশল জিগ্যেস করল না। স্পর্শ করল না তার শরীর। অপলক চোখে নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের ছায়া। ভাগ্যের এক অভূতপূর্ব অসহায়তার মধ্যে নিশ্চল। কৈকেয়ী তার মনের গভীর সংকটের কিছুই জানে না। দশরথের অস্বাভাবিক আচরণ তার মনে এক অজ্ঞাত ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করল। দশরথের মনের তল পেল না কৈকেয়ী। তার সমগ্র চেতনার মধ্যে অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে উপেক্ষার মর্মবেদনা ক্রিয়াশীল হল। নিদারুণ আত্মাভিমানে ও দুঃখে তার চোখে জল এল। কিন্তু দশরথ সম্পর্কে উদ্বেগ কাটল না। নিঃশ্বাস বুকের কাছে আটকে গেল। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল ঃ কী হল তোমার? এত মন-মরা কেন? কার জন্যে এত ভাব? কে সে ভাগ্যবান? বড় রাণী'ত তোমার চোখের মণি রামকে নিয়ে এই প্রাসাদেই বাস করছে। দু'বেলা তাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তবু তুমি অন্যমনস্ক কেন? এখন'ত তোমার আনন্দ করার সময়। তোমার মত ভাগ্যবান কে আছে যে একসঙ্গে এতগুলি পুত্রের চাঁদ মুখ দেখল?

কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল দশরথ। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু অধরে তার কোন আভাস ফুটল না। বরং কণ্ঠস্বর থেকে কেমন একটা নিস্পৃহ গম্ভীর স্বর বেরোল। বলল ঃ ঘুম ভেঙে গেছে, আর ঘুম আসছে না, তাই একটু—মানে, একটু আকাশ, নক্ষত্র, নিঝুম রাত্রি, নিস্তব্ধ চরাচর, মৌন গাছপালা—এইসব দেখছি। দেখতে বেশ লাগে।

কৈকেয়ী হাসি হাসি মুখ করে বলল ঃ তুমি নিজেকে লুকোচ্ছ। অথচ, তোমার কিছুই অজানা নয় আমার। রাত্রিগুলো তোমার জেগে জেগে কাটে। নিশিপাওয়ার মত রাত্রে বারান্দায় পায়চারি কর। নিজের ভাবনার গভীরে ডুবে গিয়ে সর্বক্ষণ বিড় বিড় কর। আজ তার সহ্য করতে না পেরে কাছে এসেছি।

দশরথ অপ্রস্তুত হল। কৈকেয়ীর দিকে অপরাধীর মত আড়চোখে তাকাল। তার সন্ধানী দৃষ্টির উপর সভয়ে চোখ রেখে বিভ্রান্ত স্বরে বলল ঃ সত্যি বলছি, ঘুম প্রতিদিন মাঝরাতে ভেঙে যায়। তারপর আর ঘুম আসে না। বুড়ো হলে সকলের এরকম হয়।

মিছে কথা বলে আমাকে ঠকাতে পারবে না। তুমি অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছ। কৈকেয়ীর কথার মধ্যে উত্তেজনা ছিল না। শান্ত অথচ গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার অপলক চোখের দৃষ্টি দশরথের দিকে। দশরথের দৃষ্টি নিজের অগোচরে তার সঙ্গে মিলল। এবং একটা অনুভূতির মুগ্ধতা নামল চোখের পাতায়। গভীর আচ্ছন্নস্বরে দশরথ বলল ঃ অযোধ্যার রাজগৃহ তোমার পদার্পণে শাপমুক্ত হল। পুত্রহীনতার অপবাদ তোমার কল্যাণে দূর হল। অথচ, একদিন পুরুষত্বহীনতার লজ্জা গ্লানিতে কষ্ট পেয়েছি। পুত্রোৎপাদনের অক্ষমতার দাহে প্রতিমুহূর্ত জ্বলেছি। কি দুঃসহ ছিল

সেই মর্মজ্বালা। রাণীদের দিকে ভাল করে চোখ তুলে তাকাতে পারতাম না। নিদারুণ লজ্জায় মাথা নত হয়ে যেত। প্রতিদিনের সঙ্গম আমার ব্যর্থ হতে লাগল। একটি নারীর স্বামী হওয়ার যোগ্য নই, এই ধারণায় ক্ষতবিক্ষত হত আমার অন্তঃকরণ। নিবীর্য, ব্যর্থ পুরুষ আমি! সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা উজ্জীবিত করতে রাজবৈদ্যের উদ্যম শ্রম সব বিফলে গেল। অবশেষে, তোমার বাক্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিদেশ মন্ত্রকের মন্ত্রী সুমন্ত্রর পরামর্শ চাইলাম। তাঁর ও বশিষ্ঠের নির্দেশে মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গের শরণাপন্ন হলাম। বিশেষ যোগ চিকিৎসায় আমার যৌবন উদ্গাম হল। মনে বল, বুকে সাহস যোগাল। ঋষির পরীক্ষায় জানতে পারলাম, পুরুষত্বহীনতার লক্ষণগুলি আমার গেছে।

কৈকেয়ীর চোখে সলাজ কৌতুক কটাক্ষ। মুখে কিছুই বলল না। কৈকেয়ীর বুকে চিকুর হানার মত ঝলকিয়ে উঠল বিগতকালের স্মৃতি। আকস্মিক বিস্ময়কর চমকের এবং সেই সঙ্গে চমকের উৎসগুলি মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল। কিন্তু দশরথের নিস্পৃহ নির্বিকার মনোভাবের জন্য সেই সব ছবি স্থায়ী হল না। মস্তিষ্কেও বদ্ধ থাকল না, বরং দশরথের কথাগুলো কেমন যেন রহস্যজনক চুম্বক আকর্ষণের মত অনুভূত হল।

দশরথের চোখ ছিল না কৈকেয়ীর উপর। গল্পের প্রতি তার আকর্ষণকে সুতীব্র করার জন্যে ধীরে সুস্থে বলল: তরুণ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের অসাধ্য সাধনে আমি অভিভূত। এই সাধনালব্ধ চিকিৎসার গুণ আমার কাছে অব্যাখ্যাত। অলৌকিকতায় আমি বিশ্বাসী নই। তবু ঋষির আশ্চর্য ক্ষমতার অলৌকিকতা বলে মনে হল। মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তোমার মতই কৌশল্যা সুমিত্রারও জননীত্বের সব লক্ষণ যখন দেখা দিল তখন পৃথিবী বিজয়ের মতই এক বিশাল আনন্দ আমাকে রোমাঞ্চিত করল। পিতা হওয়ার এক দুর্লভ সুখ আনন্দের অনুভূতিতে আমার মন প্লাবিত হল। সাফল্যের পরিতৃপ্তি, সার্থকতার গর্ব, পুরুষত্বের শক্তি, সৃষ্টি সুখের উল্লাস মন ভরে পেলাম। শান্তিতে আনন্দে নিজেকে একজন সার্থক বীর্যবান পুরুষ বলে মনে করতে শিখলাম। বহুকাল পর নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা জাগল। বাৎসল্যভাবে আমার হৃদয় পরিপূরিত হল। তবু একটা সন্দেহে মন আমার উদ্বিগ্ন হল।

কথার মধ্যে কৈকেয়ী আচ্ছন্ন স্বরে প্রশ্ন করল: এ সব কথা'ত আগে বলনি কোনদিন।

অনুভূতির কথা এত বেশি ব্যক্তিগত এবং নিজের যে তা নিয়ে গল্প হয় না। বিশেষ অবস্থা ছাড়া তার উপলব্ধি জাগে না। ইদানীং সর্বক্ষণ এই সব কথা নিয়ে আমি চিন্তা করি! মনের মধ্যে তার নিত্য যাওয়া আসা। অতীত আমাকে সুখে থাকতে দেবে না।

কৈকেয়ী শান্ত গলায় বলল: তোমার দুঃখের কথা বল।

দশরথ এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবল। তারপর বলল: যে কথা বলছিলাম, অযোধ্যায় জনগণ এবং রাজকর্মচারীরা সকলেই জানে অজ পুত্র নেমির কোন সন্তান

নেই, অদূর ভবিষ্যতে হবেও না। তার অবর্তমানে এই সিংহাসন কার হবে? তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না। স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী রাজকর্মচারীদের অনেকে যে যার অনুকূলে এই সব গল্পের ইন্ধন যোগাল। এ রকম একটা ঘটনা প্রবাহের ভেতর তোমাদের হঠাৎ সন্তানবতী হওয়ার সংবাদে চক্রান্তকারীরা থমকাল। তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এত সহজে থামবে মনে হল না। আশংকা, বাড়তে লাগল। এবার তারা আমার পুরুষত্ব অর্জনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প তৈরী করবে। তাদের হীন সন্দেহে এবং কুৎসিত ইংগিতে রাণীদের সম্ভ্রম এবং রাজবাড়ীর অতীত মর্যাদা ও গৌরব হানি করবে, এরকম একটা দুর্ভাবনায় ভুগেছি অনেককাল। ভবিষ্যতে এই মিথ্যা রটনা আমার সন্তানদের মনকে হীনমন্যতার বিষিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। নিজেদের জন্ম সম্পর্কে সংশয়ের ক্লেশ আত্মদহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ করবে তাদের ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ দৃপ্ত আত্মবল। আমার স্বপ্নভঙ্গ হবে।

দশরথকে থামানোর জন্যে কৈকেয়ী ভর্ৎসনা করল। বলল ঃ এ সব কল্পনা বিলাসিতা তোমাকে মানায় না স্বামী।

দশরথের কণ্ঠস্বরে আকুল উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। না, ছোট রাণী তা নয়— তুমি সব জান না। ইক্ষ্বাকুবংশের এই সিংহাসনটির উপর এখন অনেকের লোভ। এই সিংহাসনটি বৃহৎ ভারসাম্যর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। তাই এর উত্তরাধিকারী নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই।

কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করল ঃ কাদের সন্দেহ কর তুমি? তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা করেছ?

অদ্ভুত হাসি খেলে গেল দশরথের অধরে। বুকের ভেতর থেকে উঠে এল একটা লম্বা শ্বাস। মৃদুস্বরে বলল ঃ সব আমার অদৃষ্ট। ভাগ্যের সঙ্গে কি যুদ্ধ করা যায়?

চিরদিন তুমি হেঁয়ালি করে কথা বল।

সহজ করে কথা বলা দারুণ কঠিন।

মোটেও না। সহজ কথাটা স্পষ্ট করে বললে পাছে সত্যি কথাটা বেরিয়ে পড়ে তাই মনকে আগলে আগলে বেড়াও। কোন ফাঁক-ফুকুর দিয়ে সত্যি কথাটা হঠাৎ যদি বেরিয়ে পড়ে সেজন্য সতর্ক থাক। আর সেজন্যেই মনে হয় কথাগুলো যেন নিংড়ে নিংড়ে বার করছ। কিন্তু এতে যে মনের কূট অভিপ্রায় আর চাতুরী স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্যের কাছে তার কথা ভাব না।

কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথের মুখে হাসি হাসি ভাব প্রকাশ পেল। কৈকেয়ীকে ভোলানোর জন্যে বলল ঃ ঠিক বলেছ। তা হলে সত্যি কথাটা শোন। রাজপুত্রদের চিন্তায় আমি বিচলিত। তাদের মঙ্গলের কথা ভাবতে ভাবতে ঋষিদের তপোবনের আশ্চর্য আশ্চয শক্তি এবং মাহাত্মোর অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক গল্পে আমার মন ডুবে রইল। মুনি ঋষির নামের ভেতর একটা চুম্বক আছে। এই আকর্ষণ সাধারণের মনে দুর্বার। ঋষিদের সমস্ত কথা ও কাজের প্রতি সব মানুষ শ্রদ্ধাশীল। তাদের কোন কাজই যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝার কেউ চেষ্টা করে না। ঋষির বাক্য অপার্থিব, দেব

এবং অলৌকিক। মানুষের এই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে আমি শত্রুর মুখে ছাই দিলাম। সকলে জানল মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের চরু ভক্ষণ করে রাণীরা গর্ভবতী হয়েছেন।

কথার মধ্যে কৈকেয়ী হেসে ওঠার একটা শব্দ করল। দশরথের কাঁধে হাত রেখে বলল ঃ সত্যি, তুমি কি সুন্দর গল্প বানাতে পার। মানুষকে বোকা বানানোর যাদু আছে তোমার গল্পে। যা হোক একটা কিছু করে বুঝিয়ে দিতে চাইছ।

কৈকেয়ীর স্বরে তারল্য, ভঙ্গিতে কপট ধমক। দশরথ মুখে যাই বলুক অবচেতন মন কৈকেয়ীর প্রশ্নে সভয়ে চমকে উঠেছিল। দশরথ যেন অবাক মুগ্ধ চোখে মুখ তুলে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। কৈকেয়ীর উদ্দীপ্ত উন্মুক্ত দুটি চোখের তারা নির্নিমেষে লক্ষ্য করে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল ঃ ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ তোমায় কি বলেছিল মনে আছে? হাতে চরু দিয়ে বলেছিল, এই চরু ভক্ষণে তোমরা জননী হবে। মহারাজের বংশ রক্ষা পাবে, শঙ্কা-দুর্ভাবনার অবসান হবে। আর ইক্ষ্বাকু বংশের সার্থক উত্তরাধিকার জন্মদাত্রী হয়ে তোমরা চিরস্মরণীয় হবে।

পুরোন কথা উঠছে কেন? কি হয়েছে তোমার? কথা বলার সময় কৈকেয়ীর ঠোঁট ধনুকের মত বাঁকল। বিমর্ষ স্বরে উৎকণ্ঠা ধ্বনিত হল।

কৈকেয়ীর কথায় দশরথ বিব্রতবোধ করল। অসহায় চোখে তার দিকে তাকাল। ঠোঁটের দুটি কোণ শক্ত দেখাল, দৃষ্টি কঠিন হল। কিছুটা বিব্রত আর অপ্রস্তুত হল। কিন্তু তার কথা ভ্রুক্ষেপ করল না। নিজের কথায় তন্ময় হয়ে গিয়ে সে বলল ঃ আমার ঔরসে রাণীরা গর্ভবতী হল। কিন্তু লোকে জানল অলৌকিক চরু ভক্ষণ করে তোমরা গর্ভবতী হয়েছ। তোমাদের পুত্রেরা ঈশ্বরের সন্তান। তারা নাকি সবাই অবতার হয়ে জন্মেছে। তাদের সম্বন্ধে সাধারণের মনের এই বিশ্বাস সংগঠিত করছে বশিষ্ঠ, নারদ, জাবালি প্রমুখ মুনিঋষিরা। কিন্তু শান্তি পেলাম কী? একটা গোপন শঙ্কা বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি। পুত্রেরা যত বড় হচ্ছে আমার বুক তত দুরু দুরু করছে। আমার সমস্ত চেতনা অনুভূতির মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে এক ঋষির অভিশাপ।

অভিশাপ! বিস্ময়ে চমকে উঠল কৈকেয়ী। কার অভিশাপ? কৈ, এতকাল তো শুনিনি।

কৈকেয়ী জানল না, দশরথই তার জিজ্ঞাসার স্রষ্টা। দশরথের ছলনা অসাধারণ কিছু ছিল না; কেন না, তা একান্ত অসহায় মানুষের ছলনা। কিন্তু কৈকেয়ীর জিজ্ঞাসানিবিড় দৃষ্টি এমনই বিষাদে মলিন, উৎকণ্ঠায় চকিত হয়ে দশরথের অবস্থা ফাঁদে পড়া পাখীর মত। ধরা পড়ার ভয়ে ভীত তস্করের মত উৎকণ্ঠায় ত্রস্ত হয়ে উঠল। মনের সত্যকার, উৎকণ্ঠাকে আড়াল করে সে কৈকেয়ীর ব্যাকুল জিজ্ঞাসার মুখোমুখি উত্তর দিতে গিয়ে নিজের অজান্তে নিজেকে নিয়ে এক গল্প তৈরী করল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল ঃ

অনেককাল আগের কথা। ফাগুণের পূর্ণিমা তিথি। সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে

বসন্তকালীন মৃগয়া উৎসবে যাত্রা করলাম। সূর্যোদয়ের সোনার আলোয় ঝলমল চতুর্দিক। আকাশে নীলের বন্যা। নিস্পত্র গাছে শ্যাম-কচি চিকণ চিক্ চিক্ করছে। ঝির্ ঝিরে হাওয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল দশদিক। ডালে ডালে পাতায় প্রলাপ। ফুলের উচ্ছ্বাস। বিরহী পাখীর আকুল আহ্বান। কোকিলের উদাস ডাক। ছোট ছোট পাখীর জটলা। দু'পাশে ঘন বনসীমানার সঙ্গে আঁকা বাঁকা সংকীর্ণ পথ ক্ষুদ্রতর একটা বিন্দুতে পরিণত হয়ে হারিয়ে গেছে অরন্যের গহণে। কোথাও বনভূমি ক্রমশ উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে—আকাশের পানে। এই অরন্য ভেঙে শিকারের সন্ধানে গহণ বনরাজ্যে প্রবেশ করা আদৌ নিরাপদ নয়। নধর ডোরাকাটা বাঘের রাজ্য সে। চক্র আঁকা চিতাও দেখা যায়। বন্য বরাহ, অজগর সাপ এ সব'ত আছেই। তথাপি, এ বনপথে চলার মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনা আছে। শ্বাসরুদ্ধ উৎকণ্ঠা আর উৎকর্ণতা নিয়ে চলতে হয়। সতর্ক চক্ষুজোড়া অস্ত্র প্রহরীর মত সব দিকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রেখে আগুনের গোলার মত ধক্ ধক্ করে জ্বলে। গাছ-গাছালির ভিড়ের মাঝ দিয়ে ঠেলে এগিয়ে চলেছে আমার অশ্ব। কেমন উদ্দাম বন্য একটা ভাব ফুটে উঠল আমার শরীরের মধ্যে।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। তবু কোন শিকারের দেখা নেই। চমক লাগানোর মত কোন শিকার তখনও হয়নি। অপরাহ্নের ছায়া নামল বনে। নির্জন বনের দিকে তাকিয়ে ভাবছি আর অগ্রসর হওয়া উচিত কিনা? নীরব, নিস্তব্ধ বনরাজ্যে হঠাৎ একটা গম্ভীর শব্দ ভেসে এল। উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দের আওয়াজ অনুধাবন করতে চেষ্টা করলাম। কোন বন্যপ্রাণীর জলপানের শব্দ। অনেক বন্যপ্রাণীই জল খেতে আসে পড়ন্ত সন্ধ্যায়। সাধারণতঃ হস্তির জলপানের সময় অনুরূপ শব্দ হয়। শব্দ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ধনুতে শব্দভেদী বাণ যোজনা করলাম। এ এক অদ্ভুত অস্ত্র আমার। শব্দকে ধাওয়া করে এ বাণ তার লক্ষ্যকে সুনিশ্চিৎ আঘাত হানবে। হোল'ও তাই। কয়েকমুহূর্ত পরে, হঠাৎ মনুষ্যস্বরে এক আর্ত্ত চিৎকার জনমানবহীন জঙ্গলে আকাশ বাতাস পাহাড়সীমা থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল। আমার বুকের ভেতর উৎকণ্ঠার ঝড়। আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। শব্দভেদী বাণ করি কণ্ঠস্বর ভেবে কাকে আঘাত করল? এ যে বালকের কণ্ঠস্বর! নির্জন অরণ্যে বালক এল কোথা হতে? একি কোন মায়া? না মতিভ্রম? জোর কদমে অশ্ব ছুটিয়ে চললাম পাহাড়ের ঢালু পথে। আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে বালকের কান্না করুণ সুরে বাজতে লাগল। আমার চোখের কোণ থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল। ঘটনাস্থলে পেঁছে দেখলাম রক্তাপ্লুত শরীরে এক বালক মাটিতে যন্ত্রণায় হাত-পা ছুঁড়ছে। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে নামলাম। বালকের বুক থেকে বাণটি সরিয়ে নিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। আমার কলেবর শোণিত সিক্ত হল। বালকের চোখে তখন নেমেছে মৃত্যুর ছায়া। তবু কষ্ট করে বালক বলল: সে কার পুত্র, কোথায় থাকে, এই বিজন নদীতে কেন এসেছিল? হত্যাকারীকে সে তার পিতার কাছে নিয়ে যেতে বলল। অন্ধ পিতা-মাতার শেষ আশ্রয় কি, কে তাদের দেখবে, এসব জিগ্যেস করল আমায়।

বালকের কথা শুনে আমার বুক ভেঙে গেল। অনুতাপ হৃদয় দগ্ধ হল। শব্দভেদী বাণের নিপুণ প্রয়োজন না জেনে আমি যে পাপ করলাম তা আমাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। বালককে বুকে নিয়ে তার পিতার কুটীরে পৌঁছলাম, সব শেষ তখন।

দশরথের বর্ণনা এমনই প্রাণ ও বর্ণনাময় যে শুনতে কৈকেয়ীর চোখ ঝাপসা হল। একটা কষ্ট তার দুইচোখে নিবিড় হয়ে উঠল। দশরথের দুর্ভাগ্যের জন্য তার দুঃখ হল। দশরথের নীরব মুখে ফুটে ওঠে থমথমে ভাব।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর শ্বাস উঠে এল কৈকেয়ীর। শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল ঃ তারপর, অন্ধকমুণি আর তার স্ত্রীর কি হল ?

যন্ত্রচালিতের মত দশরথ উত্তর করল ঃ পদশব্দে ঋষিবরের কণ্ঠস্বর স্নেহে কলকলিয়ে উঠল। ভাবলেন পুত্র তাঁর ফিরে এসেছে। জিজ্ঞেস করল ঃ পুত্র যজ্ঞদত্ত জল সংগ্রহ করতে তোমার এত দেরী হল কেন ? অভিমান হয়েছে ? বোকা ছেলে। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে ঋষি বালককে শুইয়ে দিলাম অন্ধকের পদতলে। নিষ্প্রাণ দেহ স্পর্শ করে ঋষি চমকে উঠল। সবিনয়ে সব কথা নিবেদন করে ঋষির করুণা প্রার্থনা করলাম। ঋষির সহানুভূতি অপরিসীম। আমি নিরপরাধী হলেও আমার ক্ষাত্রধর্মকে তিনি ক্ষমা করলেন না। তাপিত অন্তরে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল ঃ রাজা, তুমি অপুত্রক। পুত্র বিয়োগের জ্বালা কি মর্মান্তিক জান না! আমার এই বুকটা খাঁ খাঁ করছে। এখানে এখন ভীষণ শূন্যতা। একটা দাবানল। একটা ভীষণ কষ্ট। তুমি না জেনে পুত্র হত্যা করেছ ঠিক। কিন্তু পিতার মর্মবিদ্ধ তীব্র বিষজ্বালার যন্ত্রণা থেকে তুমিও মুক্ত থাকবে না। আমার এই অসহায় কষ্ট যন্ত্রণায় তোমারও বুকের ছাতি ফেটে চৌচির হবে। পুত্রের দুঃসহ শূন্যতা একদিন তোমারও মৃত্যুর কারণ হবে। আর সেইদিন তুমি আমার কথা মনে করবে। আমার অনুভূতি তুমি পাবে। এ ঋষির অভিশাপ নয়, পিতার নিদারুণ বক্ষজ্বালা। তারপর থেকে শয়নে স্বপনে জাগরণে ঋষির কথাগুলো কিছুতে ভুলতে পারি না। কিন্তু প্রথম প্রথম অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। এখন মনে হয় তাঁর শাপেই বোধ হয় আমার পুত্র লাভ হয়েছে। অবিশ্বাস করে ঋষির কথা তাচ্ছিল্য করার মত জোর পাই না আর। ঋষির অভিশাপ বর্ণে বর্ণে সত্য করার জন্যে হয়ত ভাগ্যদেবতা আমার সঙ্গে এক নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতেছেন। একটা চরম দুঃখের জন্য প্রস্তুত হও রানী।

শান্ত নিথর আঁধারও কেঁপে উঠল দশরথের গলার স্বরে। কৈকেয়ীর দু'চোখে কেমন একটা নিবিড় সমবেদনা আর প্রীতির উষ্ণতার স্পর্শ লাগল।

বাইরে থেকে হঠাৎ একটা এলোমেলো ঝড় এসে ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে দিল। মেঘ ঢাকা আকাশের ফাঁকে ফুটে ওঠা তারার ম্লান দীপ্তির মত মনের মাঝে দশরথের রামের মুখখানা জেগে উঠল।

তিন রাণীর সন্তানদের মধ্যে কৌশল্যার পুত্র রাম অগ্রজ। কৈকেয়ীর যমজ পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং রাম একদিনে এক প্রহরে জন্মগ্রহণ করল। তবু দণ্ড, পল মুহূর্তের সূক্ষ্ম বিতর্কিত বিচারে রাম জ্যেষ্ঠ। কেকয়রাজ অশ্বপতি কিন্তু এই বিচারে সন্তুষ্ট হলেন না। একটা জটিল সন্দেহ তাঁর মনে পাক খেতে লাগল। আর্য অনার্যর সনাতন বিরোধ এবং সংস্কার রাম ও ভরতের জন্মের মধ্যবর্তী হয়ে সুদূর ভবিষ্যতকে যেন ইংগিত করছে। দশরথ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কতখানি যত্নবান হবে তা নিয়ে অশ্বপতির দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। রাজপুত্রদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংকট ও সমস্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। বিশাল অযোধ্যা সাম্রাজ্য কি উপায়ে তাঁর কব্জায় রাখা যায় তার বিভিন্ন মতলব এবং পরিকল্পনা তিনি রোজই করেন। কোনটাই মনঃপুত হয় না বলে বারবার বদলান, আবার নতুন করে করেন।

কূটকৌশলে অযোধ্যা সাম্রাজ্য কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা তাঁর আকস্মিক। কৈকেয়ী ছিল তাঁর তুরুপের তাস। নিজের অনিচ্ছাকে জোর দিতেই তুরুপের তাসের মত তাকে ব্যবহার করলেন। কিন্তু সে যে অকস্মাৎ তাঁর জয়কে অনিবার্য করে তুলবে তা স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। কৈকেয়ীর সঙ্গে দশরথের বিবাহে তাঁর মত, ইচ্ছে কোনটাই ছিল না। অদৃষ্ট নিজের খেয়ালে তাকে ইচ্ছে মত সৃষ্টি করেছিল। এ এক অদ্ভুত ভাগ্যফল। নইলে, এমন ঘটনা হয় কি করে ? তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় কৈকেয়ী আর এক পাল্লায় দশরথের বিশাল সাম্রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য, মর্যাদা, গৌরব। তবু দশরথের সব হিসাব ভুল করে দিল। জীবনের দাবি যে দশরথের কাছে এত বড়, অশ্বপতির চিন্তাতেও আসেনি।

সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙবে না নীতি নিয়ে যে জয় চিন্তা অশ্বপতির ছিল, তা দশরথ উল্টেপাল্টে দিল। সেই অভাবিত প্রাপ্তির আনন্দে কিন্তু অশ্বপতি বিহ্বল হয় নি। নেপথ্য দরকষাকষিতে তাঁর বুদ্ধি বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করত। দশরথের মনোভাবকে বুঝে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি নিজের কর্মপন্থাকে দ্রুত ঠিক করে নিলেন। আসলে কৈকেয়ীর এই বিবাহতে তাঁর আনন্দের চেয়ে যন্ত্রণা দিল। পিতা অশ্বপতি তাই কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির পথ প্রশস্ত করার জন্যে যত প্রকার শর্ত হয় সবই দশরথকে দিয়ে অঙ্গীকার করাল। দশরথের রাজি হওয়াটা তার নিছক একটা খেলা, না খেয়াল, না উন্মত্ত লালসা তা বুঝে নেবার জন্যে এক সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষুরধার পথে তাঁকে টেনে আনলেন। এবারেও অশ্বপতির অবাক হওয়ার পালা। দশরথ অম্লান বদনে স্বীকার করল কৈকেয়ীর দেখাশোনার জন্য কেকয়রাজ তাঁর মনোমত লোককে অযোধ্যায় নিযুক্ত করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, কৈকেয়ীর পুত্র সন্তানই হবে অযোধ্যার রাজা। তৎ-সত্ত্বেও অশ্বপতি কোন ব্যক্তিকে অযোধ্যায় নিযুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। অকারণ অবিশ্বাসে মধুর আত্মীয় সম্পর্ক শুধু তিক্ত হয়। তা-ছাড়া অযোধ্যার উপর কর্তৃত্ব করার সময় তখনও হয়নি।

কৈকেয়ীর পুত্র জন্মের সংবাদে অশ্বপতির কল্পনা প্রবণতা দেখা দিল। স্বপ্ন-সফলের আবেগে থর থর করছিল তাঁর বুক। কৈকেয়ীর পুত্র তাঁর লক্ষ্য জয়ের ধনুঃশ্বর। বিধাতারও ইচ্ছা, অযোধ্যার বিশাল সাম্রাজ্যের উপর তাঁর কর্তৃত্বকে অক্ষুন্ন করা। নইলে, এমন করে তাঁর আশাগুলি পূরণ হল কেন? যমজ সন্তানের জননী হয়ে কৈকেয়ী তাঁর আধিপত্যের দাবিকে অযোধ্যায় জোরাল করল। তবু অশ্বপতির মনে হল, অদৃষ্ট যেন কোথায় তাঁর সঙ্গে একটু শত্রুতা করে রেখেছে। তিন রানী এক দিনে সন্তান প্রসব করল কেন? এটাই কি জট পাকানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়? কৈকেয়ীর যমজ সন্তানও আর এক সংকটের কারণ হতে পাবে? সিংহাসনের উপর দু'জনের সমান দাবি কি করে স্বীকার করা যায়? এমন অনেক প্রশ্ন তাঁর মন ছুঁয়ে রইল। ভবিষ্যত এখনও অন্ধকারে ঢাকা। সেই গভীর গহন অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চলে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্ধ যেমন আঁধারকে অনুভব করে লাঠির সাহায্যে একটু একটু করে এগিয়ে চলে তাঁকেও তেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। এ-ছাড়া আর কি-বা করার আছে?

অযোধ্যার সিংহাসনের উপর তাঁব স্বার্থকে চিরস্থায়ী করার একটা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা অবশ্য তাঁর আছে। অযোধ্যার রাজমুকুট কেকয়ের দিকে সরিয়ে নেবার জন্য এখন ব্যাকুল তিনি। যে মুকুটের জন্যে তাঁর লোভ অসীম, তাতে তাঁর নিস্পৃহতা দেখানোর কোন হেতু নেই। এখন ক্ষমতার লড়াইয়ে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে গেছেন আযোধ্যার সঙ্গে। জয় সম্পূর্ণ করার জন্যে যে অনেক কৌশল, শঠতা, ছল, চাতুরি, কুটনীতির আশ্রয় তাঁকে নিতে হবে, এ তিনি ভালভাবেই বুঝতে পারছেন। দশরথের পুত্রেরা যত বড় হবে তা'দর অন্তরে ঘুমন্ত আকাঙ্খাগুলো সব জেগে উঠবে, আর তখনই শাসন কার্য এবং সিংহাসন নিয়ে এক জটিল রাজনীতির সূচনা হবে। কিন্তু সে রাজনীতি আর্য-অনার্য রক্ত সম্পর্ক নিয়েই দানা বাঁধবে। সুতরাং অশ্বপতি ভাঁর উত্তরাধিকারী বইতে পারার মত মানুষ তৈরী করার জন্য দৌহিত্রদ্বয়কে নিজের কাছে রাখলেন। স্বজাতি প্রেমেই তাঁর রাজনীতি হয়ে উঠল।

ভরত শত্রুঘ্ন যমজ দৌহিত্র শিশুকাল থেকে মাতুলালয়ে মানুষ হল। ছোট থেকেই তারা যাতে কেকয়ের মানুষ লোকাচার, প্রথা, ধর্ম, সংস্কার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যায়, অনার্যকৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তাঁর জন্যেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

কিন্তু দশরথ ধূর্ত। অশ্বপতির অভিপ্রায় ও মতলব বুঝতে তারও বাকী ছিল না। অশ্বপতিকে নিরাশ ও হতাশ করা এক অদ্ভুত কূটকৌশল করল দশরথ। কেকেয়ীর অন্তরে শূন্যতা ঘটানোর জন্যে এবং তার অপত্যস্নেহের বাধা দূর করতে এবং তার বাৎসল্য গভীর করতে রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে এলেন অযোধ্যার প্রাসাদে। সঙ্গে তাদের জননী কৌশল্যা সুমিত্রাও এল। রামের সঙ্গে কৈকেয়ীর গভীর মাখামাখি কৈকেয়ীর স্নেহবুভুক্ষু মাতৃহৃদয়কে এক অপার আনন্দ সঞ্চার করল। ভরত শত্রুঘ্নের শূন্যস্থান দখল করল রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই। ভরত শত্রুঘ্ন তার হৃৎপিণ্ড। কিন্তু

রাম লক্ষ্মণ চোখের মণি। তাদের একদণ্ড দেখতে না পেলে মন চঞ্চল হয়। কৈকেয়ীর হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দশরথ তার প্রতিশ্রুতি এবং শপথ লংঘনের এক সুন্দর কৌশল করল। কৈকেয়ীর মুখ থেকেই রামের অভিষেক সম্বন্ধে কোন বাধা ভবিষ্যতে যাতে না হয় সে জন্যেই দশরথের এই ফন্দী। দশরথের উদ্দেশ্য কি করলে ব্যর্থ হয়, তার কথা চিন্তা করতে গিয়ে অশ্বপতির মন্থরার মুখখানা মনে পড়ল।

মন্থরার দেহসৌষ্ঠব অপূর্ব! ফরসা শরীরে তার দুর্নিবার যৌবন। গানের সুরের মত দীর্ঘতন্বী চেহারা। গম্বুজের মত বিশাল খোঁপার ভারে পিঠটা একটু নুয়ে পড়ে। ঘাড়ের কাছে দিগন্তরেখার মত বঙ্কিমভাবটুকু তাকে আরও সুন্দর করেছে। দীর্ঘ চেহারায় লালিত্য এনেছে। এটুকু বঙ্কিমভাব না থাকলে তাকে ভাল লাগত না। তনুসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেত না। মন্থরার আলগা শ্রীর মধ্যে এমন একটা অসাধারণত্ব আছে যা সব নারীকেই ঈর্ষান্বিত করবে। এ জন্য অনেকে ঈর্ষাকাতর হয়ে তাকে ব্যঙ্গ করার জন্যে কুব্জা বলে ডাকে। তাতে সে রাগ করে না। বরং খুশী হয়। এমনিতে মন্থরা মিষ্টি স্বভাবের। প্রকৃতিতে সে খল হলেও তার আচরণ ও ব্যক্তিত্ব ছিল আকর্ষণীয়। রঙ্গালাপ করতে তার জুরি ছিল না। মুহূর্তে যে কোন ব্যক্তিকে সে আপন করে নিতে পারত। কাউকে কটু কথা বলা কিংবা প্রত্যাঘাত করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সহজে ক্রুদ্ধ কিংবা উত্তেজিত হয় না। সে খুব ধীর, স্থির এবং শান্ত স্বভাবের রমণী। বুদ্ধিতে কূট রাজনীতিকের চেয়ে কম কিছুতে নয়। সব অবস্থাতে নিজেকে অবিচল রাখার এক আশ্চর্য সংযম শক্তি আছে তার ব্যক্তিত্বে। এসব কারণে মন্থরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং আস্থাভাজন। তার সঙ্গে একটা গোপন হৃদয় দেয়া-নেয়ার সম্পর্কও আছে তাঁর। তাই কেকয় রাজপ্রাসাদে মন্থরা শুধু দাসী নয়, আরো কিছু। রাজার প্রণয়িনী। সুতরাং স্বার্থ সাধনে অশ্বপতি তাকেই নিযুক্ত করবে ভাবল। একমাত্র মন্থরাই প্রেমের জন্য অযোধ্যার রাজ অন্তঃপুরে গভীর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলতে সক্ষম। সে সাহসী, বুদ্ধিমতী, বাকপটু, রঙ্গপ্রিয়, চতুরা, সর্বোপরি দর্শনীয়া। তার রূপ ও সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে! এছাড়া গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্যে যে সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দরকার হয়, তার সব গুণ মন্থরার আছে। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে সে কৈকেয়ীর অভিভাবিকা, ভরত শত্রুঘ্নের ধাত্রী। অন্তঃপুরে তার প্রচ্ছন্ন রহস্যময় অবস্থান কারো মনে কোন সন্দেহ উদ্রেক করবে না। এই প্রত্যয় দৃঢ় হল অশ্বপতির মনে।

ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করে মাতুল যুধাজিৎ এবং মন্থরা আযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করল। অকস্মাৎ তাদের আগমনে দশরথের নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তির ব্যাঘাত ঘটল। পুত্রদ্বয় একটি গোপন জ্বালার মত নিভৃত অবসরে তার মনকে দগ্ধ করে। এই দুই সন্তান সব সময় দূরে দূরে চোখের আড়ালে থাকলেই সে বেশী নিশ্চিন্ত বোধ করে। তাই, বহুকাল পর ফিরে এসে তারা যখন সামনে এসে দাঁড়াল, বাবা বাবা বলে ডাকল তখন দশরথের বুকের ভেতর আনন্দের বাণ ডাকল না। পুলকে বুক কেঁপে উঠল না। তাদের কোলে করে আদর করতে ছুটে এল না। ভাল করে মুখের দিকে

তাকিয়েও দেখল না। প্রৌঢ় দশরথের দুই চোখে কেমন একটা বিব্রত বিহ্বলতা। গভীর দীর্ঘশ্বাসে উদ্বেলিত হল বুক। দুরন্ত আক্ষেপে সমস্ত শরীরটা তার পাক দিয়ে মুচড়ে উঠল। অসহায় স্বরে বলল: খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে এলে কেন? বুকের ভেতর শব্দ করে নিঃশ্বাস পড়ল দশরথের।

সমস্ত ঘটনাটা বিদ্যুচ্চমকের মত মস্তিষ্কে ঝিলিক দিল মন্থরার। দশরথের সুরহীন স্বর, তার ভাবান্তর ও প্রতিক্রিয়া মন্থরার শূন্য মনে জোনাকির মত টিপ টিপ করে জ্বলে। সেই চকিত আলোর বিন্দুতে তার অনুভূতি নিজের কাছে সারা দিল। দশরথের মুখে ও কিসের দুর্ভাবনা? ভরত শত্রুঘ্ন তার ঔরসজাত পুত্র। তবু তাদের সঙ্গে তাঁর এ ধরনের আচরণের অর্থ কি? ভরত শত্রুঘ্নের দিকে না তাকিয়ে রামের তৈলচিত্রের উপর তার দৃষ্টি সর্বক্ষণ স্থির ছিল কেন? অপলক চোখে প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শব্দ করে যে নিঃশ্বাসটি ফেলল তা যেন 'হা রাম' ধ্বনি হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত হল বাতাসের স্বরে। এর অর্থ কি?

কৈকেয়ীর পুত্রদের দেখেই দশরথের মেজাজ কেন তিক্ত এবং কণ্ঠস্বর রুক্ষ হল? এই কেন'র প্রশ্নগুলো তীক্ষ্ন-তীরের মত তার বুকে বিঁধে রইল।

মন্থরার বুক জোরে উঠানামা করতে লাগল। একসঙ্গে অনেক কথা তাঁর মনে এল। কিন্তু সে সব জিজ্ঞাসা নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করার নয়। কেবল নিজের মনে পর্যালোচনা করে তাকে সত্যে পেঁছিতে হবে। সেজন্যে খোলা চোখ আর খোলা মনের প্রয়োজন। পূর্বধারণা সত্য অন্বেষণে ব্যাঘাত ঘটায়। অশ্বপতি তাই কোন পূর্বধারণা দিয়ে তাকে অযোধ্যায় পাঠালেন না। ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে বিরোধ ও বিরোধিতার পাঠ গ্রহণ করতে বললেন। আর প্রথম দিনেই অনুদ্ঘাটিত গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের আকস্মিক পাঠ নিল সে। এর পাতায় পাতায় বিস্ময় এবং কৌতূহল। রাজপুরীর অভ্যন্তরে গোপন রাজনীতির রূপ একটু একটু করে তার কাছে ক্রমেই উদ্ঘাটিত হতে লাগল। আর এক আশ্চর্য আনন্দে সে গুপ্তচরবৃত্তির কার্যে আরো বেশী মনোযোগী ও নিষ্ঠাবান হল।

রাজঅন্তঃপুরে ভরত-শত্রুঘ্নকে নিয়ে যে এক ধরণের গোপন রাজনীতি চলছিল মন্থরা তার সহজাত কুটবুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করল।

নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সবার অলক্ষ্যে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এবং বাইরে এক গোপন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। কিন্তু লোকে জানল সে কৈকেয়ীর অন্যতম বিশ্বস্ত পরিচারিকা। তাই, সমাদরের কোন অভাব ছিল না তার। সকলে তাকে খাতির করল। তার সরস কৌতুক প্রিয়তা, মিষ্টি আলাপ এবং শিষ্ট আচরণের জন্য এমনিতেই সে সকলের প্রিয় ছিল। মন্থরা বলতে রাজপ্রাসাদের সবাই ছিল অজ্ঞান। এই প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপনের দক্ষতাই ছিল তার রাজ অন্তঃপুরে খবর সংগ্রহের গোপন কৌশল। সামান্য আলাপে এবং কথাবার্তায় অন্যের মনোভাব বুঝে নিয়ে নিজের কর্মপন্থাকে সফল করে তুলতে পারত। কোন সময়ে কি কি কাজ করলে আরো বেশী খবর সংগ্রহ করা যায়, কিভাবে রাজঅন্তঃপুরের অভ্যন্তরে জটলা পাকিয়ে তোলা যায়

এবং সেই সংকট কি উপায়ে উত্তেজনায় পরিণত হয়, কাদের সঙ্গে সংগোপনে কথা বললে কথাটি রাজনৈতিক গুরুত্ব পায়, উত্তেজনায় পরিণত হয় এসব সূক্ষ্ম কঠিন ক্ষুরধার বুদ্ধি মন্থরার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে যেত। কিন্তু তার সুন্দর হাস্যদীপ্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে কিছুতেই মনে হয় না যে এমন তীক্ষ্ন কৌশলজ্ঞানের অধিকারী সে। মন্থরার মেধাই তাকে অসামান্য সাফল্য দিল। দাসী থেকে কূট রাজনীতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল সে। অথচ, কেউ তা ঘুণাক্ষরেও জানল না।

রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসানোর ইচ্ছা নিয়েই দশরথ গোপনে যেসব কাজ করছিল তার উপর তীক্ষ্ন নজর ছিল মন্থরার। অশ্বপতি তাকে কিছু না জানালেও বুদ্ধিমতী মন্থরা রহস্যটা ঠিকই অনুধাবন করেছিল। রাম দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তান। সিংহাসন তারই পাওনা। তবু তার দাবি নিয়ে দশরথ নিজেই চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন ছিল। আর এর ফলে, অন্তঃপুরের পাঁচজনের মনে অযোধ্যার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নিয়ে এক জটিল সংশয় এবং দুরধিগম্য রহস্য সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃত-পক্ষে দশরথ এর স্রষ্টা। রাম এবং ভরত একদিনে এক সময়ে হয়েছিল। তাদের মধ্যে কে আগে আর পরে স্থির করা যায় নি। তাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়নি। পুরনারীদের কেউ শঙ্খধ্বনি দেয়নি। বেশ সময় নিয়ে রাজ-পুরোহিত ঘোষণা করল রাম জ্যেষ্ঠ এবং কৈকেয়ীর পুত্র ভরত শত্রুঘ্ন যমজদ্বয় রামের জন্মের বেশ কিছুক্ষণ পর ভিন্ন নক্ষত্রে জন্মেছে। বিভ্রান্তির উৎপত্তি এখান থেকেই। তবু রাজরোষের ভয়ে তা চাপা রইল। দশরথের সিদ্ধান্তে সংশয়, দ্বিধা, রামের প্রতি তার পক্ষপাতপুষ্ট স্নেহ এবং ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবহেলা ও উপেক্ষা অনেকের মত মন্থরার মনেও প্রশ্ন জাগল। দশরথের মনের এই জটিলতা কেন, কিজন্যে?

নিজের দপ্তরে বসে দশরথ সুমন্ত্রের সহায়তায় কয়েকটা চিঠিপত্রের খসড়া করছিল। এমন সময় দেখতে পেল একটি সুদৃশ্য কারুকার্য করা বৃহৎ শিবিকা রাজপ্রাসাদের সদর ফটক দিয়ে ঢুকে একেবারে তার মহলের নিচে এসে থামল। একটু পরে একজন সংবাদ বাহক এসে সুমন্ত্রর কানের কাছে মুখ এনে খুব নীচু গলায় বলল ঃ মহাতেজা, বিশ্বামিত্র এসেছেন। মহারাজার সাক্ষাৎ অভিলাষী তিনি।

সুমন্ত্রর চোখের ইশারায় সংবাদদাতা সেখান থেকে প্রস্থান করল। সে চলে গেলে সুমন্ত্র বলল ঃ মহারাজ, আপনার বার্তা পেয়ে ঋষিবর বিশ্বামিত্র নিজে এসেছেন। তাঁকে আমাদের ভীষণ দরকার।

দশরথের ভুরু কুঞ্চিত হল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। সত্যিই খুব গভীরভাবে কি যেন এক চিন্তায় তন্ময় হয়েছিল দশরথ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল ঃ

সুমন্ত্র, বিশ্বামিত্রকে বোধ হয় আমাদের আর প্রয়োজন হবে না। তাঁর আগমন নিরর্থক। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি হবে?

সুমন্ত্রর অবাক হওয়ার পালা। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে দশরথের দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। অর্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল: এসব আপনি কি বলছেন? তাঁকে আমন্ত্রণ করে অসম্মান করব কোন অধিকারে? আর আপনার মনে সে প্রশ্ন আসেই বা কেন?

দশরথ শান্ত কণ্ঠে বলল: দূতের মুখে তাঁর মতলবের কথা আগে জেনেছি। তাঁর সম্পর্কে আর কোন কৌতূহল আমার নেই। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে সে যন্ত্রবৎ বলতে লাগল: রাম লক্ষ্মণের মত বালককে তাঁর দরকার। নবীন রক্তের ডালিগ্রহণ করতে অযোধ্যায় এসেছেন তিনি। রাজরক্ত ছাড়া তাঁর দেবীপূজার বোধন হবে না। মানত রক্ষায় অযোধ্যা মহীপতির অযাচিত অনুগ্রহকে তাই বুকে তুলে নিতে এসেছেন। এই দুটি রক্তশতদল নাকি তাঁর বহু আরাধনার ধন। এরপর তাঁকে রাম লক্ষ্মণের অস্ত্রগুরু করতে আমার বুক কাঁপছে। আমার ভয় লাগছে। বিশ্বামিত্রের হাতে পুত্রদ্বয়কে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না। বহু আশা করে তাঁকে বার্তা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর বিরূপ আমার প্রতি।

মহারাজ, আপনি যা যা বললেন সব সত্য।

তুমিও তাহলে জান।

জানি রাজন। কিন্তু আপনি তাঁর সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধারে সক্ষম হননি বলেই বোধ হয়। পুত্রদের অনিষ্ট আশংকায় আপনি অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত এবং বিভ্রান্ত। তাই কথাগুলো ভাঙলে যে, আরো একটা অর্থ বেরিয়ে আসতে পারে ত আপনার মনে হয়নি কখনো। স্নেহের স্বভাবই অকারণ অনিষ্ট আশংকা করে।

আরো স্পষ্ট করে বল।

মহারাজ, রাক্ষসদের অত্যাচারে মুনিরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তাদের নির্মূল করার সাধ্য বর্তমানে কোন ক্ষত্রিয় আর্য রাজার নেই। সকলে রাক্ষসরাজা রাবণের ভয়ে কম্পিত। রাবণকে চটিয়ে কেউ কিছু করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ, আর্য সাম্রাজ্যগুলি বহুধা বিভক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত। আত্মকলহে, বিভেদের অন্তঃস্রোতে অন্তর্ঘাতে, অবিশ্বাসে, সন্দেহে, বিদ্বেষে, ঘৃণায়, শত্রুতায় দিন দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তাদের আত্মবল, বাহুবল বলে কিছু নেই। তাদের এই দুর্বলতা ভীরুতা কাপুরুষতার সুযোগ নিয়ে রাক্ষসশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যে মুনি ঋষিরা আর্য সভ্যতার দীপবর্তিকা বহন করে বেড়িয়েছে দেশে দেশান্তরে; যাদের সাহসে তেজে, বুদ্ধিতে অলৌকিক ক্ষমতায় আর্য সাম্রাজ্যের ভিত স্থাপিত হয়েছে তাদের মনোবল সাহস ভাঙার জন্যে রাক্ষসেরা নানাভাবে উৎপীড়ন চালাচ্ছে,—যজ্ঞ-ভূমি অপবিত্র করেছে। তপোবন তছনচ করেছে। অথচ, আর্যনৃপতিরাই মুনি ঋষিদের রক্ষক। কিন্তু তারা কেউ এগিয়ে এল না তাদের সাহায্যে। মুনি ঋষিরা অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায়বোধ করতে লাগল। এরকম একটা দুঃসহ অসহায়তা থেকে

পরিত্রাণ পেতে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বালক, কিশোর ও তরুণ—যাদের মস্তিষ্কে স্বার্থচিন্তা ঢোকেনি, পাপ প্রবেশ করেনি, দুষ্টবুদ্ধি জাগেনি, আপন পর বিচার করতে শেখেনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে যাদের যৌবন চঞ্চল, তাদের নিয়ে এক বাহিনী গড়ে তুললেন সংগোপনে। এই সব নবীন বয়সের ছেলেদের কাছে আদর্শবাদ বড়। তাদের কাছে দেশ ও জাতির চেয়ে বড় কিছু নেই। এই তরুণ প্রাণকে আত্ম নিবেদনের মন্ত্রে উজ্জীবিত করা সহজ। এরাই পরে অকাতরে, নির্ভাবনায় প্রাণ দিতে। কিন্তু রাজবংশের কোন সন্তান বিশ্বামিত্রের গুপ্তবাহিনীতে ছিল না, রাম-লক্ষ্মণকে দিয়ে ঋষি সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে চায়। রাজচক্রবর্তী ব্যতীত এই মহাযজ্ঞের ভার গ্রহণ করবে কে? তারা ছাড়া সশস্ত্র গুপ্ত বাহিনীর অধিনায়কত্ব করবে কে? সাংকেতিক ভাষায় ঋষিবর সেই কথাই বলেছেনঃ. রাজরক্ত ছাড়া দেবীপূজার বোধন হয় না। আর সে পূজার অর্ঘ্য সাজাতে হয় রক্ত শতদল দিয়ে। রাম-লক্ষ্মণ তাঁর বহু প্রতীক্ষার ধন, আর অনেক প্রত্যাশার সম্পদ। সুতরাং, তাঁর কথায় ভয় পাওয়ার কি থাকতে পারে? ঋষি বিশ্বামিত্র এক কালে অপরাজেয় মহাযোদ্ধা। তাঁর শেখা বিদ্যার ধার এখনও নষ্ট হয় নি। অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য আশ্চর্য অস্ত্র নির্মাণে তাঁর বুদ্ধি ও মেধা অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। বহু দুর্লভ অস্ত্রের নির্মাতা তিনি। কিন্তু সে সব অস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি এবং প্রয়োগ কৌশল গোপন রাখার জন্য এক যোগ্য বীরের অন্বেষণ করছেন। মন্ত্রগুরু বশিষ্ঠের মুখে রাম-লক্ষ্মণের বিক্রম, অস্ত্র ক্ষেপনে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা, নিখুঁত নিশানার দক্ষতা, সাহস, শক্তি, তেজের কথা শুনে বিশ্বামিত্র পরম প্রীত হয়ে অযোধ্যায় পদার্পণ করেছেন। মহাতেজা ঋষির বিশ্বাস তাঁর তেজ প্রতিহিংসা ক্রোধের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের বিক্রম এবং পৌরুষযুক্ত হলে এক নতুন সুস্থ, সুন্দর বাসযোগ্য আর্যভূমি হয়ত সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্বামিত্রের আদেশে, ইচ্ছায়, নির্দ্দেশে সব কার্য সংঘটিত হবে, কিন্তু তিনি থাকবেন নেপথ্যে।

এ'ত সাংঘাতিক কথা। জেনে শুনে বালকদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিতে পারি না. সুমন্ত্র।

রাম লক্ষ্মণকে কৃতিত্বের যশভাগী করতে চান ঋষি।

তুমি কি পাগল হয়েছ? দুরন্ত রাক্ষসদের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি, সাহস যেখানে আর্য নৃপতিদের নেই, সেখানে দুই বালক কি করবে? মূঢ়ের মত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণকে বীরত্ব বলে না। আমি পুত্রদের হঠকারিতা করতে পাঠাব না। বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য যাই হোক, রাম লক্ষ্মণকে বাদ দিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। এরা ছাড়া, আরো অনেক রাজপুত্র আছে।

কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই সুমন্ত্র। তাঁকে আমি শুধু রামলক্ষ্মণের অস্ত্রগুরু করতেই চেয়েছি। ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মেলামেশা দিন দিন এত গভীর এবং আন্তরিক হয়ে পড়ছে যে, আমি আর বিচলিত না হয়ে পারছি না। এই ঘনিষ্ঠতা

একদিন নিদারুণ সংকট হয়ে উঠবে। তাই রামলক্ষ্মণকে কোথাও সরাতে চাই, চোখের আড়াল করার জন্যেই বিশ্বামিত্রের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে পাঠানো। কিন্তু তার অর্থ এই না অস্ত্রশিক্ষার নামে এখনই কোন রক্তক্ষয়ী বৃহত্তর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে তারা তাদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিক।

হাসি হাসি মুখ করে সুমন্ত্র প্রশ্ন করল : মহারাজের অভয় পেলে অধীন তার কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে পারে।

উত্তম ! সম্মতি দিলাম।

অযোধ্যা থেকে রাম লক্ষ্মণকে সরানোর কোন কারণ হয়নি। তবু, মহারাজ তাদের সরানোর প্রয়োজন বোধ করেন। এর গোপন রহস্য আমাদের জানার কথা নয়। কেবল অনুমানে মহারাজের অব্যক্ত অনেক অভিব্যক্তিকে বুঝতে পারি। মহারাজের মনের গতির উপর চোখ রেখেই আন্দাজে কাজ করে যাই। আর তাতেই নাগাল পাই তাঁকে। এখন আপনার মনকে বুঝতে আর কষ্ট হয় না। রাম ভরতের জন্মের আগেই যা একটু অসুবিধা হত।

দশরথ সুমন্ত্রের কথায় চমকাল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে নিজের বিব্রত ভাব গোপন করল। মাথা নিচু করেছিল দশরথ।

সুমন্ত্রর চোখে বিস্ময়। ঠোঁটে বাঁকা হাসির ঝিলিক। একটু থেমে সুমন্ত্র পুনরায় বলল : রাজমহিষী কৌশল্যার পুত্রের প্রতি মহারাজের গোপন দুর্বলতা রাম ভরতের জন্মদিনেই জেনে ফেললাম। কেন অবশ্য বলতে পারব না। তবে, অনুভূতি আর বুদ্ধি দিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়াকে পরিমাপ করতে কোন কষ্ট হল না। দু'জনেই আপনার ঔরসজাত সন্তান। তবু আপনার এই পক্ষপাতিত্ব কেন ? বুকের অতলান্ত থেকে জিজ্ঞাসার জবাব পেলাম একসময়। রাম ভরতের মধ্যে একজন হল আর্যা রমণীর গর্ভজাত, অন্যজন হল অনার্যা রমণীর গর্ভ-সম্ভূত। বিভেদ, বিদ্বেষের বীজ এই আর্য অনার্যবোধের উপর অঙ্কুরিত। অনার্যশ্রী কৈকেয়ীর পুত্র আর্যকুলতিলক দশরথের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক এটা আদৌ মহারাজের পছন্দ নয়।

দশরথ অবাক বিস্ময়ে সুমন্ত্রের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল : তুমি কেমন করে জানলে ?

সুমন্ত্রের অধরে বিচিত্র হাসি বিদ্যুতের মত খেলে গেল। আস্তে আস্তে বলল : রানীরা গর্ভবতী হলে, মহারাজ নিজেই কৌতূহলী হয়ে আর্য-অনার্যর বিরোধ ও সমস্যা নিয়ে কত প্রশ্ন করেছেন, আজ অবশ্য সে সব স্মরণে নেই আর। মস্তিষ্কের বন্ধ কুঠুরির মধ্যে নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির এই প্রতিক্রিয়া কেন হত ঘুণাক্ষরে কখনো প্রকাশ করেন নি। নিজের বুকেই তার নিদারুণ যন্ত্রণা দাহ এবং কষ্ট বয়ে বেড়িয়েছেন। অন্তরাল থেকে আমাদের প্রিয় রাজাকে সেই দুঃসহ কষ্ট ভোগ করতে দেখে নিজের মনে পরিতাপ করেছি। আর, তার কষ্ট লাঘবের জন্যে কামনা, বাসনা ও আকাংখাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে এবং অদৃষ্টের কৌতুককে উপহাস করার জন্যে মহারাজের পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত দাঁড়িয়ে তাঁর হাত শক্ত করেছি। এজন্য ন্যায়ধর্ম, বিবেক কিছু মানিনি।

বজ্রাহতের মত স্তব্ধ বিস্ময়ে সুমন্ত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় তার কোন অনুভূতিই ছিল না। পাথর হয়ে গিয়েছিল। কেবল শুকনো অধর থর থর করে কাঁপছিল। সুমন্ত্র তাকে কথার জালে জড়িয়ে ফেলে কি করতে চাইছে তার মাথা, কূলকিনারা হারিয়ে ফেলল। এই সব চিন্তায় সে দিশাহারা হল। মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট হল।

সুমন্ত্র অন্যমনস্ক। চোখ বুজে সে অন্য কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কত কথা মনে পড়ে গেল। দশরথের চারপুত্রদের মধ্যে খুব সদ্ভাব। চার ভাই হরিহর আত্মা। কারো প্রতি কারো ঈর্ষা, বিদ্বেষ কিছু নেই। তাদের ভ্রাতৃ-প্রেম দেখলে মনে হত স্বর্গের পবিত্র ভালবাসা যেন নেমে এসেছে ধরায়। একের পর এক বক্তব্যকে মনের ভেতর গুছিয়ে নিয়ে সে পুনরায় বলল ঃ

মাতুলালয় থেকে ভরত যেদিন এ পুরীতে পদার্পণ করল সেদিন থেকে মহারাজার মধ্যে আবার বিবিধ প্রতিক্রিয়া ও মানসিক অস্থিরতা নতুন করে মাথা চাড়া দিল। অঙ্কের মত আমাদের মনের জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে গেল।

মহামাত্য বশিষ্ঠর কাছে রাম লক্ষ্মণের মত ভরত শত্রুঘ্নও একত্রে শাস্ত্র ও শস্ত্র অধ্যয়ন করত। চার কুমারেরই মেধা ছিল তীক্ষ্ণ। সর্ববিদ্যায় তারা সমান পারদর্শী। স্বভাবে আচরণে ভরত ছিল এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভ্রাতৃবৎসল, বিনয়ী, নম্র, শান্ত। তার বাণী মধুর, সান্নিধ্য রজনীর চন্দ্রিমার মতই মনোরম ও স্নিগ্ধ। কুমারদের কথা বার্তার মধ্যে ভরত-শত্রুঘ্নের কথা উঠলে নিজের অজান্তে আপনি অশান্ত ও অস্থির হয়ে যেতেন। হঠাৎ, একদিন রামলক্ষ্মণের শিক্ষার জন্যে বিশ্বামিত্রের কাছে এক দূত পাঠালেন। কৈকয়দের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে আলাদা করে দেখার এবং তাদের ভায়ে ভায়ের মধুর সম্প্রীতির মধ্যে একটা দেয়াল তোলার এই প্রবণতা আমার মত অনেকের মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগাল। রাজার এই দুমুখো নীতি কেন? রহস্যের মনগড়া একটা কিনারা করেও নিলাম। এদিকে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজানুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজা ভোগবিলাসীর পদ। তাদের কোন ত্যাগ নেই, দুঃখ বরণের আদর্শ নেই। কৃচ্ছ্রতা বরণের মনোবল নেই। নির্বিকার আত্মসুখী। নিজস্ব জগতে তাদের বাস। বাইরে যে একটা বিরাট অচেনা পৃথিবী আছে তার কিছু জানে না তারা। সুতরাং রাজকুমারদ্বয়কে দিয়ে তাঁর কোন কাজ হবে না। তিনি চান নতুন প্রজন্ম। অবশেষে বশিষ্ঠের ইচ্ছেতেই তিনি রাজপুরীতে এলেন।

সুমন্ত্রর কথা শুনতে শুনতে দশরথ স্থবির ও প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। ভ্রূ কিছু কুঞ্চিত, মুখে যথাযথ উদ্বেগ। চোখ দুটি প্রবল সম্মোহনে যেন আটকে আছে সুমন্ত্রর চোখে। কথাগুলো সব সত্য বলেই নীরব ছিল দশরথ। অকস্মাৎ বিশ্বামিত্রের আগমনে দশরথ একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। রামের বিপদের কথাই বেশি করে ভাবছিল। আর বুকের ভেতর কেমন একটা অস্থিরতা তাকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। নিজের অস্তিত্বকে জানান দিতে অনুচ্চস্বরে বলল ঃ সুমন্ত্র তুমি আমার প্রিয় সখা। তবু কাজটা ভাল করনি। রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠাতে পারি না।

কুমারদের মঙ্গলের কথা ভেবেই আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ করেছি।

উত্তম। পাদ্য-অর্ঘ এবং উপযুক্ত দান-দক্ষিণা দিয়ে তাঁকে বিদায় কর।

মহারাজ!

আমি নিরুপায় সুমন্ত্র।

রাজন, আমি আপনার একান্ত বাধ্য অনুগত ভৃত্য মাত্র। প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই। রাজাদেশ মান্য করাই আমার কাজ। তবু সখা বলে যখন স্বীকার করলেন তখন প্রশ্নের অধিকার জন্মেছে। আপনার আপত্তির কারণ জানতে পারলে সংশয় দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে সরযূর বহমানতার দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল: সুমন্ত্র আমার উৎকণ্ঠা যে প্রকৃত কোথায় তা ঠিক তোমায় বোঝাতে পারব না। আজকাল কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারি না। মনে হয়, সকলে আমার শত্রুতা করার জন্যে কেকয়রাজের সঙ্গে কোমর বেঁধেছে। বিশ্বামিত্রকেও আমার বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে। রাম-লক্ষ্মণের অনিষ্টের চক্রান্ত করতেই হয়ত এরকম একটা রাক্ষসনিধনের মত দুরূহ কাজের ষড়যন্ত্র আর পরিকল্পনা হয়েছে। তোমাকে বলতে বাধা নেই, বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য আমার ভাল ঠেকছে না। রাক্ষসদের নির্মূল করবার জন্য রাজশক্তি রয়েছে। আর্যাবর্তের বহু শক্তিশালী রাজা আছে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে যে কাজ করা যেত সহজে, তাকে এমন জটিল করে তুললেন কেন? রাক্ষস নির্মূল করার নাম করে তিনি রাম লক্ষ্মণকে কৌশলে বধ করার ব্যবস্থা করেছেন বলেই আমার সন্দেহ। এই সংশয় দূর না হওয়া পর্যন্ত কুমারদ্বয়কে তাঁর হস্তে সমর্পণ করব না।

মহারাজ আপনার আশঙ্কার কথা শুনে আমি আতঙ্ক অনুভব করছি। বিশ্বামিত্রকে অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ ঘটেনি। তাঁকে কেকয়রাজের গুপ্তচর ভাবার কোন কারণ হয়নি তিনিও আর্য রাজবংশের একজন। আপনার পরম বান্ধব। তাঁকে শত্রু মনে করছেন কেন? রাম-লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট চিন্তা তিনি কখনই করতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত কুমারদ্বয় কৈকেয়ীর অত্যন্ত প্রিয়। পুত্রাধিক স্নেহ করেন তাদের। তবু, এসব কথা আপনার মনে কেন এল?

সুমন্ত্র, তোমরা আমাকে খুব ভালবাস তাই না?

মহারাজ।

সুমন্ত্র আমায় কি খুব ক্লান্ত লাগে? সব সময় বিমর্ষ ভাবনার জর্জরিত মনে হয় কি? আমার বাইরেটা দেখে কি বুকের অস্থিরতা টের পাও?

মহারাজ, আপনার কষ্টের সঙ্গী হতে পারলে, দুঃখের ভাগ নিতে পারলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।

তুমি ঠিক বলেছ, আমি নিঃসঙ্গ। ভীষণ একা। আমার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কেউ সাথী নেই। আমি একাই সব ভার বয়ে বেড়াই।

আপনার মত ভাগ্যবান কে আছে? তবু নিজেকে আপনি যখন দুঃখী বলেন

তখন খুব আশ্চর্য লাগে। ভেবে অবাক হই, একি আপনার দুঃখ বিলাস ? না নিজের সঙ্গে নিজের কৌতুক, না, কোন বিভ্রান্তি ? কিংবা কোনটাই নয় !

সুমন্ত্র, একটা অপরাধবোধের দংশন আমার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়। নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না।

রাজার সহস্র অপরাধে কিছু যায় আসে না। রাজা কোন অন্যায় করতে পারে না। তবু কেন একটা পাপবোধের কষ্ট বিদ্ধ যন্ত্রণায় কাতর আপনি ?

তোমার কথা ঠিক। জীবনে আমিও অনেক অনিয়ম করেছি। স্বেচ্ছাচারী হয়েছি। কিন্তু সে সব নিয়ে কোন অনুতাপ আমার নাই। হঠাৎ, একটা বিরাট ভুলের কাছে মোহের বশে দাসখৎ লিখে দিলাম। সেই হল আমার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। নিজেকে নিয়ে এরকম বিব্রত হয়নি কখনও !

মহারাজ, আপনার দুঃখ আর কষ্টের কথা বলতে যদি কষ্ট হয়, আপনার সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার যদি আশংকা থাকে তা-হলে অবশ্যই সে কথা বলে বিড়ম্বনা ভোগ করবেন না।

না না। আমি একটুও তা মনে ভাবছি না। আমিও বুকের ভেতর চাপা কথার ভার সইতে পারছি না। তুমি আমার একান্ত আপনার। তোমাকে সব কথা বলতে পারলে আমি অন্ততঃ একজন সঙ্গী পাব।

সুমন্ত্র হাসল। বলল ঃ মহারাজ আপনার নিষিদ্ধ কথা শোনার কোন কৌতুহল নেই আমার। আমি বরং ঋষির পাদ্যঅর্ঘ দান করে তাঁকে পরিতুষ্ট করি গিয়ে।

আরেকটু থাক। দশরথের বুকের মধ্যে একটা ঝোড়ো বাতাসের দোলা। মনে একটা আলো আঁধারির আবহাওয়ায় কত চিন্তার ছবি ভেসে উঠল। ছিঃ ছিঃ করে উঠল বুকের ভেতর। নিজের অজান্তে অপ্রতিরোধ্য লজ্জায় মুখ আড়াল করার জন্যে জানালার ধারে সরে গেল। তারপর গভীর গোপন কথা অতলান্ত বুক তোলপার করে ছোট্ট একটা ভারী নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল।

জান সুমন্ত্র। তোমাকে খুব স্নেহ করি। সব কথা ভেঙে বলতে লজ্জা করে। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে দশরথ বলতে লাগল। তার কণ্ঠস্বর যেন সাঁওতালি মাদলের মত গুরু গুরু করে বাজতে লাগল।—এক রহস্যময়ী নারীর দুর্বার আকর্ষণ আমি কাটাতে পারেনি। নিয়তির মত সে আমাকে টেনেছে। সম্মোহিতের মত তাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে বরণ করেছি। আমার সাম্রাজ্য, রাজঐশ্বর্য সিংহাসন সব দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি তাকে। এমনকি তার গর্ভজাত পুত্রছাড়া আমার অন্যপুত্রদের মোহবশতঃ বনে নির্বাসিত করব তাও প্রতিজ্ঞা করেছি। বিগ্রহ সাক্ষী রেখে শপথ করেছি। সেদিন কি জানতাম, দেবতা আমাকে নিয়ে কৌতুক করবে ? বিশ্বাস কর পুত্রের মুখ দেখব বলে এ রকম একটা অদ্ভুত শর্তে রাজী হলাম। কিন্তু এরকম কোন সমস্যার যে সৃষ্টি হতে পারে সেদিন মনে হয় নি। ভাগ্য বোধ হয় পুত্রের সাধ পূরণ করতেই এমন কঠিন পরীক্ষার আয়োজন করল। তাই অক্লেশে জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই কৈকেয়ীকে মহিষীরূপে বরণ

করলাম। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে আমার তিন রাণীরই সন্তান হল। এখন আমি কি করব সুমন্ত্র? ভাগ্য আমাকে প্রতারণা করেছে। রাম আমার হৃৎপিণ্ড। তাকে উপড়ে ফেলে কেমন করে বাঁচব? কি নিয়ে থাকব? কেমন করে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাব? আমার জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করছে এই প্রতিজ্ঞা। আমার শপথের মধ্যবর্ত্তী হয়ে যে দেবতা বিরাজ করছে তাকে কিছুতে বিস্মৃত হতে পারছি না। একদিকে আমার ধর্ম, আর একদিকে আমার আকাংখা; এই দুয়ের সংঘাতে আমি জর্জরিত। কি করলে ভাল হয়, সংকট থেকে উদ্ধার পাই বলতে পার?

সুমন্ত্র নির্বাক। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও বলতে পারল না।

দশরথ অপরাধীর মত মাথা নিচু করে রইল। এখন অনেক শান্ত, স্থির সে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গলাটা সামান্য নামিয়ে বিব্রতভাবে বলল: মহারাজ, সত্যিই বিধাতা বড়ই রসিক। এক হাতে দিয়ে অন্যহাতে নিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত জমাখরচের হিসাব মিলিয়ে তৃপ্ত হবার অবকাশ থাকে না। ভাগ্যের কৌতুক বড় নির্মম। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার পথ বন্ধ। লক্ষ্য জয়ের পথ আপনাকে কৌশলে তৈরী করে নিতে হবে। রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রেরণা স্বার্থ ও সুবিধা। আদর্শ তারপরে। রাজনীতি কূটনীতির গোপন খেলায় লক্ষ্য জয়ের পথ তৈরী হতে পারে। ধর্ম, আদর্শ, ন্যায় বিবেক ওসব সাধারণ মানুষের জন্য। রাজনৈতিক খেলায় ওর কোন মূল্য নেই। এখন কি উপায়ে আপনার স্বার্থ নিরাপদ এবং বাধামুক্ত করা যেতে পারে তা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। একাজে বিশ্বামিত্র আমাদের প্রচণ্ড সহায় হতে পারেন। তাঁকে বরং আপনার কাছে ডেকে আনি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুমন্ত্রের কথাগুলো গিলছিল দশরথ। বিশ্বামিত্রের কথা শোনা মাত্র সম্বিৎ লাভ করল সে। নিজের এক অসহায় অস্তিত্ব নিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। না, কক্ষনো না। রাম-লক্ষ্মণকে তাঁর হাতে সঁপে দিতে পারব না।

কেন পারবেন না? দুর্বলতা আপনাকে মানায় না। এখন কঠিন সমস্যা জয় করার মনোবল চাই! কারণ আপনার সততা এবং ধর্মের সুনাম রক্ষার জন্যে প্রয়োজন বিনীত এক মুখোশ। রাম ভরতকে নিয়ে ক্ষমতার যে লড়াই কিন্তু আপনার নিজের সঙ্গে আপনার নিজের লড়াই। পিতার সঙ্গে পুত্রের, স্বামী সঙ্গে স্ত্রীর, রাজার সঙ্গে রাজপুত্রের। এ সংঘাত ভাই-এর সঙ্গে ভাইর। এ এক অদ্ভুত আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ। শঠতায় সঙ্গে শঠতা এবং মিথ্যার সঙ্গে মিথ্যার। এর থেকে কারো পালানর উপায় নেই। কারণ আমরাও কর্ত্তব্যবোধে, প্রেমে আপনার নিজস্ব সংঘাতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব।

তোমার কথা শুনে আমার ভীষণ ভয় করছে। তোমাকে আমার দুর্বলতার কথা জানিয়ে ভুল করেছি।

রাজনীতির এই কদর্য চেহারা দেখে লজ্জা বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এসব না থাকলে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কোন মানে হয় না। সাম্রাজ্য, সিংহাসন অধিকার করতে গিয়ে কে কবে; কোন নীতির পরিচয় দিয়েছে? নীতি দুর্নীতির চিরন্তন

মাপকাঠি রাজনীতিতে কোনদিন নেই। রাজনীতির কারবার বাস্তব নিয়ে। বাস্তবের যা হতে পারে বা হওয়া সম্ভব তাই মনে রেখে আমাদের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। সংঘর্ষের যে আগুন আপনার বুকে অহরহ জ্বলছে একদিন তা সমগ্র অন্তঃপুরে ছড়িয়ে পড়বে। রাজ্যে রাজ্যে তার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়লেও আশ্চর্য হব না।

সুমন্ত্র আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি আমার সহায় হও।

মনের উদ্দেশ্যকে গোপনে রেখে, বিরোধ এড়িয়ে লক্ষ্যের পথে যেতে হলে দরকার অনেক কৌশল, কূটবুদ্ধি এবং পরিকল্পনার। বিশ্বামিত্রের আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে মেলাতে পারলে আমরা এক বিরাট জয় আদায় করে নিতে পারব।

দশরথের সর্বশরীর থর থর করে কাঁপল। কণ্ঠ রুদ্ধ হল। দুই চোখে তার একটা অসহায়ভাব ফুটল। সুমন্ত্রর নির্ণিমেষ চোখে তার অস্থিরতা ধরা পড়ল। দশরথ বড় বেশি দুর্বল এবং অসহায় এক মানুষ। আবার খুবই আত্মনির্ভরশীল এবং দুঃসাহসী। এক অদ্ভুত বিরুদ্ধ প্রকৃতির মানুষ। সুমন্ত্র কথা বলার মধ্যে পলকের জন্যে একবার দেখল তাকে। দশরথকে দৃঢ় বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যেই বলল ঃ উঁহু, মহারাজ বিচলিত হবেন না। রাজনীতিতে চিত্ত দুর্বলতার কোন স্থান নেই। ক্ষমতার উত্তাপে রাজনীতির গর্ভদেশ সর্বদা জ্বলে। তন্ত্র যাই হোক বাইরের লড়াই ছাড়া রাজনীতি নেই। বৃহস্পতির এসব রাজনৈতিক তত্ত্ব আপনার অজানা নয়। আপনাকে স্মরণ করে দেয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা অনায়াসে বিশ্বামিত্রের কল্যাণমূলক মানবসেবাকে রাজনীতি করে তুলতে পারি। রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে পাঠিয়ে আমরা এক ঢিলে দুই পাখী মারতে পারব।

দশরথের মুগ্ধ চোখে বিস্ময়। সুমন্ত্রর কথাগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে গিলতে লাগল। দশরথের মুখ গম্ভীর এবং থমথমে। পাথরের মত চুপচাপ বসেছিল। তার দিকে একবার আড়চোখে তাকাল সুমন্ত্র। তারপর বলতে লাগল ঃ এর ফলে ভরত শত্রুঘ্নর কাছ থেকে রাম লক্ষ্মণও দূরে দূরে থাকতে পারবে। অন্যদিকে বিশ্বামিত্রর অস্ত্রশিক্ষায় দিন দিন তারা দক্ষ ও বলশালী হবে। নতুন নতুন অদ্ভুত অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করে এক অসাধারণ যোদ্ধা হয়ে উঠবে। এটাও এক বড় লাভ আমাদের। অস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর বিশ্বামিত্রের নির্দেশ মত গুপ্তবাহিনীর সঙ্গে তারা এস্ত্রে লড়বে। এই যুদ্ধ রাক্ষসদের অত্যাচার যদি নির্মূল নাও করে, তাদের উৎপাত অন্ততঃ কিছুটা কমবে। আর্যশক্তির উত্থানে তারা ভীত ও বিব্রত বোধ করবে। রাক্ষস দমনের সব গৌরব খ্যাতি দলের অধিনায়ক রাম-লক্ষ্মণের প্রাপ্য হবে। কারণ গুপ্ত-বাহিনীতে তারাই একমাত্র রাজপুত্র। নেতৃত্ব ও বাহিনী পরিচালনার অধিকার বিশ্বামিত্র তাদের দুভাইকে যে দেবে তা বলা বাহুল্যমাত্র। লোকে ধীরে ধীরে জানবে রাম-লক্ষ্মণ দুর্গত এবং উৎপীড়িত মানুষের দুঃসময়ের বন্ধু ও সহায়। তাদের সেবা ও কল্যাণের জন্যে রাজপ্রাসাদের বিলাস, আরাম, আনন্দ, সুখ সব ত্যাগ করেছে তারা। শুধু তাই নয়, রাম যে নিজের দেশ এবং দেশের মানুষকে বাস্তবিকই

ভালবাসে এই বোধ যত প্রবল হবে, সিংহাসনে রামের দাবী ততই সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে। দেশের উত্তরাধিকার বইতে পারার মত যে মানুষটি তৈরী করল বিশ্বামিত্র সে কেন আর্যাবর্তের নেতৃত্বে থাকবে না, সিংহাসনের উত্তরাধিকার পাবে না। এই জিজ্ঞাসাই রামের সিংহাসন লাভের পথে সব রকমের বাঁধা ও বিরুদ্ধতাকে অনায়াসে জয় করতে পারে, সমস্ত প্রতিকূলতাকে নিজেদের অনুকূলে ঘুরিয়ে নেওয়ার অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে আমাদের। কেকয়রাজের যে দাবী এবং যুক্তিই থাকুক এই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারবে না। আপনাকেও সত্যভঙ্গের জন্যে দায়ী হতে হবে না।

দশরথ নির্বাক। কথা বলার মত অবস্থা ছিল না তার। সরল দুই চোখে অগাধ বিস্ময়। বিভোর বিহ্বলতা। সমস্ত শরীর আর হৃদয় দপদপিয়ে উঠল এক অদ্ভুত স্বস্তির উল্লাসে। নিঃশব্দ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে উঠে এল তার। হাসি হাসি মুখ করে বললঃ সুমন্ত্র, তোমার মন্ত্রণা চমৎকার। নামের সঙ্গে তোমার মন্ত্র ও মন্ত্রণার মিল অপূর্ব। তোমার তুলনা তুমি। আমাকে তোমার আলিঙ্গন দাও।

সকালের রাঙা আকাশ থেকে লাল রঙ গলে গলে পড়ছিল সরয়ূর জলে। সেইদিকে এক জ্বালাভরা চোখে তাকিয়েছিল কেকেয়ী। ভোরবেলায় শান্ত সুন্দর শ্রী অনুভব করার মত মন ছিল না। বুকের জ্বালায় অক্ষম রাগ, আর এক অব্যক্ত গভীর বেদনা; সুন্দর-শান্ত-স্নিগ্ধ-মনোরম ভোরবেলাটা হয়ে উঠল বিবর্ণ।

আনমনেই বাইরের দিকে তাকিয়েছিল কৈকেয়ী। বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে কিছু ভাবছিল গভীর হয়ে। একা একা বিশাল বারান্দা জুড়ে ক্ষিপ্তপ্রায়ের মত ঘোরাফেরা করছিল। পিঠের উপর ঝুলে পড়া খোঁপাতে মাঝে মাঝে হাত দিচ্ছিল। কখনও বা তপ্ত মাথাটা চেপে ধরছিল। দু'হাতে কখনো চুলগুলো মুঠো মুঠো করে খামচে ধরছিল। একটা বিপুল কিছু উৎপাত চলছিল তার বুকের ভেতর। মন্থরা এর স্রষ্টা।

প্রকৃতপক্ষে, সে রহস্যের পর্দাটা একটানে খুলে দিয়ে দেখাল, রাজঅন্তঃপুরে কৈকেয়ী কত একা। কী ভীষণ নির্বান্ধব সে! পুত্র ভরত-শত্রুঘ্নকে নিয়ে কি দারুণ ষড়যন্ত্র চলেছে ভেতরে ভেতরে;—অথচ তার বিন্দু বিসর্গও জানে না সে। মন্থরা তাকে দেখার চোখ এবং বুদ্ধি যোগাল। মন্থরার কাছে সব শোনা থেকে মেজাজটা তার তিক্ত ও রুক্ষ হয়ে ছিল। কিছুই ভাল লাগছিল না। এক প্রগাঢ় যন্ত্রণা তার বুকে থাবা গেড়ে বসেছিল। থেকে থেকে মনের ভেতর প্রশ্ন জাগল, সে কি তবে, শত্রুপুরীতে বাস করছে? সুদক্ষ নটের মত দশরথ তার সঙ্গে অভিনয় করছে কেন? স্বজন পরিবেষ্টিত এ কোন জঙ্গলে সে বাস করছে।

একটা অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দে ভরে উঠেছিল বারান্দা। পায়ের নীচে মৃদু একটা কম্পন মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিল কৈকেয়ী। সারা শরীরে এক অপ্রতিরোধ্য

উত্তেজনার তরঙ্গ বিদ্যুৎ প্রবাহের মত বয়ে যাচ্ছিল। আর, তাতেই হাঁটুটা থরথরিয়ে কাঁপছিল। তীব্র অপমানে আর উত্তেজনায় ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার মুখচোখ। গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে মন্থরার কথাগুলো এক প্রবল সম্মোহনে তাকে আটকে রাখল।

দশরথ পিতা হয়ে নিজের ঔরসজাত ভরত ও শত্রুঘ্নকে শত্রুর চোখে দেখল কি করে? ভাবতে তার কষ্ট হল না। বুক ফাটল না, রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে তাদের আলাদা করে দেখতে? দশরথ এত নীচে নেমে গেল কি করে? কেমন করে ভাবল তার পুত্রেরাই কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী তার? রাম-লক্ষ্মণের শত্রু? ভায়ে ভায়ের মধ্যে বিবাদ বিভেদের এই দেয়াল সৃষ্টি কেন? পিতা হয়ে এক দুগ্ধপোষ্য বালকের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করতে তার লজ্জা হল না? আত্মগ্লানি অনুভব করল না? দশরথের আচরণ কৈকেয়ীর মর্মস্থল বিদ্ধ করল। সমস্ত অন্তর তার ঘৃণায় রি রি করে উঠল। মনে মনে তাকে ধিক্কার দিতে লাগল ঃ ছিঃ ছিঃ মহারাজ, তুমি ইক্ষ্বাকুসিংহ অজের গুহার সিংহ শাবক নও, এক ধূর্ত বৃদ্ধ শৃগাল। তুমি নৃপতিকুলের লজ্জা। তুমি স্বামী, কি বলব তোমাকে? কৈকেয়ীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মুখখানায় বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। দশরথের ব্যবহার তার মনটাকে আরো খারাপ করে দিল।

কানের পর্দায় মন্থরার কথাগুলো তখনো ঝংকারে বাজছিল। আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে মা? ওঠ, একবার নয়ন খুলে দ্যাখ—দুনিয়ার হালচাল কি? কোথায় কি ঘটছে? যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছ তা যে মাটি, না চোরাবালি তাও তুমি জান না। এত ছেলেমানুষ তুমি। তোমায় নিয়ে আমি কি করব? কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করাই, স্বামীর কপট অভিনয়ে তুমি সম্মোহিত। নিজেকে তুমি কতকগুলো নিগড়ে বেঁধে রেখেছ। গণ্ডীর বাইরে যেতে চাও না। তাই চোখ থাকতে অন্ধ। কিন্তু তুমি এখন আর একা নও। সন্তানের জন্যে তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। পিতা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে, কিন্তু জননী কখন পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। তোমারও থাকা চলবে না, এই কথাটা বোঝার সময় হয়েছে।

মন্থরার কথাগুলো কৈকেয়ীর শুনতে খুবই কটু লেগেছিল কিন্তু তার অভিযোগ নিরর্থক ছিল না। একটি বর্ণও সে মিছে বলেনি। তার সব বক্তব্যই ঠিক। প্রত্যেকটি ঘটনার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের ভেতর তার যথেষ্ট যুক্তি ও বুদ্ধির ধার ছিল। মন্থরা নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার গুণে কেকয়রাজ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিল। মহারাজ অশ্বপতি তার কার্যে মুগ্ধ হয়ে নিজের সপ্তমাণিক্যের সাতনরী কণ্ঠহার দিয়েছিল তাকে। শুধু তাই নয়, বিশেষ যৌতুক স্বরূপ স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করেছিল। কেকয়রাজের সে যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং কাছের মানুষ এ অঙ্গুরী ছিল তারই প্রতীক। মন্থরার বিশ্বস্ততার সাক্ষী। এই আংটির জোরেই তাকে বিশ্বাস করা যায়।

মন্থরা সত্যি কৈকেয়ীকে অবাক করল। এত অবাক সে আর কখনও হয়নি।

তাই কিছুক্ষণ থম হয়ে বসে রইল চুপচাপ। কি করে বিশ্বাস করবে দশরথ পিতা হয়ে ভরত-শত্রুঘ্নকে তার অবাঞ্ছিত সন্তান মনে করে। পিতৃস্নেহ এবং পিতৃরাজ্য থেকে তাদের উভয়কে বঞ্চিত করার জন্যে এক হীন ষড়যন্ত্রে মেতে আছেন গোপনে? কেমন করে জানবে, তার গর্ভজ পুত্রদ্বয় অযোধ্যার অভিশাপ? তাদের নিঃশ্বাসে বিষ? তাদের সান্নিধ্য থেকে প্রিয়তম ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে রাখার জন্য বিশ্বামিত্রের আশ্রমে তাদের পাঠানো হল? দুরন্ত ক্রোধে কৈকেয়ীর ঠোঁট বেঁকে গেল। অবিশ্বাসভরা চোখে মন্থরার দিকে চেয়ে থাকল। কিন্তু প্রতিবাদ করার মত জোর পেল না।

কৈকেয়ীকে নিরুত্তর দেখে মন্থরা তার ক্রোধের ইন্ধন জোগাল। বলল: মেয়ে মানুষের চোখ বোধ হয় সবই দেখতে পায়। তবে, সব ব্যাপারটা ভীষণ গোপন। মহারাজের সব কাজকর্মই একটা নিয়ম শৃংখলায় বাঁধা। তাই বাইরে থেকে তার কাজের ধারা পরিমাপ করে উঠা যায় না।

নিজের অজান্তে একটা বড় শ্বাস পড়ল কৈকেয়ীর। বুকের অতলান্ত থেকে উঠে আসা একটা কষ্ট আর্তনাদের মত তার কণ্ঠস্বরে ঝংকারে বাজল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করল—ও কি চায়? তারপরেই উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত লাগিয়ে সে উচ্চারণ করল: কুব্জা, তুই যা বললি, একথা আর কেউ বললে তার গলা টিপে ধরতাম। তোর কথা অস্বীকার করব এমন জোর নেই মনে। আবার বিশ্বাস করতেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক স্নেহের ভালবাসার। কিন্তু সে সম্বন্ধকে এমন কালিমালেপন করার কি সুখ মহারাজের? একটা দুরন্ত অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণায় কেন আবিল হয়ে উঠবে পিতার হৃদয়? স্নেহের জায়গায় ঘৃণা? ছিঃ ছিঃ! মুখের উপর রাজ্যের বিরক্তি ফুটিয়ে বলল: পুত্রকে পুত্র হিসাবে দেখতে কিংবা কল্পনা করতে পারছে না। এর চেয়ে দুঃখের যন্ত্রণা আর কি হতে পারে? আমাকে ঘেন্না করা খুব কঠিন, তাই বোধ হয় আমার ছেলেদের ঘেন্না করে শোধ নিচ্ছে। আর, এই বিদ্যেটা আমাকেও পরোক্ষ শেখানো হল। ঘেন্না করা খুব সোজা। একদিন আমিও কৌশল্যা-সুমিত্রাকে করেছিলাম। কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে পেয়ে সব বিদ্বেষ ভুলেছি। কৈ তাদের'ত আমি অন্য চোখে দেখি না? ভাবি না, তারা আমার পর। ভরত-শত্রুঘ্নের মত রাম-লক্ষ্মণের শরীরেও আমার স্বামীর রক্তধারা বইছে। তারাও আমার সন্তান। আমি তাদের ছোট মা। আমার নয়নমণি রাম, আর হৃৎপিণ্ড ভরতকে নিয়ে এই কুৎসিৎ ষড়যন্ত্র করছে কারা? ভাইয়ে ভাইয়ে মধুর স্নেহ ও ভালবাসার সম্বন্ধকে তারা বিষিয়ে তুলছে কেন? এতে তাদের কি লাভ? স্বার্থই বা কি? অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের মধ্যে বিভেদ আনতে কে বা কারা ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সৃষ্টি করছে?

কৈকেয়ীর মুখে চোখে সত্যিকারে আতঙ্ক ফুটে উঠল। কিন্তু মন্থরার অধরে ধূর্ত হাসি। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে ফিক্ ফিক্ করে হাসছিল। তার হাসিতে কৈকেয়ী চমকাল। তার বুক থর থর করে কাঁপল।

কথা বলার সময় মন্থরার দুই ভুরু কোঁচকাল। চোখের তারায় বিদ্যুৎ ঝলক দিল। আস্তে আস্তে বলল: সব কথা বলতে নেই। জানাতেও নেই। ধীরে ধীরে নিজেই সব জানতে পারবে। তবে, নিজের স্বার্থকে যে না বোঝে সে নির্বোধ। নির্বুদ্ধিতার কোন দাম নেই সংসারে। হাতের তীর ফস্‌কে গেলে তাকে পস্তাতে হয়—এটা তোমার জেনে রাখা ভাল।

কুব্জা তোর কথায় রহস্য। স্পষ্ট করে কথা বলতে তোর কি কষ্ট হয়?

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মন্থরা বলল: মহারাজ তোমার স্বামী। আমি এক সামান্য দাসী। ছোট মুখে বড় কথা বলতে নেই। তবে যদি একান্ত না শোন, তাহলে বলতে হবে। কিন্তু পতি নিন্দা সইতে পারবে কি?

ও সব কথা ভাবিস না কুব্জা। তুই বল। মনটাকে আমি শক্ত করেছি।

মন্থরা একটু গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিল। তারপর ভণিতা করে বলল: মেয়েরা লোক নিন্দা করতে এবং শুনতে ভালবাসে। আমি কিন্তু সেরকম কিছু করছি না। মহারাজের ভাবগতিক ভাল নয়, মেজাজ যে ভাল যাচ্ছে না—এটা বোধ হয় তুমিও বোঝ। তোমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কেমন জানি না। তবে, মহারাজ নিজেকে বড় বেশি নিয়ম শৃঙ্খলায় বেঁধেছেন। বাইরে থেকে তাঁর সুচতুর অভিনয়ের কিছুই বোঝা যাবে না। আমি কিন্তু সন্দেহের বীজ ছড়াতে আসিনি। এখানকার বাতাসে যেসব বার্তা জানতে পারা যায়, তাই জানি আমি।

কৈকেয়ীর চোখ মুখ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর গণগণে হয়ে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: কি জানিস তাই বল। তার রক্তের বিশুদ্ধতার শুচিবাই আমি ভাঙব।

মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলতে মন্থরা কখনও সংকোচ বোধ করে না। তবু কথা বলার সময় তার সুন্দর মুখখানায় আক্রোশ ফুটে বেরোল। চোখে হিংসায় জ্বলজ্বল করতে লাগল। বলল: মহারাজ তোমার অনুগত আর অনুরক্ত থেকে তোমাকে বোকা বানাতে চান। আফিমের নেশায় যেমন সহজে ঝিমুনি কাটে না তেমনি প্রেমের ঘোর যায় না সহজে। মহারাজের প্রেমে মেতে আছ তুমি। নেশায় নেশায় আচ্ছন্ন। কেমন করে বুঝবে যে, এ প্রেম নয়, ছেলে ভোলানোর খেলা। খেলনা ছাড়া কি? তুমি না বললেও মহারাজ বড় রাণীর কক্ষে যাওয়া বন্ধ করেছেন। তোমাকে সন্তুষ্ট করতেই কৌশল্যার প্রতি অনাদর অবহেলা তাঁর বেড়েছে। অথচ, তুমি জান না, এতে কি ক্ষতি তোমার হল? কৌশল্যার সব রোষ পড়ল তোমার উপর। তার দুর্ভাগ্যের জন্যে প্রকারন্তরে তোমাকেই দায়ী করল সে। একদিন তুমি তাকে গৃহ ছাড়া করেছিলে, আজ দ্বিতীয়বার স্বামী থেকে বঞ্চিত করলে। তোমাকেই সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবল। তার চোখে তুমি চিরশত্রু হয়ে রইলে। কোনদিন সে তোমাকে ক্ষমা করবে না। সব দিন সমান যায় না। ভবিষ্যতে এই লাঞ্ছনার যন্ত্রণা অপমান সুদে আসলে আদায় করবে কৌশল্যা। তোমার প্রিয়তম স্বামী অনার্য-বিদ্বেষ বুকে নিয়ে কি কৌশলে কৌশল্যার কাছে তোমাকে অপ্রিয় করে তুলল। তোমায়

চিরশত্রু করে রাখল তাকে। তাহলে দ্যাখ কত সুন্দর অভিনয় করেন মহারাজ দশরথ।

কৈকেয়ী পাষাণের মত স্তব্ধ। আভ্যন্তরীণ রাগে উত্তেজনায় তার বুক কেঁপে উঠছিল। মুখেতে সামান্য বিব্রতভাব। চোখের কোণে কান্না থম থম করে। এরকম একটা নিষ্ঠুরতার ভেতর মন্থরা একরকম তীব্র আনন্দ অনুভব করল। কৈকেয়ীর থুতনিটা একটু নেড়ে দিয়ে আদর করল। বলল: বোকা মেয়ে। রাগ কান্না নির্বোধের অস্ত্র। ওদিয়ে হৃদয় গলানো যায়, কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘোরানো যায় না। বিচলিত হবে কেন? রথের রশি তোমার হাতে। এখনও অনেক কিছু জান না তুমি।

কৈকেয়ী স্তিমিত চোখে মন্থরার দিকে চেয়ে রইল। বুক জুড়ে তার এক অসহায় সমুদ্র। কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না। মন্থরার স্পর্শকাতর মন তার অবস্থা দেখে কষ্ট বোধ করল। এক চৌম্বক আকর্ষণ প্রবল বেগে কৈকেয়ীকে তার দিকে টানতে লাগল। এক অদ্ভুত নৈকট্যের স্বাদ তার বুকের ভেতর তৃপ্তি ছড়াতে লাগল। দশরথ যে তাকে খেলা শেষে ভাঙা পুতুলের মত ছুঁড়ে ফেলে খেলা ভেঙে উঠে যাবে এই সত্যটাকে জানার জন্যে কৈকেয়ী কোনদিন মনোযোগ দেয়নি। কৈকেয়ীকে অযোধ্যায় অন্তঃপুরে এত কাছে থেকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছে যে, তার প্রতি একটা সুতীব্র স্নেহ আর মমতা জন্মেছে। আর এই মুহূর্তে তা যেন মোমের মত তার বুকের ভেতর গলে গলে পড়তে লাগল। নিদারুণ দুর্ভাবনায় কৈকেয়ীকে চোখের সামনে অঙ্গার হয়ে যেতে দেখে মন্থরা অস্থির হল। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল: অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ? তুমি কি জান না মানুষে মানুষে স্থায়ী সম্পর্ক বলে কিছু নেই। আত্মীয়তা একটা সংস্কার মাত্র। মহারাজকে স্বামী বলে ভাবলে সে তোমার স্বামী, আবার যদি শত্রু মনে কর তাহলে শত্রু।

কৈকেয়ী বিস্ময়াবোধে হতভম্ব হয়ে আতঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করল—কি করে সেটা সম্ভব?

ওসব কথা ভেবো না। অন্য চিন্তা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখ। অতীতের একটা ভুল শোধরানোর জন্যে মহারাজের এত কান্ড। অযোধ্যার সিংহাসনের উপর তোমার পুত্রের কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব থাক এটা নিজে থেকে মহারাজ কখনও চায় না। নিজে থেকে তুমি যদি দাবী কর কখনো, তাই প্রেম প্রেম খেলনা দিয়ে তোমাকে অন্যমনস্ক করে রাখা। রামের প্রতি তোমার স্নেহ-মমতা-দরদ-আবেগকে দুর্বার আর দুর্দম করার জন্যেই কৌশল্যার খাসমহল থেকে রামকে এনে তোমার চোখে চোখে রাখল। ঐ এক কারণে কৌশল্যাকেও অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনল। তোমার চোখের উপর কৌশল্যাকে উপেক্ষা করে প্রকৃতপক্ষে তোমাকেই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। কিন্তু ঐ চাওয়া মহারাজের প্রেমে নয়, ঘৃণায়। তোমাকে বিভ্রান্ত করার এক অদ্ভুত কৌশল। মহারাজ চক্রান্ত করে তোমার পুত্রকে মাতুলালয়ে পাঠিয়েছিল, সে শুধু তোমার শূন্য

বুকের স্নেহ নিয়ে রামকে বড় করে তোলার জন্যে। রামের প্রতি তোমার বুকে দুর্বল ভাবাবেগ জানানো ছিল মহারাজের উদ্দেশ্য।

কৈকেয়ী খুব আশ্চর্য হল। বুকের ভেতর জমাট, শক্ত পাথরের মত অমোঘ এক শীতলতায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। মাথাটা গুলিয়ে গেল বারে বারে। চোখের উপর নানারকম দৃশ্য ভেসে উঠল। তার সবটার কোন অর্থ হয় না। তবু তার ভেতর হারিয়ে গেল তার সত্তা। মন্থরার কথাগুলোর সঙ্গে জীবনের নানারকম ছবি তোলপাড় করতে লাগল। আর একটা অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে দাঁত টিপে। ভিতরে এক তীব্র জ্বালায় সে মাথা নাড়ে। সরল বিষণ্ণ একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে তীক্ষ্ন স্বরে চিৎকার করে উঠল আচমকা। কুব্জা!

অবাক হয়ো না মেয়ে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে কষ্টই হয়। কিন্তু তাই বলে বাস্তবকে'ত ভোলা যায় না। আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে বলি না। কার্যকারণ মিলিয়ে তুমি শুধু প্রকৃত ঘটনাগুলো মেলালে অঙ্কের মত তার একটা উত্তর অবশ্যই পাবে। আচ্ছা বলত, সিংহাসনের দাবিদার হিসাবে ভরতকে কখনও কল্পনা করেছ তুমি? অথচ, নেপথ্যে তাকে নিয়ে এক ষড়যন্ত্র হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নই তোমার অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে। সিংহাসনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার। নিয়মানুসারে রামই অযোধ্যার রাজা হবে। তাহলে এর মধ্যে ভরতের কোন প্রসঙ্গ আসে না। কিন্তু মহারাজের চিন্তায় ভরত রামের সিংহাসনের মধ্যবর্তী হয়ে আছে। কেন? যে সিংহাসনের উপর ভরতের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই, তার দাবি সম্পর্কে মহারাজের কেন এই আতঙ্ক? তাহলে নিশ্চয়ই এর ভেতর কোন গূঢ় রহস্য আছে। নইলে, মহারাজের অন্তরে কোন সংকট দেখা দিত না। অযোধ্যার সিংহাসনের উপর ভরতের এমন কোন অধিকার আছে, যার দাবি অস্বীকার করার সাধ্য নেই অযোধ্যাপতির। তাই ভরতকে নিয়ে তোমার স্বামীর দুর্ভাবনা। সিংহাসনে রামের দাবি নিষ্কণ্টক করার জন্য রাজ-অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে তাদের জন্মের সময় থেকে সকলের অলক্ষ্যে চলছে এক নিপুণ ষড়যন্ত্রের খেলা। মহারাজ এবং তাঁর মুষ্টিমেয় কিছু বিশ্বস্ত কর্মচারী ছাড়া সে কথা কেউ জানে না। তাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা তাঁর নেই বলে দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছেন। নিজের তৈরী জালের মধ্যে বাস করছেন।

কৈকেয়ী বোবা বিস্ময়ে মন্থরার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল। তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে লাগল। তার গম্ভীর বিষণ্ণ মূর্তি মন্থরার নজর এড়াল না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করল সে। অমনি নিস্তব্ধতা আরো গভীরতর হল। নিঃশব্দে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস কৈকেয়ীর বুক থেকে উঠে এল। একটা ভীষণ কষ্ট অনেকক্ষণ ধরে তার বুকের ভেতর পাক খাচ্ছিল। তাই কথা বলতে পারছিল না। চোখে মুখে একটা ব্যথা ফুটে উঠল। একসময় অতি কষ্টে শান্ত নিরীহ গলায় মন্থরাকে প্রশ্ন করল : ভরত ও রামের মধ্যে তফাৎ মহারাজ পিতা হয়ে করবেন কেন? এই সহজ সরল কথাটা আমার মাথায় কিছুতে ঢুকছে না।

কৈকেয়ীর সরল প্রশ্নের বিস্ময় মন্থরার হাসি উদ্রেক করল। অধর প্রান্তে তার

ধনুকের মত বঙ্কিম হাসি ফুটল। অদ্ভুত বিচিত্র সে হাসি। ভুরু কুঁচকে বলল ঃ প্রত্যেক দেশের এবং পরিবারের একটা নিজস্ব নিয়ম, প্রথা, লোকাচার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য আছে। কোন কারণেই মানুষ তাকে জলাঞ্জলি দেয় না। দৃঢ়হস্তে আঁকড়ে ধরাই তার স্বভাব। প্রয়োজন হলেই তবে তার সংশোধন, সংকোচন এবং পরিমার্জন হয় এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। মহারাজ আর্যপুত্র। রাম থাকতে অনার্য জননীর পুত্র ভরতকে আর্য সাম্রাজ্যের অধিপতি করার কোন কারণ নেই। আর্যপিতার আর্যস্ববোধে ঘা খাচ্ছে। তাই, এই কুটিল রাজনীতির অবতারণা। সেজন্যেই আমার সন্দেহ রাম কখনও জ্যেষ্ঠ নয়। যে দুজন ধাই এই ঘটনা জানত, প্রমাণ লোপ করার জন্য তাদের হত্যা করা হয়েছে।

কৈকেয়ী পলকের তরে কেঁপে উঠল। তাকে চমকাতে দেখে মন্থরা বলল ঃ কিন্তু কোথা থেকে একথা শুনলাম, সে প্রশ্ন কর না আমায়। করলেও পাবে না উত্তর। হ্যাঁ, রাম যদি সত্যি জ্যেষ্ঠ হত তাহলে সিংহাসনে ভরতের দাবির কথা আসত না। রাম জ্যেষ্ঠ নয় বলেই ভরতের অধিকারের কথা আসছে। ভরতকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মূলে আছে আর্যস্ববোধ। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র মহারাজের আর্যসংস্কারকে উস্কিয়ে দিল। নানাভাবে তাতে ইন্ধন যোগাল। সেইমত এক চক্রান্তও মাথা চাড়া দিল।

হালছাড়া গলায় কৈকেয়ী বলল ঃ কুব্জা, তোর সব কথা আমি বুঝতে পারি না।

কেমন করে পারবে মেয়ে? তুমি যে তখন সূতিকার ঘরে। তোমার পক্ষে কখনই জানা সম্ভব নয় ভরত ও রামের মধ্যে কে আগে জন্মেছে? আর তখনই যে ষড়যন্ত্র সুরু হয়ে গেছে, তুমি জানবে কোথা থেকে? কি করে তুমি বুঝবে ভরত রামের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাড়াহুড়ো করে পুরোহিত এবং জ্যোতিষীদের ডেকে একটা সভা বসেছিল। ভবিষ্যতে কৌশল্যার পুত্রের সিংহাসন লাভের ব্যাপারটা পাকা করার জন্যে সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠ চক্র কৌশল করে রামকে জ্যেষ্ঠ বলে ঘোষণা করল। মহারাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। গোল যা ছিল, সুমন্ত্র তাকে গোড়াতেই চুকিয়ে ফেলল। কিন্তু মানুষ এক ভাবে, ঈশ্বর আর একরকম করে রাখে। প্রদীপের তলাতে যে ঘন অন্ধকার জমে আছে সুমন্ত্র বশিষ্ঠ তা টের পেল না।

কৈকেয়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এত অল্পেতে ভেঙে পড়লে হবে? এখনও নিজেকে শুধু ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে। ভাঙা গড়ার কাজ সবে সুরু। মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য এবং কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, আত্মগ্লানিত থাকা স্বাভাবিক। সোনা'ত পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়। তোমাকেও অনেক পুড়তে হবে।

মন্থরা আড়চোখে কৈকেয়ীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থামল। বুক থেকে একটা গভীর শ্বাস নামল ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে তার মুখের মাংস পেশী শক্ত হল। ভুরু কুঁচকে গেল। বলল ঃ হাজার হোক

মহারাজ তোমার স্বামী। তাঁর সম্বন্ধে এত কঠিন কথা বলা আমার শোভা পায় না। তবু বললাম, মহারাজ কেকয়ের ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যও একসূত্রে বাঁধা। সেইকথা সব সময় মনে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করেছি। আমার কোনো অসতর্কতা এবং গাফিলতির জন্যে তাঁর কন্যা এবং দৌহিত্রের কোন বিপদ বা অসম্মান যাতে না হয় সেকথা বলে সাবধান করা আমার কর্তব্য। আমি শুধু সেই কর্তব্য করলাম। মনে রেখ, এ পুরীতে তুমি ছাড়া তোমার পুত্রদের আর কেউ আপনজন নেই।

মন্থরার কথাগুলো কৈকেয়ীর মস্তিষ্কে চিকুর হানা মেঘের মত দপদপ করতে লাগল। কৈকেয়ী কিছু বলার আগে মন্থরা প্রস্থান করল।

তারপর থেকেই সে ভীষণ অশান্ত এবং অস্থির। নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে মন্থরার কথাগুলোর নিরন্তর সংঘাতের কষ্ট তার বুকের ভেতর মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল।

জানলা দিয়ে প্রাসাদ চত্বরে ছোট্ট উদ্যানের দিকে চেয়ে রইল। রাঙা নরম রোদে স্বপ্নময় হয়ে আছে জায়গাটা। ঘাস ফুল ফুটেছে অনেক। রজনীগন্ধা কুঁড়িগুলো ফোটার প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। নিঃশব্দ এক প্রাণের খেলা চলছে এই এক টুকরো উদ্যানের চৌহদ্দিতে।

চটি পায়ে দশরথ আস্তে আস্তে ঢুকল। কৈকেয়ী তার চলার ভঙ্গিটার দিকে তাকিয়েছিল। পায়ের ধাপ ফেলাগুলো সমান মাপের নয়। একটু অস্বাভাবিক। জল ভেঙে চলার সময় যেমন পা ফেলে অনেকটা সেইরকম। শরীরটা একটু সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কৈকেয়ীর বুকে আশঙ্কায় স্তব্ধতা নামল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার আহ্বানের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

দশরথ কৈকেয়ীর কাছে আজকাল আসে অনেকটা নেশার মত। কিন্তু তার মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নেশা ছুটে যায়। কেমন স্তিমিত হয়ে আসে উৎসাহ উদ্দীপনা, বুকের উচ্ছলতা। এটা বোধ হয় বয়সের একরকম ক্লান্তি। একই মানুষ, একই চেনা মুখ, একই রকম ফূর্তি। সবটাই কেমন যেন একঘেঁয়ে। কৈকেয়ী তার বুকের অনেকখানি জায়গা জুড়ে জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে। যৌনির উলঙ্গ আকর্ষণ আর উন্মাদনা ছাড়া কৈকেয়ীর আর কোন গভীর ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক নেই। দেহের আকর্ষণ মদের মত। অগভীর এক অভ্যাস মাত্র। সেই অভ্যাসেই যে সে শুধু কৈকেয়ীর ঘরে আসে তা নয়। আর আছে তার শাসনের দাপট, কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। তার দারুণ দাপটের জোরে দশরথ তার অনুগত ও বাধ্য হয়ে থাকে। এই দুর্বলতা একমাত্র সাক্ষী সে নিজে। আস্তে আস্তে মেঝেতে পা রেখে সে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত এগোতে লাগল।

কৈকেয়ীর খুব কাছে দাঁড়িয়ে সে অপলক চোখে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। নিজের অজান্তেই একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়ল।

কৈকেয়ী চমকাল। একটা আবেগ আগে থেকেই তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। দশরথকে দেখে একটা দুরন্ত কান্না তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। দাঁত দিয়ে

ঠোঁট কামড়ে ধরে সে প্রাণপণে কান্নার সঙ্গে লড়ছিল। অভিমানের সমুদ্র তার বুকে তোলপাড় করছিল।

দশরথ স্তিমিত চোখে তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মৃদুস্বরে বলল: তোমাকে ভীষণ শ্রান্ত অবসন্ন মনে হচ্ছে। কোথায় কি যেন ঘটে গেছে তোমার। ঝঞ্ঝা যেন ওলোট পালোট করে দিয়েছে তোমায়। তবু দুই চোখে কি এক অদ্ভুত মায়া জড়ানো। মোহ জড়ানো। তুমি কি অনির্বচনীয়? কষ্টে-দুই-চোখ তোমার ছল ছল করছে। কেমন করে বলব, রাম লক্ষ্মণ একটু আগে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বনে গেছে। সর্বাগ্রে সে খবর তোমাকে জানানোর কথা মনে হয়েছে।

কেন? খুব অবাক হয়েই প্রশ্ন করল কৈকেয়ী। হঠাৎ তার বুকের ভেতর থেকে কথাটা উঠে এল। নিঃশব্দ এক আর্তনাদের মত শোনাল।

দশরথ তার আচমকা প্রশ্নে চমকাল। কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বরে ঝড়ের বার্তা। একটা বিদ্রোহ যেন গর্জন করছে। বুকের আগুন বেরোনোর রন্ধ্র খুঁজে পাচ্ছে না বলেই তার কণ্ঠস্বর এত গম্ভীর। দশরথ সাবধান হল। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। মুখ দেখে তার মনটাকে যথাসম্ভব পাঠ করল। তারপর গাঢ়স্বরে বলল: তুমি যে তাদের ভীষণ ভালবাস। অথচ যাত্রার সময় তারা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাবল না। এই দুঃখটায় যাতে কষ্ট না পাও সেজন্যেই এসেছি। এই আর কি?

উদ্গত অশ্রু চোখের কোণে কখন মিলিয়ে গেল কেকেয়ী নিজেও জানে না বঞ্চনার কষ্টে চোখ ছলছল করছিল। একটা তীব্র অভিমানবোধ তার বুক টাটাচ্ছিল এক ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে কথাগুলো বলল, ক্লান্ত ও বটু গলায়। তার মানে পুত্রকে বনে পাঠাতে পিতার কোন কষ্ট নেই, তাব অন্তর কাঁদল না, এ'ত বড় আশ্চর্য ঘটনা। কেন মিছে নাটক করছ?

দশরথ শুধু চমকায় না, নিজেকে স্বাভাবিক বাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল অবাক বিভ্রান্ত চোখে সে একবার অপবাধীর মত বৈকেয়ীর দিকে তাকাল। দশরথের চিন্তায় সাপের ফণার মত একটি প্রশ্ন দোলে। কৈকেয়ী কি তা হলে তার ছলনা ধরে ফেলেছে? চমকিত বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করল: পিতা হলেই যে সব সন্তানের জন্যে সমান দুর্ভাবনা থাকবে, উদ্বেগ থাকবে একথা তোমাকে কে বললে? যাদের জন্যে আমার প্রাণ পোড়ে, দরদ উথলে উঠে, মন মমতায় ভরে থাকে তাদের গায়ে কোন আঁচ লাগতে দেয়নি।

কেকেয়ী বিরক্ত হয়ে বলল: কিন্তু এই কৈফিয়তের কি প্রয়োজন ছিল কোন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে এই অপ্রিয় সত্য বলতে হল।

কৈকেয়ী ভুরু কুঁচকে অবাকস্বরে বলল: হাঁ, পুরুষের সাবধানী হওয়া একটু ভাল।

কৈকেয়ীর কথায় দশরথের শরীর তীব্র আতঙ্কে শক্ত হয়ে উঠল। রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল: তার মানে?

সব কথার মানে খুঁজতে নেই। আমার মনটা আজ স্থির নেই। আমি যাই।

বলতে বলতে কৈকেয়ী ঝটিতি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কৈকেয়ী চলে গেলে দশরথ ভ্রূকুটি করে তার গন্তব্যের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কৈকেয়ীর তীক্ষ্ণ সন্দেহ, প্রবল সংশয়, দৃঢ় অবিশ্বাস,—কেন? এই মূর্তিতে কৈকেয়ীকে আগে কখনও দশরথ দ্যাখেনি। এ এক স্বতন্ত্র কৈকেয়ী। আজ তার এই ভাবান্তর কেন? এই পরিবর্তন আকস্মাৎ কোথা থেকে এল?

॥ চার ॥

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

ন'বছর পরের ঘটনা।

অকস্মাৎ মিথিলা থেকে কেকয়াধিপতির রাজসভায় মহীপতি জনক সীরধ্বজের বার্তা বহন করে আনল তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনক ধর্মধ্বজ। ধর্মধ্বজের আগমন এতই অপ্রত্যাশিত যে অশ্বপতি তাকে কোনরূপ আপ্যায়ন এবং সমাদর করার সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না। সেজন্য তাঁর মনস্তাপের অন্ত ছিল না। ধর্মধ্বজেরও দেবার মত যথেষ্ট সময় ছিল না। অল্প কিছুক্ষণের জন্য কেকয় রাজসভায় ছিল সে। তার এই আসা যাওয়া নিয়ে এমন এক রহস্য ঘনীভূত হল যে তা নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা হতে লাগল। রাজসভায় মন্ত্রী এবং আমাত্যেরা যে যার নিজের মত করে তার আগমনের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা করল। কিন্তু তাদের কোন কথাতেই অশ্বপতির মন ছিল না।

ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা অশ্বপতিকে উদাস অন্যমনস্ক করেছিল! কিন্তু বাইরে থেকে তাঁকে দেখাল অত্যন্ত শান্ত, স্থির, গম্ভীর এবং নির্বিকার এক আত্মভোলা মানুষ। অশ্বপতি নিজেকে যত সংযত রাখার চেষ্টা করছিল কিন্তু ভেতরের অশান্ত, অস্থিরতা প্রবল বেগে তাঁকে এক নির্জনতার দিকে টানছিল।

ধর্মধ্বজ চলে গেলে নিস্তেজ শরীরে অশ্বপতি সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাউকে কিছু না বলে রাজসভা থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। মন্ত্রীবর সুবীরও তৎক্ষণাৎ তাঁকে অনুসরণ করল। চলতে চলতেই শুধাল: মহারাজের আকস্মিক রাজসভা ত্যাগে বিচলিত বোধ করছি। আপনার সুকুমার মুখশ্রী অকস্মাৎ লাবণ্যহীন কেন?

সুবীরের প্রশ্নে অশ্বপতির একটি শ্বাস পড়ল। ভুরু কুঁচকে বলল: হওয়ারই কথা। শরীরটা আজ বশে নেই। মনটাও ভারী অস্থির।

সুবীর ভয় খেয়ে চুপ করে গেল।

ধর্মধ্বজের বাক্যে অশ্বপতি চিন্তাকুল হলেন। অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করেন। আর নিজের মনেই সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইলেন।

কুট রাজনীতির খেলায় তিনি এমন এক স্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন, যেখানে সামনে এগোন কঠিন আবার পিছনে ফেরাও বিপজ্জনক। কিন্তু দশরথের পরিকল্পনা এমন নিখুঁত, নির্ভুল গোড়া থেকে তার কর্মপন্থার কোন আগাম অনুমান হয় না। সেই কথাটা এবার অশ্বপতির অনুধাবনের জন্যে দশরথ স্বনামাঙ্কিত এক পত্র দিয়েছে তাঁকে। অশ্বপতি দশরথের পত্রখানি বারংবার চোখের সামনে মেলে ধরেন, আর তার সাফল্যের মাইল স্তম্ভটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তথাপি, দশরথের চিঠিখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া তাঁর বিরাম ছিল না। কখনও নীরবে কখনও বা সরবে পাঠ করছিলেন।

"কেকয়াধিপতি মহামান্য অশ্বপতি! আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তার পিতৃবংশ ইক্ষ্বাকুবংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সে আমার গর্ব, আমার বংশের সুনাম। সে এখন ভারতবর্ষের গল্প। তার আশ্চর্য মেধা, বিক্রম, রণকৌশল, দক্ষনেতৃত্ব, বাহুবল, বীর্যবল, সাহস মনীষা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়ে রাশি রাশি গল্প। সে সব কথা বলে শেষ করার নয়। রামের কৃতিত্বে পিতা দশরথ গর্বিত। নিজের সেই গোপন আনন্দের সংবাদ একমাত্র পরম আত্মীয়ের কাছেই নিভৃতে উন্মুক্ত করা যায়। বলতেও ভাল লাগে। পত্রের মধ্যে নিজেকে আজ উন্মোচন করতে পেরে আমি যে, কি সুখ অনুভব করছি তা আপনাকে বলে বোঝানোর নয়। আমার আনন্দের আবেগের আপনিও একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী এই কথা মনে করতে পুলক লাগছে।"

এই পর্যন্ত পড়ে অশ্বপতি থামল। মুখ কান তার ভীষণ তেতে উঠল। আগুন ঝাঁ ঝাঁ করছিল সারা শরীর। রগের দুপাশ যন্ত্রণায় টাটাচ্ছিল। একটা তীক্ষ্ন সন্দেহে ভ্রূকুটিদৃষ্টিতে কুটিল হয়ে উঠল মুখের অভিব্যক্তি।

কানের পর্দায় চিঠির কথাগুলো তারস্বরে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের হুল ফোটাতে লাগল। মনে তাঁর ধিক্কার জাগল। অপমানকর প্রশ্ন এবং কৌতূহল মস্তিষ্কের ভেতর কণ্টবিদ্ধ যন্ত্রণায় চকিত চিন্তা ঝিলিক দিল। মুহূর্তে দশরথের চিঠিখানা অর্থময় হয়ে উঠল।

অযোধ্যার সিংহাসনের দাবি ও অধিকার নিয়েই কিছু প্রশ্ন আর কৌতুক করেছে দশরথ। ভরতের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন ইংগিত নেই, তবু তার নিজের মনের ভেতর একটা ক্ষীণ সন্দেহ ছুঁয়ে আছে। অশ্বপতির তাই মনে হল, দশরথ ভুরু কুঁচকে তাকে কটাক্ষ করার জন্যেই যেন চড়া গলায় শোনাল : রাম ইক্ষ্বাকুবংশের যোগ্য উত্তরাধিকার। তার সমকক্ষ নেই। বংশের খ্যাতি এবং সুনাম সে বহন করে আনছে। ঘটনার শেষ নয় এখানে। অযোধ্যার সিংহাসনে রামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে যে গোপন ষড়যন্ত্র আর পরিকল্পনা হচ্ছে, গণস্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন এই কথাটা উপলব্ধির জন্যে লিখেছে, "রাম জনগণের হৃদয়ের রাজা।" সিংহাসনের উপর জনগণের দাবি জোরদার করে রামকে সিংহাসনে বসানো নাটকের মহড়া মাত্র। রাম অনেক মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র। সে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী। এবং সে ক্ষমতা তার নিজের অর্জিত। আবার বহুমানুষের বিশ্বাস করে ভালবেসে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নয়ণের জন্যে রামকে তাদের পছন্দ। তাদের সে দাবি ও ইচ্ছার সামান্যতম অপব্যবহার তারা সইবে না। রামের জনপ্রিয়তা

স্মরণ করে দিয়ে দশরথ তাঁকে সংযত থাকার ইংগিত করেছে। পত্রে পুত্রের গর্বে গর্বিত পিতার আবেগকে এমনই মর্মস্পর্শী আর রহস্যময় করে তুলেছে যে তা অশ্বপতির কাছে নিতান্ত ঠাট্টা আর বিদ্রূপের মত মনে হল। আশংকার চমক ও জিজ্ঞাসা যুগপৎ তাঁকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করল। দশরথের সুখানুভূতি, গর্বিত হাসি ও কটাক্ষের মধ্যে এক আসন্ন সর্বনাশা নাটকের দৃশ্য প্রস্তুতি দেখতে পেল। চিঠিখানা তাঁর মুখোমুখি হযে ভয়কে আরো বাড়িয়ে তুলল। তথাপি, চিঠির চুম্বক আকর্ষণ প্রবল বেগে তাঁর মনকে টানতে লাগল। নিশি পাওয়ার মত এক সম্মোহিত আচ্ছন্নতা তাঁকে পত্রে মনোনিবেশ করল।

"এক এক করে কত কথা মনে হয়। স্মৃতিভারাক্রান্ত মনের সেই বিচিত্র সংলাপ ভাল লাগবে কি? রাম ও ভরতকে আপনার কন্যা কৈকেয়ী কখনও আলাদা করে দেখেনি। রামও নিজের গর্ভধারিণী অপেক্ষা তার ছোটমাকে অধিক সমাদর ও শ্রদ্ধা করে। কৈকেয়ীর স্নেহনীড়ে সে প্রতিপালিত। ভরত ও রাম বলতে অজ্ঞান। তারা একমন একপ্রাণ। তবু দূরবর্তী থাকার জন্যে রামের সব কথা ভরত জানে না। ভ্রাতৃবৎসল রামের সাফল্য এবং কৃতিত্বের খবর ভরতকে প্রীত করবে জেনেই ন'বছর আগের বৃত্তান্ত থেকে শুরু করছি। যার জীবনটাই একটা গল্প, তাকে নিয়ে এই বৃত্তান্ত রচনা করা কোন কঠিন কাজ নয়।"

চিঠির মগ্নতা থেকে অশ্বপতি মুখ তুলল। সদ্য ঘুমভাঙা চমকের মত কয়েকটা বিস্মিত জিজ্ঞাসা চকিতে তাঁর মনে ঝিলিক দিল। ভুরু কুঁচকে অবাক স্বরে নিজের মনে উচ্চারণ করলেন ঃ শয়তান!

অশ্বপতির বুকে সহসা বজ্রাঘাত হল। এবং তার এক ঝলকে দিশাহারা হয়ে গেলেন। কৈকেয়ী ভরতের সঙ্গে তাঁর রক্ত সম্পর্কের সূত্রে পারিবারিক এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি করল, যাতে সম্পর্কের উল্লেখ থেকে তাঁর মনটা নরম হয়ে রামমুখী হয়ে উঠে। রামের অনুকূলে তাঁর হৃদয় স্রোতকে প্রবাহিত করতে ভরত ও কৈকেয়ীর সঙ্গে রামের মধুর সম্পর্ককে ফলাও করে শোনানো হল তাঁকে। অথচ, রাম সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে পত্রে। কারণ, দশরথ ধরেই নিয়েছে, ভরত ও কৈকেয়ী অযোধ্যার সিংহাসনের উপর তাদের দাবি ত্যাগ করতে পারে কিন্তু তিনি কখনও করবেন না। অযোধ্যা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে প্রকৃত বিরোধ তাঁর ও দশরথের ভেতর। ভরত কৈকেয়ী এই বিরোধের মধ্যবর্তী। তাই তাদের না-দাবির প্রসঙ্গ পত্রে এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যাতে গোটা ব্যাপারটা তার মনের ভেতর ঝিলিক দেয়। মস্তিষ্কের মধ্যে স্থায়ী হয়ে অনবরত জিজ্ঞাসায় যেন অস্থির করে তোলে তাঁকে। দশরথের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বর্তমান অবস্থার সম্পর্ক, এবং তার পরিণতি কি? ভবিষ্যত বা কি? এই আভাসটুকু দিতেই মধুর পারিবারিক সম্পর্ককে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রামের সিংহাসনপ্রাপ্তির এক অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে দশরথের আস্থা ভেতরে ভেতরে অশ্বপতিকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। দশরথ বহুকালের মৌন গম্ভীর বিষণ্ণ যবনিকা ভেঙে দিয়ে যেন এক নতুন যাত্রা সূচনা করল। এই নতুন যাত্রা

কিসের ? কোথায় তার গন্তব্য ? কি তার পরিণাম—কিছু জানা নেই ? অথচ পত্রে তার কৌতুকছটায় ঝলকানো, নির্দোষ ঠাট্টা, বিদ্রূপে ভরা, আর রহস্যের আমেজ ধরানো এক আকর্ষণ। অশ্বপতি আবার পত্রপাঠে মনোনিবেশ করল।

"রামের বয়স তখন ষোল। প্রদীপ্ত তারুণ্যের কী অপূর্ব মূর্তি! আয়ত বিশাল নীল দুই চোখে কী আশ্চর্য মায়া জড়ানো! সর্ব দেহে তার শষ্যক্ষেতের লাবণ্য। সে রূপের রঙ নেই, রেখা নেই, সে রূপ অঞ্জনহীন অতুল। চোখে সে লাবণ্য কেউ কখনও দেখেনি। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। তবু প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে আমাকে নির্দয় নিষ্ঠুর হতে হবে। কিন্তু স্নেহবশতঃ রাম লক্ষ্মনকে ঘোর অরণ্যে নির্বাসন পাঠাতে ক্রমাগত বিলম্ব হচ্ছিল। সত্যরক্ষা আর ধর্ম পালনের দ্বন্দ্বে আমার অবস্থা অসহায় অভিসম্পাতের মত। কিন্তু কোন রন্ধ্র দিয়ে নিয়তি আসে তা মানুষের অনুমান করা অসাধ্য। আমার ক্ষেত্রে সেই এল বিশ্বামিত্রের রূপ ধরে। ষোল বয়সের রামকে একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভিক্ষা চাইল। স্বজন হারানোর প্রতিশোধ নিতে তাড়কা ভয়ংকর হয়ে উঠল। অরণ্যে অরণ্যে সে মুনি ঋষিদের বিভীষিকা। তাকে দমনের জন্য রাম-লক্ষ্মণের বাহুবল প্রয়োজন হল। মনের প্রতিক্রিয়া যাই হোক বিশ্বামিত্রের ক্ষ্যাপামির ইন্ধন দিয়ে নিজের সত্যরক্ষার জন্যে রাম-লক্ষ্মণকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলাম। কিন্তু পুত্রদ্বয়কে রাক্ষসের প্রতিহিংসার বলি করে পাঠাতে বুক আমার ভেঙে গেল। পিতা হয়ে পুত্রহন্তা হওয়ার আশংকায় আমার হৃদয় অস্থির হল। আত্মগ্লানিতে মন পুড়তে লাগল। হৃদয় দুঃখ সাগরে পরিণত হল। স্নেহ কি বিষম বস্তু সেদিন অনুভব করলাম। অন্ধমুনির পুত্রশোকের নিদারুণ জ্বালার কষ্ট, তার অভিশাপ আমার আত্মানুশোচনার সঙ্গে মিশে গিয়ে বুকের মধ্যে নিঃশব্দে আর্ত্তনাদ করতে লাগল। কৌশল্যা কৈকেয়ীর ঘৃণা মিশ্রিত জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টির ভাষা আমি স্পষ্ট পড়তে পারছিলাম। তাদের ধিকৃত জিজ্ঞাসা প্রতিবাদের ভাষা কঠোর ও শাণিত হওয়া সত্ত্বেও আমার কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ছিলাম অবিচল। পরিণতি ছিল ভবিষ্যতের অলক্ষ্যে আবৃত। তথাপি এক পরম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম যে, জীবনের অনিবার্যতাকে কখনও কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। দুর্লংঘ নিয়তি তার পাওনা তার নিজের পথে ঠিক আদায় করে নেয়।"

অশ্বপতি চমকে উঠলেন। চোখে তাঁর বিস্ময় নেই। একটা তীক্ষ্ন সন্দেহ ভ্রূকুটি দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হল। রাগে, ক্ষোভে, অশ্বপতির স্বর যেন পিষ্ট দাঁতের পাটি থেকে বেরিয়ে এল। মিথ্যে। সব মিথ্যে। শুধু ছলনা। ভণ্ড! প্রতারক! শঠ!

বিচ্ছিন্ন ঠোঁটের ফাঁকে লাল জিভের অগ্রভাগ তির তির করে কাঁপছিল। স্বাভাবিক উদ্গত নিঃশ্বাস বুকের কাছে রুদ্ধ করে উচ্চারণ করল, হাঁ নিয়তি। নিয়তিই বটে। নিজেকেই তার আক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত বোধ হতে লাগছে। অশ্বপতির দৃষ্টি অচিরাৎ আবার পত্রতে নিবদ্ধ হল।

"রামলক্ষ্মণ চলে যাওয়ার পর বেশকয়েকটা বছর কেটে গেল। তাড়কা বধের কোন

খবর নেই। অকস্মাৎ একদিন অযোধ্যায় সংবাদ এল, বিপুল অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রাম তাড়কাকে আক্রমণ করল। দু'পক্ষের প্রচণ্ড লড়াই হল। কিন্তু রামের বিক্রমের সম্মুখে তাড়কা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে সমর্থ হল না। ঝটিকার মত প্রবলবেগে, ক্ষিপ্র গতিতে রাম তাড়কার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সব কৌশল ব্যর্থ করে দিল। অবশেষে, অসহায়ের মত রামের হাতে প্রাণ দিল। তাড়কা রাক্ষসের পতনে রাক্ষসেরা দিশাহারা হল। রামের সঙ্গে তারা সন্ধি করে শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করল। চতুর্দিকে রামের জয়জয়কার। তবু অযোধ্যায় ফিরল না রাম। অস্ত্র রাজশক্তির উৎস ; এই নীতি জপমন্ত্র করে বিশ্বামিত্রের কাছে আরো অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্যে রয়ে গেল। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বামিত্র রামকে অস্ত্রবিদ্যা এবং রাজনীতি শেখাল। রাজনীতি দেশ শাসনের অঙ্গ। দেশ শাসনের গর্ভে জ্বলে ক্ষমতার আগুন, আধিপত্য আর প্রভুত্ব বিস্তারের লেলিহান শিখা, রাজনীতির তাপে দগ্ধ হয় দেশের অগণিত মানুষ। অথচ দেশের এই হাজার হাজার মানুষ শ্রমে, সেবায়, ত্যাগে, সাধনায় রাজ্য ঐশ্বর্যে, সম্পদে সমৃদ্ধশালী হয়। দুর্ভাগ্য তাদের কাউকে আমরা সম্পদ ভাবি না। শাসকেরা নিজের সুখ, আরাম, বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মত্ত। অথচ যাদের দৌলতে এ সব, তাদের কাছে টেনে এনে কখনও সমান আসন দিই না। রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে এমনই জড়িয়ে থাকে সব যে, তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ফাঁক বা ফাঁকি থাকে। শাসনকার্যের মধ্যে তার চেহারা খুঁজে বার করবার অবকাশ কোথায়? বিশ্বামিত্র রামকে সেই ফাঁক আর ফাঁকিটাকে সকলের আগে দেখাতে ও শেখাতে রাজনীতি ও শাসননীতির বাইরে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন। রাজা না হয়েও মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়, কল্যাণ ও উন্নতি করে দেশ সেবা করা যায়। দেশের মানুষকে রামের নেতৃত্বের পতাকাতলে সমান সম্মানে সমবেত করে এক অসীম শক্তিতে সকলের ঊর্ধ্বে তাকে তুলে ধরলেন বিশ্বামিত্র। গত পাঁচবছর ধরে রাম-লক্ষ্মণ সমগ্র আর্যাবর্তে ঘুরে ঘুরে সেই জন সেবামূলক কাজ করে বেড়াল। মিথিলার অদূরে রুক্ষ, কাঁকুরে কঠিন মৃত্তিকায় হল কর্ষণ করে সোনার ফসল ফলিয়ে তাকে নবজন্ম দিল। হল কর্ষণের অনুপযুক্ত ভূমিকে আবাদযোগ্য করার গল্প লোকমুখে অহল্যার শাপ-মুক্তিতে পরিণত হল। নিজের কর্মশক্তি ও সেবায় সোপান বেয়ে বেয়ে সে উপরে উঠল। পথের সব বাধা দূর করে নিজের প্রতিকূল ভাগ্যকে জয় করল।"

অশ্বপতি মনে মনে অস্বস্তিবোধ করল। কূট রাজনীতির খেলায় দশরথ শঠতার সঙ্গে শঠতা করেছে, মিথ্যের জবাব মিথ্যে দিয়েই দিয়েছে। ইতিহাস বিচিত্র পন্থায় মানুষের উপর প্রতিশোধ নেয়। দশরথ শত্রুকে তার নিজস্ব অস্ত্র দিয়েই ঘায়েল করছে। রাজনীতির খেলাই এই। বিধাতাও কম রসিক নন। জীবন নদীর এক ঘাট পূর্ণ করতে অন্য ঘাটকে নিঃশেষে একেবারে শূন্য করে ফেলেন। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেন। কিন্তু জমা খরচের হিসাব মিলিয়ে তৃপ্ত হবার সময় এখন তাদের কারোর হয়নি। তুরুপের তাস তাঁরই হাতে। তবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে উৎসাহ পাচ্ছেন না, কেন? একটা অজ্ঞাত ভয়ের আশংকায় কেন

দ্বিধাগ্রস্থ তিনি ? পাঞ্জা লড়াইয়ের কাজটা এত অল্পেতে শেষ হয় কখনও ? অশ্বপতি পুনর্বার পত্রপাঠে মনসংযোগ করল।

রামের বিক্রম দেখাতে বিশ্বামিত্র তাকে নিয়ে মিথিলাধিপতি জনক সীরধ্বজের মহাযজ্ঞ ভূমিতে উপস্থিত হলেন। সীরধ্বজ তাঁর নিজের নামের অর্থের সঙ্গে মিল রেখে কন্যার নামকরণ করলেন সীতা। রূপবতী কন্যা সীতাকে বীর্যশুল্কা করার জন্যে এক অদ্ভুত লৌহমঞ্জুষা নির্মাণ করেছিলেন। লৌহশকটে রক্ষিত দেবতার নামে উৎসর্গকৃত এই হরধনু উত্তোলন করে যে এতে গুণ পরাতে সক্ষম হবে তার হাতেই সীতাকে সমর্পণ করবেন। সীতার রূপসৌরভ বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানতে পারল সীতা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের রাজপুত্রেরা সীতাকে পেতে মিথিলায় ছুটে এল রাজবেশে, যোদ্ধবেশে। কোন বীর বাদ রইল না। কিন্তু কারো সাধ্যে কুলাললনা সে ধনুক নড়ায়। ম্লান মুখে সব বীর ফিরে গেল। কিন্তু যে কাজ পৃথিবীর বড় বীরেরা করতে পারল না, সে কাজ রাম অনায়াসে করল। নিমেষে ধনুতে গুণ পরাল। রাম শ্রেষ্ঠ বীর বলে সম্মানিত হল। চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য রব উঠল। পঁচিশ বছরের যুবক রামের কণ্ঠে অষ্টাদশী জনক কন্যা সীতা বরমাল্য পরিয়ে দিয়ে বরণ করল তাকে।

রাম লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নর অভিন্ন ভ্রাতৃপ্রেমকে এক সূত্রে গেঁথে রাখার জন্যে জনক পরিবারের চার কন্যার সঙ্গে তাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করেছি। সীরধ্বজের দুই কন্যা। জেষ্ঠা কন্যার নাম সীতা। কনিষ্ঠা হল ঊর্মিলা। ইতিমধ্যে পরম রূপবতী সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বীর্যশুল্কা সীতা রামকে পতিত্বে বরণ করেছে। কনিষ্ঠা ঊর্মিলার জন্যে সীরধ্বজ ধনুর্বাণে অজেয় লক্ষ্মণকে জামাতা রূপে নির্বাচন করেছেন। এখন বাকী শুধু ভরত ও শত্রুঘ্ন। মানে মর্যাদায় জনক পরিবার ইক্ষ্বাকুবংশের সমতুল। অযোধ্যার রাজপরিবারে উপযুক্ত বধূ হওয়ার যোগ্য তারা। পুত্রদের অভিন্ন ভ্রাতৃত্ববোধ যাতে অটুট থাকে সেজন্য সীরধ্বজের কনিষ্ঠভ্রাতা সাংকাশ্যার অধিপতি কুশধ্বজের দুই পরমা সুন্দরী কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে আমার নয়নমণি ভরত শত্রুঘ্নের জন্যে প্রার্থনা করেছি। সাংকাশ্যারাজ সানন্দে সম্মতি দানে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আগামী উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে চারভ্রাতার একসঙ্গে যুগলমিলন সম্পন্ন করব। আপনি আত্মীয় স্বজন সপারিষদ সহ ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে অবশ্যই মিথিলায় পদার্পণ করুন। মিথিলা এবং অযোধ্যায় যুগ্মভাবে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

অশ্বপতির বুক থেকে অস্ফুট শব্দ করে একটা গভীর শ্বাস নামল। নিজের আরাম যন্ত্রণায় গভীরে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দে আর্তনাদ করছিলেন। তবে বোবা শব্দ। ভাষা ছিল না তাতে। আরাম কেদারার উপর আধশোয়া হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ তার চোখের তারায় স্থির। নীল উজ্জ্বল আকাশের গায়ে মাথা তুলে স্পর্ধিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল পাম গাছের সারি। সেদিকে আনমনে চেয়ে রইলো অশ্বপতি। আর একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার ভেতর

ডুবে গিয়ে অশ্বপতি নিজের মনে ভাবছিলেন। রাম শ্রেষ্ঠ বীর। লক্ষ্মণ ধনুর্বাণে অজেয়। তাদের নিয়ে লোকের গল্প আর গর্ব। দীর্ঘ চিঠিতে দশরথের এসব কথা উল্লেখের অর্থ কি? সে কি চায় বলতে? তার মতলবই-বা কি? আভাসে ইঙ্গিতে দশরথ তাঁকে বোঝাল যে, রাম নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত। অযোধ্যায় সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারিত্ব চিহ্নিত হয়ে গেছে। আর কারো দাবি সেখানে গ্রাহ্য হতে পারে না। দশরথের প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতিও তুচ্ছ। জনগণ তারা রক্ষাকাবচ। জনতাও সুসংবদ্ধ। রাম নামে অজ্ঞান তারা। গনদাবি, জনস্বার্থ, বিপন্ন হলে রাম নিজেই অস্ত্র ধরবে। তার মত বীর শ্রেষ্ঠের সম্মুখীন হওয়া বুদ্ধির কাজ নয়। তাই রামের শৌর্য, বীর্য বিক্রমের গুণগান করে তাঁর আচরণ এবং প্রতিক্রিয়াকে সংযত করতে বলার এক কুট প্রস্তাব এ পত্র। রামের ভীতির বীজ মনের গভীরে পুঁতে দিয়ে অযোধ্যায় সিংহাসনের ভরতের উত্তরাধিকারিত্ব থেকে রামের উত্তরাধিকারিত্বের অনুকুলে পেঁছিতে চাইছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে কত হাস্যজনক দশরথ নিজেও তা জানে ভাল করে। ফাঁকা আওয়াজ করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা তার। নিজের ভেতর যথেষ্ট শক্তি ও অবস্থার যখন অভাব হয় তখন প্রতিপক্ষের অন্তরে ভয় জাগাতে চীৎকার চেঁচামেচি আস্ফালন, হুঙ্কার করা হল জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। বীর্যহীন আস্ফালন জীবের আত্মরক্ষার সাময়িক টোটকা। পরিত্রাণ লাভের কৌশল। অসহায় দশরথও নিজের অজান্তে জীবধর্ম পালন করেছে মাত্র। নিজের দুর্বলতা গোপন করতেই ছোট্ট একটুকরো চিঠি বাগাড়ম্বর করে আকারণ দীর্ঘ করেছে। এ হল তার নিজের সঙ্গে ছলনা! সুতরাং এতে উৎকণ্ঠা বা ভয়ের কিছু নেই বলে মনে হল অশ্বপতির।

অমনি বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল অশ্বপতির। মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। গভীর এক প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তাঁব চেতনা। অস্ফুটস্বরে নিজের মনে উচ্চারণ করল ঃ দশরথ তুমি এখনো বালক। প্রতিশ্রুতির শিকড় তোমার মনের মাটিতে গেড়ে বসেছে। তোমার সাধ্য নেই তাকে উপড়ে ফেল। প্রতিশ্রুতির কথা যতদিন মনে থাকবে ততদিন তোমার সঙ্গে তোমার লড়াইও শেষ হবে না। সমস্ত রকমের বিরুদ্ধতাকে তুমি জয় করছ, সমস্ত প্রতিকুলতাকে নিজের অনুকুলে ঘুরিয়ে নিয়েছ তবু অবচেতনে আমার ছায়া তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি শান্তি পাচ্ছ না। তুমি অপ্রকৃতিস্থ অস্থির। তোমার দুর্বলতার রন্ধ্রপথ আমি দেখে ফেলেছি। বিজয়লক্ষী আমার হাতেই বন্দী। ঠিক সময়ে ঠিক মত তাকে শুধু ইন্ধন দিতে হবে।

নিজেব আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে ডাকল ঃ প্রতিহারী! প্রতিহারী! যুবরাজ যুধাজিৎকে বল।

ঝুলন বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন অশ্বপতি। নির্মেঘ আকাশ থেকে অপরাহ্নের সূর্যের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। প্রকৃতিলোক শান্ত, স্তব্ধ। অশ্বপতি নির্বিকার-ভাবে উর্ধ্বমুখী আকাশ নিরীক্ষণ করছিলেন। মাথার ভেতর তাঁর এলোমেলো অনেক চিন্তা। সঠিক কোন মূর্তি ছিলনা তার। তবু সব মিলে একটা ভাবনা

মস্তিষ্কের ভেতর ক্রিয়া করছিল। মাঝে মাঝে নিজের হাতের চেটোর দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে কি যেন একটা হিসাব করছিলেন নিজের মনে।

যুধাজিৎ কক্ষে প্রবেশ করে পিতাকে কোথাও দেখতে পেলনা। এদিকে ওদিক করতে করতে ঝুলন বারান্দায় গেল। সেখানে অশ্বপতিকে দেখে হতভম্ভ হল। মুখ দিয়ে সহসা তার কথা বেরোলনা। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে ডাকল ঃ পিতা। আমায় ডেকেছেন ?

অশ্বপতির হেঁট মাথা উচুঁ করল। বিনা ভূমিকায় বলল, হাঁ পুত্র। এখনি ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে মিথিলায় যাত্রা কর। অযোধ্যাপতি তাঁর পুত্রদের বিবাহের পাত্রী স্থির করেছেন। বিবাহের আচার অনুষ্ঠানাদি শেষ হলে বর কনে সহ পুনরায় কেকয়ে ফিরবে। দশরথ শত অনুনয় করলেও অযোধ্যায় যাবে না।

পিতা আপনার আদেশ বড় কঠিন। ভগিনী কৈকেয়ী যদি নবপুত্রবধূ সাক্ষাৎ অভিলাষী হয় তা হলে তাকে বঞ্চিত করব কেমন করে ?

বৎস যুধাজিৎ, রাজনীতি স্নেহ, প্রেম, মমতা, ভালবাসা, কিছু নেই। এ এক জঙ্গলের আইন। অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয়, হিংসা একমাত্র সত্য। হৃদয়াবেগের কোন স্থান রেখ না রাজনীতিতে। অযোধ্যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাজনীতির। তাই, ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে আযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের বাধা অনেক। সে সব জটিল প্রশ্নে তোমার থাকার প্রয়োজন কি ? সেনাপতির কাজ আদেশ পালন করা। প্রশ্নের কোন অধিকার তার নেই।

যুধাজিৎ একবার অসহায়ের মত অশ্বপতির দিকে তাকাল। ভুরু কোঁচকাল। কথা বলতে না পারার অসহায় যন্ত্রণা ফুটল মুখে। বন্ধ ঠোঁটে প্রতিবাদ। কেমন যেন একটা দিশাহারা বোধ করল। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, চলে যেতে উদ্যত হল। অশ্বপতি কি ভেবে দু'পা পুত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে বলল।

শোন পুত্র, দশরথকে বলবে, হরধনু ভাঙলেই বিক্রম প্রকাশ পায় না। রাজা জনক কোন স্বয়ম্বর সভার আহ্বান করেননি। কিংবা সীতাকে জয় করার জন্যে অস্ত্রের পরুষ ঝঞ্জনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। চুপি চুপি কন্যাকে বীর্যশুল্কা করে প্রকৃত বীর ও যোদ্ধাদের বিক্রম প্রকাশের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। বীর্য শুল্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করার জন্যে রাজ্যে রাজ্যে কোন নিমন্ত্রণ করা হয়নি। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের ইচ্ছা করেই সম্মান দেখানো হয়নি। রাজা জনকের ডাকে সম্মানিত মর্যাদাশালী কোন বীর নৃপতি তাই মিথিলায় পদার্পন করেনি। রামের বিক্রম কেউ চোখে দেখেনি। এ অবস্থায় তাকে শ্রেষ্ঠবীর নামে অভিহিত করলেই সে বীরশ্রেষ্ঠ হয়ে যায় না। দশরথের এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারকে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। তোমার ভগ্নীপতিটিকে নির্জনে ডেকে বল হরধনুটির কোন দৈব রহস্য নেই। বীরদের বোকা বানানোর জন্যে চুম্বকে তৈরী। অস্ত্রের ব্যাপারে রামের তীক্ষ্ণ মেধা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজকরে। লৌহ শকটের উপর রক্ষিত হরধনুটি দেখে প্রজ্ঞাবলে রাম তার কারণ নির্ণয় করতে পেরেছিল। ধনু ও শকট দুটিই শক্তিশালী চুম্বকে প্রস্তুত।

বিপরীতমুখী আকর্ষণে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। রাম কৌশলে সমমেরুর বিকর্ষণজনিত বলে লোহশকট থেকে ধনুটিকে বিচ্ছিন্ন করে তাতে গুণ পরিয়েছিল। এতে কোন বাহাদুরি নেই। বলেরও কোন দরকার হয় না।

মুগ্ধ চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে যুধাজিৎ অস্ফুটস্বরে অকস্মাৎ প্রশ্ন করল ঃ পিতা! রাম ভরতের মত আপনারও প্রিয়। তার বীর গর্বের উপর কলঙ্ক লেপন করলে আপনার গৌরব বাড়বে না।

অশ্বপতির দুই চোখে দপ্ করে জ্বলে উঠল। চড়াগলায় প্রশ্ন করলেন ঃ কলংক? কলংক কোথায় দিলাম? কথাটা তুমি ঠিক বলনি। নিজের লোকের ভুল ধরিয়ে দেয়া কর্তব্য। একে কলঙ্ক দেয়া বলে না। রামকে নিয়ে যদিও কথাটা তবু রাম কিন্তু তার লক্ষ্য নয়, দশরথের কপটতার জবাব দিতেই কথাগুলো বলতে হল। দশরথ জানুক তার চাতুরী কপটতার ছদ্মবেশ আমার কাছে গোপন নেই। তা'হলেই তার আত্মবল, মনোবল ভেঙে পড়বে।

যুধাজিৎ সরল চোখের অগাধ বিস্ময় নিয়ে পিতার দিকে তাকিয়ে রইল। কথা খুঁজে পেলনা। চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখ একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। অশ্বপতি তাঁর মত বলে গেলেন কিন্তু কথাটা একজন নিকট আত্মীয়কে ঠিক ঠিক বলা যে কত কঠিন সমস্যা ত যাকে করতে হয় তা সেই জানে। যুধাজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ঃ আমাকে তুমি শুধু নিমিত্তের ভাগী করতে চাইছ। ছোট হয়ে এসবের মধ্যে আমার থাকাটা ভাল দেখায় না। আমি এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকতে চাই না। যুধাজিতের বাক্যে অশ্বপতি চমকে উঠল।

দুই ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন ঃ মানুষে মানুষে কোন স্থায়ী সম্পর্ক নেই। আত্মীয়তা একটা সংস্কার মাত্র। দশরথকে ভগ্নীপতি বলে ভাবলে সে তোমার আত্মীয় কিন্তু যদি তা মনে না কর তাহলে অযোধ্যার রাজা সে। কেকয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

যুধাজিৎ বার দুই ঢোঁক গিলল। তারপর মিন মিন করে বলল ঃ কী করে বলি? তবে, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করব।

পুত্রের অবাধ্যতায় অশ্বপতি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বারান্দার মাথায় দাঁড়িয়ে তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। যুধাজিৎ মাথা নত করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

বেশ সমারোহে দশরথের চার পুত্রের সঙ্গে সীরধ্বজ ও কুশধ্বজের কন্যাদের বিবাহ হল। উৎসবে যোগ দিতে দূর দূরান্ত থেকে ছোট বড় বহু রাজা এলেন। তাঁদের আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি করল না সীরধ্বজ। অতিথি অভ্যাগতদের থাকার জন্য বহু বাসস্থান নির্মিত হল। তাঁদের দাস দাসী ঘোড়া হাতি রথ প্রভৃতি

থাকার জন্যে পৃথক কুঠি নির্মিত হল। রাজপথ জনপথ সব পুষ্পে পতাকায় মাল্যে শোভিত করা হল।

বিবাহ শেষ হওয়ার দু'চারদিন পরে অতিথি অভ্যাগতেরা একে একে যে যার রাজ্যে ফিরে গেল। যুধাজিৎও ভরত ও তার নববধূ মাণ্ডবীকে নিয়ে কেকয়ের অভিমুখে যাত্রা করল।

তাদের যাত্রাপথের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দশরথের বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস নামল।

দশরথের আকস্মিক ভাবান্তর সুমন্ত্রকে আশ্চর্য করল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তারদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। সুমন্ত্রর অপলক চাহনি চুম্বকের মত টানছিল দশরথের দুই চোখ। চোখাচোখি হল। লাজুক অপ্রতিভতায় মৃদু হাসল। সুমন্ত্রের ওষ্ঠ স্ফুরিত হল। বলল : মহারাজ ভরত শত্রুঘ্নকে এভাবে দূরে দূরে সরিয়ে রাখা বোধ হয় আর সমীচিন নয়।

দশরথের ভুরু কোঁচকাল। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে প্রশ্ন করল : অকস্মাৎ তোমার এরূপ মনে হল কেন?

অশ্বপতি চতুর রাজনীতিজ্ঞ। আমাদের গোপন পরিকল্পনা সব যে তাঁর নখদর্পণে কেকয়রাজের মন্ত্রী প্রধান সুবীরের সঙ্গে কথোপকথনে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। অথচ, সেজন্যে তাঁর কোন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নেই। এই চক্রান্তের কোন রাজনৈতিক গুরুত্বও তিনি দিলেন না। সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে তিনি আমাদের প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে গেলেন। তাঁর মনোবল, সাহস, দৃঢ়তা প্রত্যুৎপন্নমতি আমাকে অবাক করল। তুরুপের তাস দিয়ে দান জিতে নেবার অপেক্ষায় আছেন। তাঁর সে আশায় ছাই দিতে দরকার ভরতকে। রাম ভরতের মেলামেশা গভীর ও অবাধ হলে তাদেব মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃপ্রেম জমবে। তাই বলছিলাম, ভরতকে কেকয়রাজ্যে যেতে দিয়ে কাজটা আপনি মোটেই ভাল করেননি।

দশরথের চোখ কপালে উঠল। চিন্তার বলিরেখাগুলি ললাটে গভীর হয়ে ফুটল। কথা বলার সময় দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : ভরত শত্রুঘ্ন আমার ভুলেই পর হয়ে গেছে। বোধ হয় আমার উপরেই তাদের যত রাগ আর অভিমান। অথচ, রাম-লক্ষ্মণের প্রতি তার কি গভীর মমতা আর টান, দেখলে হৃদয় জুড়িয়ে যায়।

তার সরল নিষ্পাপ ভ্রাতৃপ্রেমকে আমাদের লক্ষ্য জয়ে শাণিত অস্ত্র করে তুলতে হলে শীঘ্রই তাকে কেকয় থেকে-ফিরিয়ে আনা ভীষণ দরকার।

তুমি ঠিক বলেছ। যা যা করলে ভাল হয় তার সব ব্যবস্থা কর তুমি। আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমায় তুমি কক্ষে নিয়ে চল।

বিজয় তুর্য উচ্চরবে বেজে উঠল।

মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। পুরনারীদের কণ্ঠে উলুধ্বনির ঝড় উঠল।

উস্মুক্ত ওষ্ঠের ফাঁকে জিভের লাল অগ্রভাগ সাপিণীর জিভের মত লিক লিক করে খেলতে লাগল। আর সমুদ্র কল্লোলের মত এক বিচিত্র শব্দ তরঙ্গ নির্গত হতে লাগল। মত্ত বাতাসের লক্ষ করতালির মত বাজতে লাগল উলু।

বহুদূরে থেকে অগণিত অশ্বারোহীর হাতে বহুবর্ণের নিশানে রাজপথ ঝলমল করছিল। রথ, অশ্ব, গজের শোভাযাত্রা দেখতে বহুলোক রাস্তার দু'পাশে জড় হয়েছিল। ক্রমেই তাদের ভীড় বাড়ছিল। অবস্থা এমন হল যে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সৈনিকেরা হিমশিম হয়ে গেল। রামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রা মন্থরগতিতে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল।

রাজপ্রাসাদের বিশাল চত্বরে অশ্ব, গজ, পদাতিক বাহিনী সব পৃথক পৃথক সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। সুসজ্জিত ও অলংকৃত দুটি বিশালকায় ঐরাবত মাহুত পরিচালিত হয়ে প্রবেশ দ্বারের মুখে দু'দিক থেকে শুন্ডের খিলান তৈরী করে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে দিয়ে একে একে দশরথ, সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের রথ প্রবেশ করল। মুনি, ঋষি এবং পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে স্বস্তিবচন পাঠ করে তাদের আশীর্বাদ করল।

বধূদের নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীর ঘরে প্রবেশ করার আগেই মন্থরা কৈকেয়ীকে বলল ঃ আশ্চর্য মেয়ে তুমি। এখনও নিজের সাজ গোছ নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে যে কি ঘটে যাচ্ছে তা ফিরেও দেখছ না?

মন্থরার কথার মধ্যে কৈকেয়ী মজা পেল। মুখে তার একটা খুশির ভাব লেগেছিল। কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরে কৌতুক প্রকাশ পেল। ভুরু নাচিয়ে মৃদু হেসে বলল ঃ বেশ'ত, আমি না দেখি, তুইত দেখেছিস্ তাতেই হবে। হাঁরে বাইরে শঙ্খ, তূর্য বাজছে, ছেলেরা তবে কি বৌমাদের নিয়ে ফিরল?

মুখ ব্যাজার করে গম্ভীর গলায় বলল ঃ ফিরেছে। তাতে তোমার কি?

কৈকেয়ী হাসতে হাসতে মন্থরার দিকে ঘাড় ফেরাল। বলল ঃ আজ রাগতে নেই। বড় আনন্দের দিন আজ।

আনন্দ না, ছাই।

তোর আজ কি হল কুব্জা? এমন করিস কেন?

তারপর, কৈকেয়ী নিজের কণ্ঠ থেকে একটি রত্নহার খুলে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল ঃ আমার এই মুক্তার মালাটা রাখ। এটা আমার মায়ের ছিল। আজ খুশি হয়ে তোকে দিলাম।

মালায় আমার দরকার নেই। তুমি চোখ থাকতেও অন্ধ। তোমাকে আমি কি করে বোঝাই, মানে রাজা তোমাকে একটুও ভালবাসে না। শুধু তোমার নধর দেহটার প্রতি তার আদর। ওকেই স্বামীর সোহাগ বলে গর্ব কর। তুমি নির্বোধ।

কৈকেয়ীর মুখে সরল হাসি। মন্থরাকে চটানোর জন্য বলল ঃ রাগলে তোকে ভীষণ সুন্দর দেখায়।

ভুরু বাঁকিয়ে রাগত স্বরে মন্থরা তার কৌতুক বন্ধ করার জন্যে বলল ঃ ঢং রাখ। তোমার হিসেবের অঙ্ক বুঝে নাও। রাজবংশে জন্মেছ, রাজার গৃহিণী হয়েছ,

তবু রাজধর্মের ছলনা, প্রতারণা শঠতার কিছু বোঝ না। তোমাকে নিয়ে আমার মুস্কিল।

কৈকেয়ী সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়াল। মন্থরার মুখ শক্ত। চোখে অকস্মাৎ আগুণ জ্বলে উঠল। ভাষা বদলে গেল। গলার স্বরে চাপা গর্জন ফুটল। বলল ঃ তুমি জান না, এক ঘোর বিপদ তোমার পিছনে উল্কার মত ছুটে আসছে। তোমার আতঙ্কিত হওয়ার কথা। কিন্তু তুমি তা না হয়ে, না বুঝে আমার সঙ্গে মজা করছ। তোমার এ কৌতুক কোথা থেকে আসছে? এত আনন্দই বা কার জন্যে? আজ তুমি কি পেয়েছ জান?

মন্থরা কৈকেয়ীর দিকে ঝলকানো চোখে তাকাল। কৈকেয়ী একটু থমকে গেল। বিভ্রান্ত চোখে অসহায়ের মত তার দিকে তাকাল। কৌতুহলের তীব্রতা আর একটা অভিমান বোধের প্রগাঢ়তায় তার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। কারণ, এরকম করে কথা মন্থরা আগে কখনও বলেনি। হঠাৎ, মন্থরার বুকের এ কোন্ আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ? তীক্ষ্ন বিদ্ধ সন্দেহে একটা উদ্গত নিঃশ্বাস বুকের পাঁজরের খাঁচায় আটকে যায়। আর তখনই নিশ্চিত অনুমান করতে পারল প্রচন্ড রাম বিদ্বেষ তার বুকের ভেতর মোমের মত গলে গলে পড়ছে। আর তার তীব্র তাপ স্নায়ুতে স্নায়ুতে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। এই বিরাগ, অসহিষ্ণুতা তার অভিব্যক্তি বলে ভাবল।

কৈকেয়ীর হতচকিত ভাবটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূর হল। অসম্ভব পটুত্বের সঙ্গে দ্রুত নিজেকে সহজ করার শক্তি সংগ্রহ করে বলল ঃ সে আবার কি কথা? আমার আবার হবে কি? কী জানি, আমি তোর কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। তুই এমন হঠাৎ ক্ষেপে উঠলি কেন? কি হয়েছে তোর? কেউ কিছু বলেছে তোকে? তারপর একগাল হেসে বলল ঃ ভরত শত্রুঘ্ন ছাড়া আর সকলে তোর চক্ষুশূল। কিন্তু আমি যে ওদের ছোট মা। আমার কি অন্য চোখে তাদের দেখা উচিত? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা করি, রামেরও তেমনি করি। সপত্নীপুত্রদের নিজের শরীরের মত মনে করি।

অপলক চোখে মন্থরা কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টিতে তার শূণ্যতা। গম্ভীর গলায় বলল ঃ মায়ামোহ ঈশ্বরের দেয়া এক অভিশাপ। সহজে কাটে না। আপন না পেলে পরকে আঁকড়ে ধরে। বেড়াল, কুকুরটাও পর্যন্ত মায়াতে আপন হয়। তোমার আমার অবস্থাও তাই। বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন উথলে ওঠার ভাব হয়।

হাঁ-হাঁ। ঠিক তাই। একেবারে মনের কথা বলেছিস।

সহসা মন্থরা গম্ভীর ভাবে ধমকে উঠল। না। বলিনি। এই মায়াটা স্বপ্নের মত মিথ্যে। মরীচিকার মত বিভ্রান্তিকর। মায়া ও মরীচিকাতে তাই প্রভেদ নেই। এসব মিথ্যে ছলনার পেছনে ঘুরে জীবনকে নষ্ট করার কোন মানে নেই।

কৈকেয়ী অস্বস্তিবোধ করল। প্রসঙ্গটা খুবই লজ্জাজনক। গোটা পরিবারের মর্যাদাহানির ব্যাপার। তাই মুখখানিতে বিমর্ষতার ছায়াপাত ঘটল। বিরক্তিতে

ভুরু কুঁচকে মন্থরার দিকে তাকাল। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা একটা লম্বা নিঃশ্বাসকে চাপা দিতে আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়ল। মন্থরার সঙ্গে কথা বলতে সে একটা শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অনুভব করল। অকারণে লাল হয়ে উঠল তার মুখ। হাঁ-না কিছু বলল না। ধারালো এক ব্যক্তিত্বে মন্থরাকে এমন বিশিষ্ট করে তুলেছিল যে তাকে অমান্য করা কিংবা তার দিকে থেকে চোখের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়া কঠিন হল কৈকেয়ীর। মন্থরার দুই চোখের দৃষ্টি তার সব গণ্ডগোল করে দিল।

নিজের মনেই মন্থরা চিন্তা করল, কৈকেয়ী তাকে সহ্য করতে পারছে না। প্রতিদিনকার দেখা জানা একটা অতিপরিচিত মানুষ বলে কৈকেয়ী অমান্য করতে তাকে লজ্জা পাচ্ছে। অথচ তারও সব কথা খুলে বলার হুকুম নেই। তার সব কাজটা একটা নিয়ম শৃংখলে বাঁধা। গণ্ডীর বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। কেবল কুমন্ত্রণা দিয়ে রামের বিরুদ্ধে কৈকেয়ীর মনটাকে বিষিয়ে তোলা হল তার কাজ। বিয়ের পর থেকে খুব ধীরে সংগোপনে সেই কাজ করে আসছিল। স্নকৌশলে কৈকেয়ীর উপর যখন তা চাপান হচ্ছিল তখন থেকে তার মনে একটা সন্দেহ প্রবলতর হচ্ছিল। তবু অতীতের বন্ধ ছলনার কপাটকে ঘটনার ধাক্কায় খোলেনি অশ্বপতি। সব কিছুকে এক অসাধারণ ছলনায় আবৃত করে আড়াল করে রাখল। সংঘাতকে এড়িয়ে চলাই হল অশ্বপতির রাজনীতির মূল কথা। মুখ্য অস্ত্র ব্যবহার করার আগেও দরকার আছে প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট দুর্বল করে তোলা এবং তার শক্তিকে পঙ্গু করে দেয়া। তাই অশ্বপতি তাঁর কৌশল সম্পর্কে খুব সাবধান।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত কেটে গেল। মৃদু ও মন্থর ঢেউয়ে তার বুক উঠানামা করছিল। আচমকা একটা অনুভূতি তার মস্তিষ্ক ছুঁয়ে গেল। মন্থরা কৈকেয়ীর নিকটতর হল। নিরুত্তর কৈকেয়ীর দিকে স্নিগ্ধ ও স্মিত মুখে কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। কৈকেয়ী নির্বাক, তার কোন প্রতিক্রিয়া বা ভাব বৈলক্ষণ্যও দেখতে পেল না। মন্থরার উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা যুগপৎ বৃদ্ধি পেল। হাতের মুঠোয় কৈকেয়ীর হাতখানা টেনে নিয়ে বলল ঃ তুমি চিরকাল একটু কেমন যেন। সামান্যতে মুখ ভার করে থাক। বাছা তোমার ভালর জন্যে বলা। এখন বুঝতে পারছি তোমাকে সাবধান করা আমার ঘাট হয়েছে। চল সোনা, আমরা বারান্দায় দাঁড়াই। ওখানে দাঁড়ালে সমস্ত অনুষ্ঠানটা দেখতে পাব।

মন্থরার বাক্যে উৎসাহিত হয়ে কৈকেয়ী রাজার প্রকাশ্য দরবারসভার সম্মুখে রাণীদের যেখানে দাঁড়ানো এবং বসার জায়গা সেখানে এসে দাঁড়াল। গোটা স্থানটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

কৈকেয়ী এধার ওধার মাথা ঘুরিয়ে ভরতকে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না তাকে। খুব অবাক লাগল। অযোধ্যাপতির সঙ্গে ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করল না কেন? এরকম উল্টো হওয়ার কারণ নেই। তবু হল। কেন? কৈকেয়ী বেশ হতাশ হল। মুখে চোখে একটা তটস্থ ও সন্ত্রস্ত ভাব ফুটল। নিজের

অজান্তে তার মুখের রঙ মুহুর্মুহু বদলাচ্ছিল। মনের উদ্বেগে সে মন্থরার সামনে রূপান্তর হতে লাগল। দু'চোখের পাতা গভীর ব্যথায় সুনিবিড় হল। থর থর করে কাঁপছিল তার অভ্যন্তর। খুব ভয়ে আর সংকোচে সে মন্থরার দিকে তাকাল। অমনি চোখ ফেটে জল এল। মন্থরার বুকে মাথা রেখে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকল।

কান্না থামলে সে অবাক চোখে মন্থরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কথা বলতে গিয়ে বার কয়েক ঢোক গিলল। তারপর বলল: কুব্জা, ভরতের জন্য মন আমার চঞ্চল হয়েছে। সে কেন শত্রুঘ্নের সঙ্গে ফিরল না? ওরা যে হরিহর আত্মা। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তবু শত্রুঘ্ন ভরতকে ছেড়ে কেমন করে এল?

মন্থরা হাসল। কিছু ভাবল ও। কৈকেয়ীর স্বপ্ন বিশ্বাস ভেঙে খান খান হয়েছে। তার বুকের ভেতর একটা তোলপাড় দেখা দিয়েছে। তার বড় বড় ডাগর দুই চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। মন্থরা বেশ টের পাচ্ছিল, তীব্র একটা জ্বালা তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে বয়ে যাচ্ছিল। মন্থরার চোখে চিন্তার ছায়া পড়ল। নিজের চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে সে চুপ করেছিল। তাকে নির্বিকার এবং স্তব্ধ দেখে কৈকেয়ীর কান্না এল। ধরা গলায় স্তিমিত স্বরে বলল: কুব্জা! কথা বল্, চুপ করে থাকিস না। ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছি। তুই আমাকে মায়ের স্নেহ-মমতা দিয়ে মানুষ করেছিস। আজও আমার জন্যে তোর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। রাগ করে তুইও আমাকে ত্যাগ করবি? তুই যা বলবি, আমি তাই করব।

কৈকেয়ীর কথায় মন্থরা যেন চমকে উঠল। কোথা থেকে হঠাৎ স্নেহ মমতার প্লাবন নামল তার বুকে। সারা শরীরের পেশী যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে, গলে গলে তরল হয়ে মিশে গেল সেই স্রোতে। কৈকেয়ীকে দু'হাতে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরল। মন্থরার বুকের উপর একটা শান্ত নদীর মত পড়ে রইল কৈকেয়ী। পরিতৃপ্ত সুখী মন্থরার কণ্ঠস্বর তীব্র আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল: তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। তবে অবস্থা যে ভাল নয় বুঝছি।

মন্থরার বাহুডোর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কৈকেয়ী প্রশ্ন করল: কিছু শুনেছিস না কি?

না। তবে ঘটনা থেকে তুমি এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, তোমাকে হতাশ এবং দুঃখ দেবার জন্যে একাজ করেছে কেউ।

তুই যা বলেছিস, ঠিক বলেছিস। কিন্তু কাজটা করেছে কে?

কী করে বুঝব?

আমাকে দুঃখ দিতে যে একাজ করল তাকে আমি ছাড়ব না।

মন্থরার ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। চোখেতে কৌতুক ঝিলিক দিল। তারপর একটু গম্ভীর গলায় বলল: তুমি যা বললে তা কখনো করতে পারবে না। তোমার গভীর ভালবাসা আর অগাধ প্রশ্রয়ে তার সাহস কেবল বেড়েই চলেছে। কিছুতে সে মানুষটাকে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে না।

কৈকেয়ী অবাক স্বরে ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঃ তুই তাকে জানিস।

অনুমান করতে পারি কেবল। তুমি তাকে অসম্ভব ভালবাস। অত ভালবাসা াাওয়ার যোগ্যতা তার নেই। তোমার সরলতাকে সে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে মথচ, তার প্রতারণা, ছলনা, বঞ্চনার কিছু জান না তুমি।

কে সে? ধাঁধা রেখে সত্যি কথা বল।

ধাঁধা নয়। সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছি।

ভয়ের কিছু নেই। নিষ্ঠুর হলেও সইতে পারব।

তোমার স্বামীই একাজ করেছে।

কুব্জা! স্বামী আমার ধ্যান জ্ঞান। তাকে জয় করার জন্যে আমি সব উৎসর্গ করেছি। ামীকে একান্ত করে পেতে গিয়ে, তাকে সন্তুষ্ট করতে আমি নিজেকে পুত্রস্নেহ থেকে ঞ্চিত রেখেছি। তুইও জানিস। মহারাজাও আমাতে অনুরাগী, কখনও আমাকে ষ্ট দেয়নি। তবু তুই তার নামে কলংক লেপন করলি। কি কি দোষ সে করেছে মামাকে খুলে বল। অন্য কেউ হলে আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলে গালি দিতাম। কন্তু তোর কথা বলে বিচারের ভার নিজের হাতে না নিয়ে তোর হাতেই তার ্যাখার ভার দিলাম। এত বড় একটা অসম্ভব কথা কেমন করে তুই বললি?

মন্থরার অধরে বিচিত্র হাসি। বলল ঃ এক আর এক যোগ করলে দুই হয়। এ ল অঙ্কের হিসাব। যোগ বিয়োগের সঠিক জ্ঞান থাকলে নির্ভুল উত্তর তুমিও বাপু রতে পারতে। কঠিন কিছু নয়।

কৈকেয়ী মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রিয় ভাষিণী মন্থরার কথা শুনতে লাগল। এক অভিনব জজ্ঞাসার জবাব শুনবার জন্যে উৎকর্ণ হল। বোবা উৎসুক দুটি চোখ মন্থরার চোখের ্পর অপলক স্থির। মন্থরার ওষ্ঠ প্রান্তে বক্রহাসি কুটিল হয়ে ফুটল। আস্তে আস্তে লেল ঃ রাম ভরত আর শত্রুঘ্নের জন্ম একদিনে; ভরত শত্রুঘ্নের চেয়ে বড় সুতরাং াত্রুঘ্ন থেকে রামের ভয় নেই। লক্ষ্মণ রামের চেয়ে ছোট এবং তার অত্যন্ত অনুগত, মতএব সে কোনকালে রামের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না। ভরত এবং রামের ুল্যভাবে সিংহাসনের উপর সমান অধিকার। তাই ভরতকে নিয়ে সমস্যা। সে াম এবং মহারাজার দুশ্চিন্তার কারণ। ভরতকে দশরথ অযোধ্যার সিংহাসনে রামের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই মনে করে। সেজন্য বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ক্ষাত্রতেজে রামকে অসাধারণ তরী করেছেন। ভরত রামকে শৌর্যেবীর্যে অতিক্রম করুক অযোধ্যাপতি এমন চিন্তা খনও করেননি। জনগণের চোখে রামকে শান্তির রক্ষক করে তুলবার জন্যে নহিতকর কাজগুলো তাকে দিয়ে করেছেন। রাম-লক্ষ্মণের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর ন্যে মহারাজ যা যা করেছেন ভরত শত্রুঘ্নের জন্যে তার কিছুই করেননি। পিতার কান্ দায়িত্ব ভবত শত্রুঘ্নের জন্য করেছেন? তুমিও বা জননীর কি কর্তব্য করেছ? ায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই তাদের সরানো হয়েছিল। সেজন্যে াহারাজ অনেক ছল চাতুরি, অভিনয়, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তোমাকে কতবার য বোকা বানাল, তুমিও তা জান।

কৈকেয়ীর মুখে কথা জোগাল না। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মন্থরা একটু উদাসভাবে উপরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর থমথমে মুখে গম্ভীর গলায় বলল : ভাগ্যস ! কেকয়াধিপতি ছিল, তাই ভরত শত্রুঘ্ন অনাদর থেকে রক্ষা পেল। রাজার পুত্রদের উপযুক্ত ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষার সব দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। আর সেজন্যে রাম অপেক্ষা নম্র, শান্ত, বিনয়ী কোমল স্বভাবের ভরতকে অযোধ্যাপতির ভয়। ভরত অযোধ্যায় ফিরলে কোন কারণে রামের সিংহাসনলাভ যদি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তাই মহারাজ কৌশল করে সর্বদা তাকে মাতুলালয়ে রেখেছে। আজও তাই করল। তোমার আনন্দ সুখ এখানে কোন ব্যাপারই নয়। কেকয়রাজা সতর্ক নজর না রাখলে এই পৃথিবী দেখা শেষ হত ভরতের। এখনও সে সম্ভাবনা দূর হয়নি। তোমার পুত্রের অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট আশংকা করে আমি ভয়ে কাঁপছি।

কৈকেয়ী হঠাৎ ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেল। মুখ, যন্ত্রণা মেশানো আবেগে নিবিড় হল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢেউ উঠল বুকে। আর বুক খালি হয়ে যাওয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুখ থেকে উচ্চারিত হল : ইস্ সব আমার ভাগ্য ? বড় কাতর শোনাল কৈকেয়ীর স্বর।

মন্থরা বিষাক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। কৈকেয়ী অনড় এক পুতুলের মত মাথা নিচু করে বসেছিল। মন্থরা দেখল কৈকেয়ীর গণ্ড বেয়ে দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মাটিতে পড়ল। মন্থরার সেই মুহূর্তে করুণায় হৃদয়টা গলে গলে পড়ছিল। ইচ্ছে করছিল বলতে, ওমা কাঁদছিস ! ছেলেমানুষ ! পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। ভিতরে এক তীব্র জ্বালা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট প্রতিশোধ স্পৃহায় শিহরিত হল। মন্থরার বুকভাঙা একটা নিঃশ্বাস পড়ল। তারপর দাঁতে দাঁত চাপল। স্তব্ধতা ভেঙে বলল : ভাগ্য আবার কি ? এত তোমার নিজের তৈরী দুর্ভাগ্য। সেদিন যদি আমার কথা ছিটেফোঁটা শুনতে তা-হলে মানুষ হয়ে যেতে। নিজেকে কাঁদতে হত না। স্বামীকে তুমি অসম্ভব ভালবাস। কিন্তু অত ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই। নইলে বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে ? তোমাকে যদি সে একটু ভালবাসত তা-হলে তোমার সন্তানকে বঞ্চিত করে কখনও তোমাকে অসন্তুষ্ট করত না। তোমায় সে যে ভালবাসে না এটাই বড় প্রমাণ।

কৈকেয়ী অসহায়ের মত মাথা নেড়ে বলল : অত কঠিন হোস্ না কুব্জা। নানা কারণে মন আমার অস্থির অশান্ত। এর মধ্যে তুই যদি ওরকম কঠিন করে বলিস্ তা হলে আমি কোথাই দাঁড়াই বল্ ?

মন্থরা উত্তেজিত ক্রোধে অকস্মাৎ ফেটে পড়ল। ভর্ৎসনা করে বলল : পায়ের তলায় দাঁড়ানোর মাটি তোমার কোথায় ? কৌশল্যার সব দুর্ভাগ্য আজ সৌভাগ্য হয়ে উঠেছে। স্বামীর অবহেলার আড়ালে সে পেয়েছে সত্যিকারের ভালবাসা। স্বামীর প্রেম তাকে করবে সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বরী। রাজ রাজেশ্বরী হয়ে সে পরম আনন্দে ভোগ করবে রাজসুখ। আর তুমি স্বামী সোহাগের গর্ব করে ইন্দ্রিয় পরায়ণ স্বামীর অংকশায়িণী হয়ে ক্রীতদাসের মত দিন যাপনের আত্মগ্লানি ভোগ করবে। কৌশল্যার পদ সেবা করে ধন্য হবে।

মন্থরার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ প্রলয়ংকর এবং উষ্ণ হয়ে উঠল।

কৈকেয়ী এক ঝলক মন্থরার মুখের দিকে তাকাল। একটা তীব্র কষ্ট তার বুকের ভেতর পাকিয়ে উঠছিল অনেকক্ষণ ধরে। মন্থরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ন বাক্যবাণে কৈকেয়ীকে জর্জরিত করে তুলল। দাঁতে দাঁত পিঁষে কৈকেয়ী প্রাণপণে সে কষ্ট সংবরণ করতে লাগল। আর অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মত মাথা নাড়ছিল। অবশেষে কষ্ট দমনে অক্ষম হয়ে আর্তস্বরে তীক্ষ্ন গলায় চিৎকারে ফেটে পড়ল। কান্না জড়ানো বিকৃত গলায় বলল ঃ কুব্জা! চুপ কর। আর পারছি না সইতে। কৈকেয়ীর বুকে তীব্র জ্বালা তার মুখে চোখে ঝলকে উঠল। দু'হাত দিয়ে কান ঢাকল।

তারপর কতদিন হয়ে গেল। তবু কৈকেয়ীর মন থেকে সেদিনের স্মৃতিটা গেল না। ঘটনাটা ভেতরে ভেতরে কতখানি গুরুতর তা বুঝতে একটু সময় লাগল তার। মন্থরার কথাগুলো তার মস্তিষ্কের সকল সীমায় আবদ্ধ হয়ে বদ্ধ কুঠুরির মধ্যে অনবরত পাক খেতে লাগল। আর সেই সব দৃশ্য ও অনুভূতি সকল ভিতরে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তা সবই জীবন্ত চিত্রবৎ হয়ে উঠল তার চোখের পর্দায়। আর কৈকেয়ী মুহূর্মুহূ চমকে উঠছিল নিজের জিজ্ঞাসায়। যন্ত্রণায় অন্যমনস্ক হয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গাছপালা, উদ্যান, সরোবরের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু কৈকেয়ীর চোখে মুখ ভাসে দশরথের।

কৈকেয়ী জানত না কিভাবে পলে পলে অন্ধভাগ্য তাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। নিজের মনের জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক হতে গিয়ে নিজেরই অজান্তে নিজেকে আবিষ্কার করে। শিশুকাল থেকে পিতা ছায়ার মত আছে তার সঙ্গে। জীবনটাকে বড় নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন করে রেখেছে। ঘটনাহীন হয়ে কেটেছে তার জীবন। মেয়েমানুষ এমনিতে নিরাপত্তা খোঁজে। নিরাপদ আর নিশ্চিন্ত আশ্রয় চায়। পেয়েছেও। ফলে চাওয়ার মধ্যে কোন মতলব বা অভিসন্ধি ছিল না। নিজের ভাললাগা, মন্দলাগা, পছন্দ-অপছন্দ, দ্বেষ-বিদ্বেষ, ঈর্ষা-ঘৃণা, রাগ-গর্ব, অহংকার অসহিষ্ণুতা সব নিয়ে সে এক অদ্ভুত খেয়ালী আর জেদী মেয়ে। যখন যা চেয়েছে তখন তা না হলে অনর্থ করে ছাড়ত। কিন্তু পেয়ে কখনও চেয়ে দেখেনি। কি থাকল আর কি হারাল তার হিসাবও করেনি। যোগ-বিয়োগের এই অঙ্কটা সে শেখেনি কখনও করতে। সেজন্যেই পিতার দুর্ভাবনা ছিল তাকে নিয়ে। বিয়ের পরেও তাকে আগলানোর জন্যে আর নিরাপদ সীমানায় থাকার জন্যে মন্থরাকে মন্ত্রণা দানের জন্যে সঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু মন্থরা তার ভেতর ঘুমন্ত খেয়ালী জেদী শিশুর ঘুম ভাঙানোর জন্যে কত বলেছিল, নিজে যদি নিজেকে রক্ষা করতে না শেখে তাহলে কারো সাধ্য নেই বিরাট বিশ্বের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার। স্বামী পুত্র উপলক্ষ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারাও কেউ নয়। সংসারে স্বার্থটাই সব। তবু মন্থরার কোন পরামর্শ সে নেয়নি। আজ নিজেকে দেউল করে দিয়ে যখন তার হিসেবে বসেছে তখন নিজের ও পুত্রদের

নিরাপত্তার কথা ভেবে বিপন্ন বোধ করছে। দেরীতে হলেও মন্থরা তার চোখ খুলে দিয়েছে। প্রতিক্রিয়ার সুরু সেখান থেকে। নিজের ভেতর অন্যসত্তাকে আবিষ্কার করার এক অনুভূতি তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। রাম-ভরত, লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন, দশরথ ও কৌশল্যা সকলকে নতুন দৃষ্টিতে দেখল। কিন্তু পুরোন চোখ আর মন সব গণ্ড-গোল করে দিচ্ছিল। ভিতরে খুব গভীরে বহুকালের বিশ্বাস ভাঙার একটা প্রতিক্রিয়া চলছিল। আর তাতেই সে ভিতরে ভিতরে সে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তার অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দে ঘরখানা ভরে উঠেছিল। এত বিষণ্ণ শব্দ আগে কখনো শোনেনি সে। তার অভিজ্ঞতাতেও ছিল না।

কৈকেয়ী বেশ বুঝতে পাচ্ছিল যে জায়গাটিতে সে দাঁড়িয়ে আছে তার মাটি খুব শক্ত নয়। পায়ের নীচে মৃদু ভূমিকম্পনের স্পন্দন অনুভব করল। আসলে এটা যে কোন ভূমিকম্প নয় তাও সে জানে। বুকের ভিতরে এক অপ্রতিরোধ্য দুর্বলতা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। সারা শরীর থর থর করে কাঁপছিল। আর তাতেই ঐরকম মনে হচ্ছিল।

নিজেকে নিয়ে বরাবর তার অংহকার ছিল। কিন্তু সে যে নির্বোধের মূর্খতা তা জানত না। পুত্রদের বিবাহের পরেই অকস্মাৎ মোহভঙ্গ ঘটল তার। সেদিনই প্রথম জানল, মানুষ নিজের কাছেই নিজে সব চেয়ে অনাবিস্কৃত। একটা চমকানো ব্যথায় তার বুকের ভেতর টন টন করছিল। রহস্যের সুমুখে একটি গভীর জিজ্ঞাসায় তার ভুরু টান টান হল। অপলক দৃষ্টি নীল আকাশের বুকে স্থির। ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর অস্ফুট স্বরে নিজেকে প্রশ্ন করল ঃ বুদ্ধি কি? বুদ্ধির পশ্চাতে কি থাকে? সকলের বুদ্ধি সমান হয় না কেন? বুদ্ধি বলে নিজের ভবিষ্যতকে কেন বুঝে নিতে পারল না? ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে বুদ্ধি সাহায্য করল না কেন? এর জন্য কে দায়ী? সে নিজে? না, তার অদৃষ্ট? অদৃষ্টকে চোখে দেখা যায় না। কল্পনায় অনুভব করা যায় না তার পরিণাম। তার সঙ্গে সংগ্রাম করবে কি দিয়ে? সেই অদৃশ্য ভয়ংকরের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন কৌশল আছে কি? অতলান্ত বুকের গভীর তল থেকে তার উত্তর এল—বুদ্ধি। বুদ্ধি মানুষকে ভাগ্যের আক্রমণের সংকেত দেয়। কিন্তু ভাগ্যের সেরকম কোন মহত্ব নেই। সংকেত না দিয়ে শিকারের অজান্তে আচমকা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বৃদ্ধি সেই অদৃশ্যের চক্রান্তের সংবাদ তার গোপন মনে আগেই পেঁছে দিয়ে তাকে আগাম সতর্ক সাবধান করে। কিন্তু সকলে সে সংকেতের অর্থ বোঝে না। জেগে ঘুমোয় বলে দুঃখ পায় তারা।

কৈকেয়ীর নিজেকে তাই দুর্ভাগা মনে হয়। কোন সংকেত না দিয়ে পুত্রদের দ্বিরাগমনে সে প্রথম জানতে পারল অদৃশ্য চক্রের হাতে বন্দী এক পুতুল। ভরতের দুঃসহশূন্যতা উৎসবের আলো নিভিয়ে দিয়েছিল তার দুই চোখে। ধূপ, দীপ, ফুলের গন্ধ বায়ুর মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। চারপাশের সবাইকে মনে হচ্ছিল কতগুলো ছায়া ছায়া হিংস্র শবভুক নেকড়ে। উল্লাসে তাদের চোখ জ্বলছিল, মুখব্যাদন হয়েছিল হাসিতে।

নিজের জিজ্ঞাসায় অন্যমনস্ক হয়ে কৈকেয়ী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে গাছ-পালা, উদ্যান, সরোবর, প্রাসাদের অন্যান্য অংশগুলো দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু সে সব দৃশ্যবস্তুর উপর তার চোখ ছিল না। উদাস অন্যমনস্ক আয়ত কালো চোখের তারায় ভরতের মুখ কোথা থেকে ভেসে উঠল। আর অমনি উপছে পড়া কান্নায় তার দুই চোখ বেয়ে অজস্র জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

একা একা অনেকক্ষণ কাঁদল কৈকেয়ী। একটা নিবিড় যাতনা মেশানো আবেগে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছিল। তারপর এক সময় কেঁদে কেঁদে শান্ত হল। তার নির্বাক পাষাণমূর্তি, শূন্য অপলক চোখ, চিন্তাশূন্য মস্তিষ্ক কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে তখনো আহত আক্ষেপে ছটফট করছিল। ভাঁটার ঢলের ঢেউয়ে কলকল ছলছল শব্দে সে কথা মনের মধ্যে এক দুর্বোধ্য ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছিল। নদীর মত সেও সেই অশ্রুত বিলাপের এক নিঃসঙ্গ শ্রোতা।

দরজার বাইরে মানুষের জোরা পায়ের শব্দ। দরজার কাছে এসে সে শব্দ থেমে গেল। দেয়ালের গায়ে দুটি ছায়া নড়ে উঠল। কিন্তু কৈকেয়ীর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। সে নির্বিকার, নিস্তব্ধ। এমন কি ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দেখার ইচ্ছাও জাগল না। সম্মোহিত আত্মসমাহিতের মত জানালার গরাদ ধরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভরত মাণ্ডবীকে নিয়ে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু চোখে জননীর দিকে তাকিয়েছিল। চমকানো বিস্ময়ে টনটন করছিল তার বুকের ভেতর : কয়েকমুহূর্ত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কৈকেয়ীকে দেখল, তারপর পা টিপে টিপে কৈকেয়ীর দিকে এগোল। থম থমে স্তব্ধতার ভেতরে এক তীব্র উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা। বিস্ময়কর উত্তেজনায় ভুরু টান টান হল।

কৈকেয়ী বুঝতে পারল ভরত তার গায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে। নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাগে এবং একটা গন্ধ যা একান্ত ভরতের। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের ধক ধক শব্দ এবং নিঃশ্বাসের উত্থান পতনের শব্দের সংমিশ্রণে এক অতিস্তিমিত গুরু গুরু শব্দের অস্পষ্ট কল্লোল সে শুনতে পেল। পেছন থেকে ভরত নীচু গম্ভীর উদ্বিগ্ন অস্ফুট স্বরে ডাকল : মা !

কৈকেয়ীর জননীর হৃদয় কেঁপে উঠল। অমনি স্নেহ যেন বেগবান জলপ্রপাতের মত পাহাড়, অরণ্য কাঁপিয়ে অজস্রধারায় ঝড়ে পড়ল বুকের ভেতর। ভরতের আহ্বান যেন তার সমস্ত সত্তার ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দিল। তাকে সহ্য করার জন্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে জানালার গরাদ আঁকড়ে ধরল। আর সেই দুই হাতের স্পর্শের মধ্যে তার সমস্ত শরীর স্পন্দিত হতে লাগল।

কৈকেয়ী নিরুত্তর। ভরতের বুকে অভিমানের সমুদ্র। ঘন নিঃশ্বাসের মধ্যে অস্ফুট উদ্বিগ্নস্বরে ডাকল মা ! আমি তোমার ভরত। দ্যাখ, কে এসেছে ?

ভরতের অস্ফুট কেঁপে যাওয়া গলার স্বর কৈকেয়ীকে স্থির থাকতে দিল না। আস্তে আস্তে মুখ ফেরাল তার দিকে। চোখের কোণে বড় বড় জলের ফোঁটা চিকচিক

করছিল। থির থির করে ঠোঁট কাঁপছিল। অস্থিরভাবে একবার ভরতের দিকে আর একবার মাণ্ডবীর দিকে তাকাল। কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। মুখ রাঙা হয়ে গেল।

মাণ্ডবী মাথা হেঁট করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তৃপ্তিতে, আনন্দে, সুখে, স্বস্তিতে ভরে গেল তার বুক। দু'হাতে মাণ্ডবীকে কাছে টানল। অমনি বুকের মধ্যে অভিমানের তুফান উঠল। রুদ্ধ স্বরে ঢোক গিলে ভরতকে উদ্দেশ্য করে বলল: এতকাল আমায় ভুলে থাকতে তোর একটুও কষ্ট হল না বাবা? কত আশা নিয়ে তোর পথচেয়ে তাকিয়ে আছি! হত ভাগ্য দুঃখিনী মায়ের পথ তাকানোই শুধু সার হল। সারা জীবনটা আমার একভাবে কাটল। স্নেহের সাগর আমায় শুকিয়ে গেল। ভরতের মুখ বিবর্ণ হল। জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পেল না।

কৈকেয়ী চোখের জল মুছে, থমথমে মুখে মাণ্ডবীর দিকে তাকাল। তারপর তাকে নিয়ে পালঙ্কে বসাল। নিজেও বসল তার গা ঘেঁসে। মাণ্ডবীর হাতের হাঙর মুখো কঙ্কন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলল: আমার দুঃখ কষ্টে ছেলের কিছু যায় আসে না। আমি ওকে শুধু পেটে ধরেছি। কিন্তু আমি যে ওর কেউ এটা মনেই করে না। পেটের কাঁটার মত বড় শত্রু আর নেই।

মাণ্ডবী কি বলবে? অসহায়ের মত একবার ভরতের দিকে আর একবার কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। অর্ধস্ফুট স্বরে বলল: আমি করব কি? তোমার ছেলেই আমাকে আনেনি। দোষটাত তার।

ভরত একটু দ্বিধায় পড়ল। মলিন লাগল তার মুখ। কিন্তু চোখেতে একটু অনুগত ভাব। দোমনা করে ভুরু কুঁচকে বলল: কি করব বল? আমার হয়েছে সমস্যা। তোমাকে খুশি করতে গেলে দাদামশাই অসন্তুষ্ট হয়। আবার তার আকাংখা পূরণ করলে তুমি বঞ্চিত হও। এই সমস্যা এড়ানোর জন্যে মহামন্ত্রী বশিষ্ঠের পরামর্শে শত্রুঘ্ন তোমার কাছে এল, আমি গেলাম কেকয়ে। এটা আমার কর্তব্য। জন্মাবধি কেকয়ে আছি। দাদামশাই আমাদের সব। তার টানটা মায়ের চেয়ে কম নয়।

কৈকেয়ী চমকাল না। ছেলেদের এই মনোভাবের কথা সে ভাল করেই জানে। তার নিজেরও একথা মনে হয়। পিতৃ স্নেহ কি, ভরত শত্রুঘ্ন তা জানে না। এক-জায়গায় থাকলে ভাইয়ে ভাইয়ে মন কষাকষি যদি বাড়ে সেজন্য দশরথ একটা বিভেদ নীতি মেনে চলেছে সব সময়। ফলে রেষারেষি বাড়েনি। দশরথ জানে। মন কষাকষি মানুষকে খণ্ডিত করে দেয়, ছোট করে দেয়। দশরথের এই মতলবের কথা মনে হতে সে একটু আনমনা আর উদাস হয়ে গেল। কয়েক পলক মুগ্ধ চোখে ভরতের দিকে তাকিয়ে রইল। বুক থেকে একটা লম্বা শ্বাস পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে ভরতকে বলল: কিন্তু আমার অপরাধ কি, তা আজও জানি না। রাম লক্ষ্মণ পিতৃগৃহে থাকল, আর তোদের চিরকাল মাতুলালয়ে কাটল—এই রহস্যের কোন কুল কিনারা খুঁজে পাই না। জননী হয়ে আমি সন্তানদের কেন কাছে পেলাম না? কেন আমার স্নেহসত্তাকে তিল তিল করে হত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হল? আমার পুত্রদের

একসঙ্গে মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করা হল কেন ? আমাদের মা-ছেলের এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ব্যথার দিকে কেউ কখনো ফিরেও তাকাল না। আমরা অযোধ্যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলাম ! যে লোকটা আমাদের আদরের নামে অবহেলা করল, আমাদের সুখ দুঃখ মনোবেদনার দিকে তাকাল না—তার সে আকাংখা আমি একেবারে শেষ করে দিতে চাই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, আমার পুত্রেরা যে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। মায়ের কোন্ অধিকার আর দাবি নিয়ে তাদের কাছে আমি দাঁড়াব ? আমার কি আছে ? বলতে বলতে কৈকেয়ী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

দেখতে দেখতে বারো বছর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নানারকম ঘটনা বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। কোথা দিয়ে কিভাবে কাটল তার কোন হদিস্ খুঁজে পেল না দশরথ।

অযোধ্যা এখন চাঁদের হাট। চারপুত্র এবং বধূদের নিয়ে দশরথের এখন সুখের সংসার। কোন দুশ্চিন্তা নেই দশরথের। রাজধানীতে রাম-লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্ন'র ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃভক্তি, বিক্রম নিয়ে নানারকম রসালো গল্প শোনা যায় সবার মুখে। এক অনাবিল, সুখ, শান্তি আনন্দ আর আমোদের ভেতর অতীত হারিয়ে গেল। পেছনের দিনগুলোর কথা মনে করতেও ইচ্ছা করল না। নিশ্চিন্ত অবকাশের মুহূর্তে কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কতা তাকে বর্তমান ঘটনার আড়ালে টেনে এনে যেন মনের জানলায় বসিয়ে তার নিভৃত আলাপ সুরু করল। এ যেন নিজের মনের সঙ্গে নিজের কথা। সে কথার মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজের অজান্তে ভাবত ; স্নেহ-মোহে আচ্ছন্ন দৃষ্টি হয়ত ঠিক জিনিসটা ঠিকমত বুঝতে পারছে না। ভেতরটা তার যেন দিন দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে, জীর্ণ হয়ে পড়ছে, একটা দুঃসহ ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর নুয়ে পড়ছে এটা বেশ বুঝতে পারে। এমনি করেই একদিন জীবনের স্পন্দন হঠাৎ থেমে যাবে। সেদিন আসবার আগে সিংহাসনের একটা সুব্যবস্থা করে যেতে হবে তাকে। পুত্রদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব এমন সুবিন্যস্ত করতে হবে, যাতে সবাই নিজের স্বাধীন বিচার বুদ্ধিতে কাজ করতে পারে। পরস্পরের কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে পারে ! এরকম একটা ঘোর লাগা চিন্তার আচ্ছন্নতার ভেতর কেকয়রাজের মুখখানা পলকের জন্য তার চোখের উপর ভেসে উঠল। কিন্তু স্থায়ী হল না। কোন দুশ্চিন্তা কিংবা প্রতিক্রিয়াও জাগল না।

সিংহাসন নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনা দুই শান্ত বর্তমানে। ক্ষমতাকে নিজের হাতে বেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজকে কেবল দীর্ঘায়িত করে রেখেছে। এর ফলে উত্তাপ উত্তেজনা দুইই হ্রাস পেয়েছে। কারণ, তার জীবদ্দশাতে সিংহাসনের উপর কারো দাবি নেই। তাই উত্তরাধিকার নির্বাচনের কাজটা ক্রমাগত বিলম্ব করে গোটা ব্যাপারটাকে একরকম চাপা দেয়া হল। তাতে উত্তেজনার আগুন নিভল।

তারপর, ভরত শত্রুঘ্নকে নিয়ে যে নোংরা রাজনীতি প্রাসাদে চলছিল তা বন্ধ করার জন্যে কেকয় থেকে তাদের অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনা হল। খুব কৌশলে, কোনরকম রাজনৈতিক মূল্য না দিয়ে অবস্থা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে আনতে পারল দশরথ। সাফল্যের গৌরবতৃপ্তিতে মন তার ভরে উঠল।

এখন চারপুত্রের মেলামেশা গভীর, অবাধ ও অন্তরঙ্গ। পুত্রদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ মুক্ত স্বর্গীয় ভ্রাতৃপ্রেম দশরথকে নিশ্চিন্ত এবং সুখী করল। এরকম যে কখনও হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি দশরথ। ভাগ্যই তার অনুকূলে সমস্ত ঘটনাস্রোত ঘুরিয়ে দিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই বারোটা বছরের মত এমন সুখ আর শান্তি তার জীবনে আগে কখনো আসেনি। কিন্তু সেইটাইতো সব নয়। এখন সবচেয়ে বড় কাজটাই তার বাকী রয়ে গেছে।

সাঁইত্রিশ বছরে পদার্পণ করল রাম। অথচ এখনও অভিষেক হল না তার। ভরতের কথা চিন্তা করে কাজটা আটকে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে আর কোন ব্যাপার নয়। তাছাড়া, প্রাসাদের অভ্যন্তরে যে বিভেদ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস জমে উঠেছিল দীর্ঘকাল ধরে বারো বছরে তার উৎস শুকিয়ে যাওয়ার কথা। কতকাল বা একটা ইচ্ছাকে পোষণ করা যায়? অপূর্ণ আকাংখ্যার গণ্ডীতে মানুষ বন্ধ থাকতে পারে কতদিন? দোটানার কষ্ট, প্রতীক্ষার ধৈর্য, শৃংখলার সংযম, অতৃপ্তির হা-হুতাশ-এ বাধ্য হয়, পাগল ইচ্ছাকে জোর করে চাপা দিতে।

বারোটা বছর যে সব কিছু বদলে দিল দশরথ তা স্পষ্ট অনুভব করল। সময়টা এখন সব দিক দিয়ে তার শুভ। ভাগ্য এবার তাকে কিছু করতে বলার সংকেত দিল। জীবনের মোড় ফেরানোর এই ইংগিত কয়েকদিন ধরে বুকের গভীরে অনুভব করতে লাগল দশরথ। মনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য দশরথ মন্ত্রণাসভা ডাকল। দূরদর্শী রাজনৈতিক মন্ত্রণাদাতা, সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, ধৌম্য, কাশ্যপ, গৌতম প্রমুখদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে সভা বসল।

ভারি মন নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করল দশরথ। রাজকীয় সৌজন্য আর শিষ্টাচার প্রকাশ করে জলদগম্ভীর স্বরে বলল: আপনারা জানেন, বহুবর্ষ ধরে আমি পুত্রতুল্য যত্নে প্রতিপালন করেছি আমাদের অযোধ্যাকে। এখন আমি বৃদ্ধ। কর্মে অশক্ত। রাজকার্য-পরিচালনায় পূর্বের উৎসাহ ও উদ্যম অনুভব করিনা। দেহে আমার বার্ধক্যের ক্লান্তি ও অবসন্নতা। সর্বদিক ঠিকমত নজর রাখা কিংবা কোন গুরুতর সমস্যার কথা সর্বদা বিস্মৃত হই। এ অবস্থায় শাসনকার্যের মত দায়িত্বপূর্ণ প্রজাহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকা শ্রেয় মনে করছি না। বহুকাল পূর্বেই এই কর্তৃত্ব থেকে আমার অব্যাহতি পাওয়ার কথা। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে সুযোগ হতে বঞ্চিত আছি। বর্তমানে এই পদে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। এখন আপনারা সব দিক বিচার বিবেচনা করে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থির করে দিন। আপনারা আমার বন্ধু, হিতৈষী, শুভাকাংখী এবং এরাজ্যের প্রকৃত পরিচালক। অযোধ্যার স্বার্থ, ইক্ষ্বাকু বংশের প্রাচীন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে আপনারাও কৃত-

সংকল্প। আমার পূর্বপুরুষদের পন্থা অনুসরণ করে অযোধ্যার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে আমায় অবসর দিন। আপনাদের কাছে আমার এটুকুই নিবেদন।

দশরথের কথা শুনে সবাই অবাক হল। এ ওর মুখের দিকে তাকাল। এরকম একটা অদ্ভুত বিষয় আলোচনার জন্যে সভা আহ্বান হতে পারে ভেবে তাঁদের অনেকে বিস্মিত হলেন। এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা কক্ষে বিরাজ করছিল। তাঁদের কৌতূহলী চোখের অগাধ বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে আমাত্যপ্রধান সুমন্ত্র বলল: মহারাজের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সিংহাসন আঁকড়ে থাকার কথা নয়। অনেক আগেই সুযোগ্য পুত্রদের হাতে রাজ্যের ভার অর্পণ করে সুখে কাল কাটানো উচিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই তা হয়নি। আপনারাই তাঁকে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। এখন তিনি অবসর চান। কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী স্থির করার কঠিন সমস্যা সম্বন্ধে আপনারা অবহিত। এখন সিদ্ধান্ত করুন কি করলে ভাল হয়?

সুমন্ত্রের বাক্যকে সকলে সাধুবাদ দিল। প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেল। তাদের ভাবনা কল্পনা উদ্দীপিত করার জন্যে ধৌম্য বলল: মহারাজার পুত্রদের মধ্যে রাম অগ্রজ। সিংহাসন তার প্রাপ্য। বীর্যে সে পুরন্দরের সমান, কূটকৌশল নির্ণয়ে ব্রহ্মার সমকক্ষ সে। এ হেন পুরুষশ্রেষ্ঠকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার সংকল্প যদি সাধু বিবেচিত হয় তাহলে আপনারা অনুমতি করুন।

বশিষ্ঠ বলল: এই প্রস্তাব আমাদের সকলের প্রিয়। তবু, এই প্রস্তাব সমর্থন করার আগে আপনারা ত্রিকাল সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেই বলুন। দেখা গেছে, অনেক জটিল গভীর ব্যাপারে সাধু ও ধার্মিক ব্যক্তিও কার্যকারণ ভুলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভুল করেন। আমরা তিনজনেই মহারাজের শাসনকার্যের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত। নিরপেক্ষ হওয়া আমাদের মুস্কিল। একমাত্র পক্ষপাতহীন মধ্যস্থ ব্যক্তিদের বিচার শ্রেষ্ঠ হয়। এজন্যেই আপনাদের পরামর্শ প্রার্থনা করা। প্রতিপক্ষকে নিষ্ক্রিয় ভাববার কোন কারণ নেই। আড়ালে-আবডালে তারা সক্রিয়। একথা মনে রেখে ধর্মপ্রাণ রাজার ধর্মরক্ষার জন্যে যা করলে ভাল হয় তাই করুন।

বশিষ্ঠের বাক্যে দশরথ চমকাল। দুই চোখে তার অবাক বিস্ময়। বুকের ভেতর প্রশ্নের সমুদ্র, সংশয়ের অজস্র ঢেউ তোলপাড় করতে লাগল। বশিষ্ঠের কথায় এ কিসের ইংগিত? কি বলতে চাইছে বশিষ্ঠ? তার কথাগুলো বিঘ্ন উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। জেনে শুনে বশিষ্ঠ এরকম কথা বলল কেন?

প্রত্যেকেই গভীর চিন্তায় মগ্ন। নিঃশব্দ স্তব্ধতায় কক্ষে থমথম করছিল। শুধু নিঃশ্বাস পতনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর কাশ্যপ বলল: রাম অগ্রজ। সিংহাসন তারই প্রাপ্য। উত্তরাধিকার নিয়ে সংশয় বা দ্বিধা কেন?

গৌতম তৎক্ষণাৎ বলল: রামের সময়টা গ্রহ নক্ষত্রের বিচারে খুবই শুভ। কিন্তু সূর্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহের দশা যার আছে তার সঙ্গে জাতকের যদি কোন সম্পর্ক থাকে তাহলে জাতকের ভাগ্যফল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। এটুকু ছাড়া আর

কোন দুর্লক্ষণ নেই। রামের জন্ম-নক্ষত্রে কোন বিপত্তি নেই। কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সুমন্ত্র গৌতমের কথা লুফে নিয়ে বলল: অনুকূল ভাগ্যফল নিঃসন্দেহে শুভকার্য সম্পন্নের সময় বিচার্য। এখনকার আলোচনা সম্পূর্ণ আলাদা। রাম ভরত একই সময় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সময়ের চুলচেরা বিচারে রাম অগ্রজ। সিংহাসন তারই প্রাপ্য। তবু কেউ যদি ভরতের উত্তরাধিকারী দাবি করে সংকট ডেকে আনে তাহলে আমাদের কর্তব্য কী হবে?

জাবালি বলল: একবার রামের সিংহাসনে অভিষেক হয়ে গেলে আর কারো দাবি গ্রাহ্য হবে না। যুদ্ধ করে তখন অন্যকে তার অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

বামদেব তৎক্ষণাৎ জবালিকে সমর্থন করে বলল: এক সিংহাসনের উপর দু'জনের অধিকার থাকতে পারে না। শাস্ত্রে আছে যমজ ভ্রাতার মধ্যে যে অগ্রজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব তারই। অতএব ভরতের কোন দাবিই গ্রাহ্য হতে পারে না।

গৌতম সংযোজন করল: রাম জনগণের একান্ত প্রিয়জন। জনসাধারণের কাছে তার যোগ্যতা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত। নেতৃত্ব করার আগে জনসেবার গুরুদায়িত্ব সে পালন করেছে। জনস্বার্থের সঙ্গে তার একটা নিবিড় অন্তরঙ্গ যোগ ঘটেছে। সে একেবারে অযোধ্যার মাটি থেকে উঠে এসেছে। রামের একটা ভাবমূর্তি রয়েছে জনগণের মধ্যে। দেশে এবং দেশের বাইরে। রাজ্য শাসনের জন্য চাই জনচিত্ত অধ্যায়ন, জনস্বার্থের বিচার বিশ্লেষণ করার দক্ষতা। মহারাজের পুত্রদের ভেতর একমাত্র রামের এ গুণ আছে। চরিত্রে, মহত্বে, কর্মে, নৈপুণ্যে, জনসেবায়, মহান আদর্শে রাম শুধু মহান মানুষ নয়, সে একটা আদর্শ এবং মতবাদ। সুতরাং তার দাবিকে ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ, কার্যতঃ নস্যাৎ করার অধিকার কারো নেই।

দশরথ অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল: তাহলে আপনাদের বিবেচনায় রামচন্দ্রই অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আমি জানতুম আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন। আপনাদের উপর এটুকু আস্থা আছে বলেই এ বৃদ্ধ বয়সেও এ গুরুভার বইবার সাহস রয়েছে। আমার বল ভরসা যা কিছু সব আপনারা। রাজসভার সিদ্ধান্ত আমাকে একটা মহাসংকট থেকে বাঁচাল। এখন আমার কোন দ্বিধা সংশয় নেই। অযোধ্যার বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে আপনারা যা করলেন তার তুলনা নেই। এখন আপনারা অনুমোদন করলে রামচন্দ্রের অভিষেকের ব্যবস্থা করতে পারি।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলে একবাক্যে অনুমোদন করলে দশরথ পুনরায় বলল: বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। যে কোন সময় একটা কিছু অঘটন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আমার জীবদ্দশাতে রামের অভিষেক দেখে যেতে পারব মনে হয় না। একমাত্র জরুরী ভিত্তিতে যদি এই কার্য দ্রুত নিষ্পন্ন হয় তাহলেই হয়ত নিজের হাতে তাকে অভিষেক করতে পারব। ভরত এখন রাজধানী ছেড়ে প্রবাসে আছে। এখনই অভিষেকের উপযুক্ত সময়। আপনাদের অনুমোদন পেলে বিনা বাধাতেই রামের অভিষেক করতে পারি।

সহর্ষে দায়িত্বশীল রাজনীতিক সভাসদবর্গ দশরথের প্রত্যাশা পূরণের সম্পূর্ণ সম্মতি দিল। দশরথ পুলকিত হয়ে তাদের সপ্রীতি অভিনন্দন জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করল।

সাফল্যের গৌরব তৃপ্তি নিয়ে মন্ত্রণাসভা থেকে বেরিয়ে দশরথ নিজের কক্ষে প্রবেশ করল। কিন্তু এই কক্ষের প্রতিটি ইট কাঠ তার জীবনে অনেক ঘটনার সাক্ষী। তাদের স্তব্ধ চাহনি, বোবা ভাষা অর্থ দশরথ দেখলেই বুঝতে পারে। তাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানা। এ কক্ষের বাতায়ন তাকে জানিয়ে দেয়, প্রভাতে সূর্য উঠার সময় আকাশে কোন রঙ ধরে, কেমন করে সে রঙ বদলায়? গাছের পাতাগুলি কেমন করে শীতে রিক্ত নিঃস্ব হয়, সন্ধ্যায় কিভাবে দিগন্তে রহস্য জমে উঠে—সব তার জানা। তৃপ্তি সুখের উল্লাস নিয়ে দশরথ কক্ষে পা রাখল। অমনি চারদেয়ালে দরজা জানালা, কড়ি, বরগা সব মৌন, কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে নির্নিমেষ নয়নে দশরথকে দেখতে লাগল। কক্ষের প্রতিকোণ হতে অস্পষ্ট ধিক্কারের চাপা স্বর সে শুনতে পেল। শত শত প্রশ্ন যেন তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বোবা ভাষায় তাদের নীরব তিরস্কার দশরথের মন ছুঁয়ে রইল। বুকে তার অস্থির যন্ত্রণা। দশরথের কাছে জবাবের জন্য তাদের কোন জুলুম নেই, তবু দুঃসহ দৃষ্টির তীব্রতা সে সইতে পারছিল না। প্রতিক্ষণ যেন তার উপর চাবুক হানছিল। আর যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল সে।

নিঃশব্দতা ভয়ংকর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল: অনেক বৈচিত্র্য নিয়ে তোমার জীবন। অনেক ঘটনা নিয়ে তোমার অতীত। অথচ, কি আশ্চর্য ঔদার্যে আর ঔদাস্যে তাদের ভুলে গেলে তুমি। নতুন আস্বাদ বারংবার তোমার জীবনে উন্মাদনা এনেছে। কিন্তু তাতে জীবনের বঞ্চনা আর পাওনা শুধু বেড়ে গেছে। জীবন থেকে তুমি যা আদায় করে নিয়েছ তার অল্পই দিয়েছ ফিরিয়ে। কিন্তু এক অসামান্য সম্পদকে অবহেলা করে তার গৌরব নষ্ট করলে। এর পুরো দাম না দিয়ে রামকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করবে কেমন করে? কৈকেয়ীকে বিশ্বাস করে যে জয় সহজ ও অনিবার্য হত, তাকে ও তার পুত্র ভরতকে সন্দেহ করে তুমি সে জয়কে অনিশ্চিত করলে। ভরতকে কৌশলে মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দেবার কি দরকার ছিল তোমার? অযোধ্যা থেকে তাদের দুভাইকে সরিয়ে মন্ত্রণাসভা ডাকতে গেলে কেন? নিজের আত্মজকেই অবিশ্বাস? তার মত বাধ্য অনুগত পিতৃভক্ত পুত্রকে তোমার ভয় পাওয়ার কি আছে? ছিঃ রাজা! যে মাটি থেকে রস টেনে গাছকে বেঁচে থাকতে হয়, সে মাটির রসটুকু শুকিয়ে ফেললে কি আর গাছ বেঁচে থাকে? ভরতকে সরিয়ে রামকে সিংহাসনে বসানো অনেকটা সেরকম গোছের ঘটনা। আজ না বুঝলেও ভবিষ্যতে জানতে পারবে। ছলনা বঞ্চনা প্রতারণা দিয়ে আপাততঃ যে জয়ের রাস্তা তৈরী হল তার ফাঁক ফাঁকি শূন্যতা ঢাকতে গিয়ে কাল তুমি নিঃস্ব হয়ে যাবে। জমা খরচের হিসাব মিলিয়ে তৃপ্ত হওয়ার এ অবকাশ তুমি পাবে না।

দশরথের হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে হল। মনের মধ্যে একটা নিবিড় ব্যথা জমে বসল, সঙ্গে খানিক ক্লান্তি। কিন্তু এখন তার ফেরার পথ বন্ধ। নিজের

নৌকোকে ভরাডুবি থেকে এখন নিজেকেই বাঁচাতে হবে। বিজয়কে পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতে এখন মনের বেশি ভাগ শক্তি তাকে কাজে লাগাতে হবে। মেজাজটাকে একটু বেশ চাঙ্গা করার জন্যে পানপাত্রে সুরা ঢালল।

খানিকটা পরিতৃপ্তি আর খুশির ভাব নিয়ে সে আপন মনে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। নিজের অজান্তে খোলা বাতায়নের সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়াল। এখন আকাশ আর নীল নেই। গাঢ় ধূসর রঙে ছেয়ে গেছে। চুপি চুপি সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকারের কোমল স্পর্শে পৃথিবী স্নিগ্ধ হতে চলেছে। হাসনাহানার মিষ্টি গন্ধে বাতাস আকুল হয়ে উঠেছে। ঝিঁ ঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে দূরে। সন্ধ্যাতারা আকাশের এক কোণে একাকী ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

চৈত্রমাস।

নির্মল আকাশ।

পড়ন্ত রোদে তখনও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব জড়ানো।

কৈকেয়ী নিজের কক্ষে পালঙ্কে ঠেস দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে ভরতের মহলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

অপরাহ্নের শেষ আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে। পাখিরা যে যার কুলায় ফিরছে। বলাকারা দল বেঁধে মালার মত ভেসে চলেছে দিগন্তের কোন পারে? শান্ত অনুগত সন্ধ্যা তার পিছু পিছু এল নেমে।

আঁধার ঘন হল।

কক্ষে কক্ষে দীপ জ্বলে উঠল। রাজপুরী দীপালোকে উদ্ভাসিত হল। কৈকেয়ীর বুকের ভেতর কি যেন এক হারানোর যন্ত্রণায় টনটনিয়ে উঠল। দিনান্তে ভরত শত্রুঘ্ন একবার করে তার কক্ষে আসে। বারো বছর ধরে এইভাবে চলে আসছে। কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রাত্রি হলেই তৃষিত চাতকের মত কী গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কারণে সময়ের এধার-ওধার একটু হলে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় সে ঘর বার করতে থাকে। বুকের মধ্যে কেঁপে উঠে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন এল না? মুখে কষ্টের ছায়ায় একটা কাঠিন্য নামে। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠে। চোখ ভিজে যায়। সংশয়ভরা ভয়ে নিশি পাওয়ার মত সম্মোহনের ঘোরে এক পা এক পা করে তাদের কক্ষে গিয়ে উঠে। ভরত শত্রুঘ্ন তার দুটি কলিজা। তাদের বিচ্ছেদ তার কাছে দুঃসহ। একবার তাদের না দেখে থাকতে পারে না। এসব জেনেও দশরথ ভরত শত্রুঘ্নকে হঠাৎ মাতুলালয়ে পাঠাল।

তারপর থেকে কক্ষে নিজেকে বন্দিনী মনে হয় কৈকেয়ীর। কৌতূহলের তীব্রতা বঞ্চনার কষ্টে, তীব্র অভিমানবোধে তার বুকের ভেতর টনটনিয়ে উঠে। রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশায় ব্যথা লাগছিল, দপদপ করছিল বুক। এক অসহায় অভিসম্পাতের মত মনে হয় নিজের অবস্থাকে। ভরত শত্রুঘ্নের অভাবে বুক খাঁ খাঁ করে। জীবনের

কোন আকর্ষণ খুঁজে পায় না। একটা ক্লান্তিকর বোঝার মত নিজেকে বয়ে বেড়ায়। বুকের মধ্যে একটা ভয়ের আশঙ্কার চমক, উদ্বেগ ও জিজ্ঞাসা একসঙ্গে তাকে কেমন বিভ্রান্ত করে তোলে। প্রাণটা যেন কিসের ভারে ভেঙে পড়ছে, যা প্রায় অসহনীয়।

কৈকেয়ীর নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে অকস্মাৎ মনে পড়ে দশরথের মুখ। এই লোকটা তার সুখের কাঁটা। তার জীবনের অভিসম্পাত। পুত্রদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বাঁধতে তার আতঙ্ক। কেন? এই আতঙ্ক তার কি জন্যে? জন্ম থেকে পুত্রেরা তার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত। নিজেও সাধ মিটিয়ে পুত্রদের পায়নি কখনও। ফলে মনের গভীরে এক জটিল সংকট উপস্থিত, যার স্বরূপ সে নিজেও বোঝে না। স্বামী হয়ে দশরথও জানতে চেষ্টা করেনি। নিজের স্বার্থ এবং প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে দশরথ ভরত শত্রুঘ্নকে কখনও তার মায়ের কাছে রেখেছে, কখনও আবার সরিয়ে দিয়েছে। জননীর স্নেহের দাবিকে অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে। এমনি করে তার জননী হৃদয় বারংবার রক্তাক্ত হয়েছে। স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমবশতঃ নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করেছে নিজের কষ্টকে। তাতেই মনটা শ্মশানের মত হয়ে গেছে। কোমল মন স্নেহপিপাসু জননী-অন্তর ভরত শত্রুঘ্নের অভাবে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। পুত্রদের হৃদয়ে তার কোন আশ্রয় থাকুক দশরথ চায় না। স্বামীর স্বার্থের অশোভন প্রকাশ তার মনে একটা অজ্ঞাত উদ্বেগ আর অকারণ ভয় ছড়ায়।

কৈকেয়ী যেন আর কিছু ভাবতে পারছিল না। বুকটা মোচড় দিল। নিজের অজান্তে ফুঁপিয়ে ওঠার মত আর্তনাদ করে উঠল ঃ উফ্! আর পারি না! ঈশ্বর আর কত শাস্তি দেবে? ডান হাত দিয়ে বুকটা খামচে ধরল। তখন তার চিন্তার মধ্যে যুক্তি-বিচার কাজ করছিল না। তথাপি ঘটনা পরম্পরায়, দৃষ্টির সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসা থেকে তার মনের মধ্যে এক আশ্চর্য বোধ জন্মাল। মনে হল জীবনের দুর্লভ অভিজ্ঞতায় সে একা। তার মধ্যে যে নিষ্পাপ জননী রয়েছে দশরথ তাকে তিল তিল করে হত্যা করছে। কৈকেয়ীর আরো মনে হল দশরথ নির্দয়, নিষ্ঠুর। তার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে দশরথের প্রতি একটা তীব্র ধিক্কার বুকের ভেতর গর্জে উঠল। দশরথের কপট স্নেহ, তার স্বার্থপরতা, বিভেদের মনোভাব কৈকেয়ীকে কুপিত করল। একটা দুরন্ত ক্রোধে উন্মত্ত আক্রোশে তার ধমনীতে তরল আগুনের স্রোত বইছিল। কৈকেয়ীর জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। দশরথকে আঘাত করার জন্যে তার কক্ষেতে যাবে বলে পালঙ্ক থেকে নামল। কিন্তু মুহূর্তে মনের মধ্যে সে ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে গেল। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে এক গভীর অভিমান তার মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল হল, যার স্বরূপ সে নিজেও ভাল করে বোঝে না। যা তার অচেনা এবং অব্যক্ত। যে কোন চিন্তার মুহূর্তে কৈকেয়ী ইদানীং অসহায় হয়ে পড়ে। পুত্রদের হারানোর একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা আর ভয় তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছড়ায়। যাওয়ার আগ্রহ ফুরোয়। নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে সে পালঙ্কের উপর আছড়ে পড়ল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে হু হু স্বরে সে কাঁদল। কান্নায় কৈকেয়ীর শরীর ফুলে ফুলে উঠল। কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাল। তারপর একসময় নিজেই চুপ করল।

হলুদ রঙের মোটা রেশমের কাপড়ের পর্দা সরিয়ে মন্থরা ঢুকল। গম্ভীর বিষণ্ণতায় কৈকেয়ীকে অন্যমনস্ক দেখল। আরো কাছে গিয়ে দেখল তার চোখ বোজা, গলিত অশ্রুতে গাল ভেজা। মন্থরা অবাক হল। ভুরু কুঁচকে গেল। মন্থরার অলংকারের টুং টাং শব্দে, শাড়ীর খসখস আওয়াজে সচকিত হয়ে সে ঘাড় ফেরাল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল। কৈকেয়ী এক চমকানো ব্যথায় কিছুটা বিব্রত হয়ে মন্থরার চোখে চোখ রাখল।

থমকানো স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতায় মন্থরার ভুরু টান টান হল। দুই চোখে একটা তীব্র সন্দেহ ধারাল ছুরির মত চক্ চক্ করে উঠল। ভ্রূকুটি দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল। কিন্তু কৈকেয়ী মন্থরার দিকে তাকাচ্ছিল না। পাথরের মত চুপচাপ বসেছিল। মন্থরা অপলক চোখে তাকে খুঁটিয়ে দেখছিল।

বড় মায়া হল মন্থরার। কৈকেয়ীর মাথার চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিল। তারপর তার পাশেই একটু জায়গা করে বসল। মুগ্ধ চোখে কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল : তোমার কি হয়েছে? তোমাকে অশান্ত দেখলে স্থির থাকতে পারি না। শরীরের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য উন্মাদনা আমাকে অস্থির করে তোলে। তখন নিজেকেই প্রশ্ন করি : কি পেল মেয়েটা? স্বামী, প্রেম, সন্তান, মাতৃত্ব-সব আছে তার, তবু তার মত রিক্ত, নিঃস্ব কেউ নেই দুনিয়ায়। কেন? কার জন্যে তার এই অবস্থা?

আবেগে আনন্দে কৈকেয়ীর বুক থরথরিয়ে কাঁপল। অনুভূতির মধ্যে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। মন্থরার দিকে তাকাতে গিয়ে তার দু'চোখ জলে ভরে গেল। ভেজা গলায় কাঁপা স্বরে বলল : ভরত শত্রুঘ্ন'র জন্যে আমার মন কেমন করছে।

তুমি ছেলে দুটোকে কদিন কোলে পিঠে নিয়েছ তাও আঙুলে গোনা যায়। তাদের কাউকে তো কখনো আত্মীয় করে তোলার চেষ্টা করলে না। তবু তোমার ওসব মনে হচ্ছে! এত আশ্চর্যের কথা!

কৈকেয়ী রাগল না। ধীর স্বরে বলল : ঠিক, আমার মত সমস্যায় না পড়লে তুমি কখনোই আমার কথা বুঝতে পারবে না। আমাকে ব্যঙ্গ করা খুব সোজা।

মন্থরা স্থির দৃষ্টিতে কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর একটু অদ্ভুত হাসল। সেই হাসিতে রোজকার দেখা মন্থরা বদলে গেল হঠাৎ। ধীরস্বরে বলল : কে জানে? ভাবের কথা শোনার মত মন নেই। এদিকে যে আর এক সর্বনাশ হতে চলেছে তার খোঁজ রাখ কি?

সর্বনাশ! সর্বনাশের কি হল?

আমি'ত তাই মনে করি।

কি মনে কর?

মন্থরা গভীর এক দৃষ্টিতে কৈকেয়ীর দিকে চেয়ে স্নেহভরে বলল : তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর? তোমার কি মনে হয় মহারাজ এবং রাম লক্ষ্মণকে কালিমালেপন করায় আমার সুখ?

কৈকেয়ী বড় বড় চোখ করে তাকাল তার দিকে। স্নিগ্ধ গভীর সে দৃষ্টি ছলছল করছিল। বলল ঃ এ কথা কেন বলছ ?

এসব নিয়েই'ত আমার কথা। তাই মনটা কেমন ঝাঁৎ করে উঠল। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠল। একটা অস্বস্তিতে বুকের ভেতরটা আমার অস্থির হয়ে আছে। তাই আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব জানা দরকার ছিল।

কৈকেয়ী মন্থরার কথা শুনে প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করল। ধরা গলায় বলল ঃ নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর। আমি কি করেছি ? কেন এই অবিশ্বাস ? কেন সন্দেহ ?

মন্থরা একটা শ্বাস ফেলে বলল ঃ দুঃখে, রাগে, কষ্টে বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে। আমার অস্ত্রই আমার বশে নেই। অথচ, অযোধ্যা নাটকে কৈকেয়ীই সব। তার পর কণ্ঠস্বর বদলে বলল ঃ আচ্ছা, তোমার কিছু জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় না ?

কৈকেয়ী হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার দিকে। সম্মোহিতের মত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল ঃ আমার সব রাগ এখন তো তোমারই উপর। কিন্তু রাগের'ত কোন দাম নেই। নিজের মূর্খতাকে ঢাকব কি দিয়ে ? জন্ম থেকে আমি একটা খেলার পুতুল। আমাকে নিয়ে তুমি, পিতা, স্বামী যা খুশি খেলেছ।

মন্থরার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ টান টান করে বলল ঃ হবেও বা। কিন্তু তুমি যদি একটু চতুর হতে তা হলে ওরকম ধারণার কথা কখনও মুখে উচ্চারণ করতে না। এ বাড়ীর বাতাস শুঁকলে'ত মানুষের মনোভাব টের পাওয়া যায়।

গভীর হতাশা মর্মরিত হল কৈকেয়ীর কম্পিত দীর্ঘশ্বাসে। আমি মেয়েমানুষ। ঘর সংসার, স্বামী পুত্রকে নিয়ে আমার জীবনগণ্ডী। আর নিজের বলতে আছে এক অদ্ভুত খেয়াল আর জেদ।

মন্থরার ভুরু যুগলে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসার বিস্মৃত অভিব্যক্তি। ওষ্ঠে বক্র হাসির ধার। বলল ঃ তাই বুঝি ? তবু পুত্রের স্বার্থ জননী হয়ে বুঝলে না। অনেককাল ধরে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। মনেতে তার একটা ধারণাও তোমায় ঢুকিয়ে দিয়েছি।

কৈকেয়ী বলল ঃ বিপন্ন বিব্রত মুখে অসহায়ের মত মন্থরার মুখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল ঃ আমার সরল বিশ্বাস আমাকে ঠকিয়েছে। মেয়েমানুষের জীবনে স্বামী সব। এই বিশ্বাসে মন আমার দুর্বল। স্বামীর দাবি ছাড়তে পারিনি বলে পুত্রদের স্বার্থ ভুলেছি। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলেছে। আর ভুল করব না।

মন্থরার দুই ভুরুর মাঝখানে কুটিল জিজ্ঞাসার এক বিস্ময় ফুটে উঠল। গম্ভীর স্বরে বলল ঃ ভুল'ত এখনও করছ। চোখ থাকতে দেখতে পাও না তোমার পায়ের তলায় মাটি নেই। মন্থরার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ফুটে উঠল। উত্তেজিত স্বর উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। একটু থেমে বলল ঃ তোমার দাঁড়ানোর জায়গা কোথায় ? ভয়ংকর সর্বনাশ তোমার আসন্ন। আর, তুমি কেমন নিশ্চিন্তে শয্যায় শুয়ে ভরত, শত্রুঘ্ন করে বিলাপ করছ। ছিঃ! দুর্বল অক্ষম মানুষের অসহায়-আত্মসমর্পণ হল বিলাপ। বিলাপ করে কে কবে লাভবান হয়েছে ?

ওসব ঠুনকো ভাবপ্রবণতার কানাকড়ি মূল্য নেই। আগুনের মত জ্বলে ওঠ। মত্ত প্রভঞ্জনের মত বিদ্রোহ কর! ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে দাও।

দুঃসহ একটা কষ্ট আর উৎকণ্ঠা নিয়ে আকুল স্বরে কৈকেয়ী প্রশ্ন করলঃ কেন, কি হয়েছে?

মন্থরার মুখখানা আগুনের মত গণগণ করছিল। চোখের তারা মধ্যাহ্নের মরুভূমির মত জ্বল জ্বল করতে লাগল। বিরক্তিসঞ্জাত ক্রোধে তার গলার স্বর কাঁপছিল।—হতে বাকী কি আছে? মহারাজ তোমাকে পথের ভিক্ষুকিণী করে কৌশল্যাকে রাজ্যৈশ্বর্য দিয়ে তার প্রেমকে পুরস্কৃত করেছেন। কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে ভরত শত্রুঘ্নকে মাতুলালয়ে পাঠানো হল, তার খোঁজ রাখ কি?

কৈকেয়ী কি উত্তর দেবে? ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর নির্বাক জিজ্ঞাসা নিয়ে সে মন্থরার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। কৈকেয়ী মনের জানলার এই বন্ধ কপাটটা খুলে কোনদিন তাকে দেখবার চেষ্টা করেনি। হঠাৎ একটা ঝড়ের ধাক্কায় তা যেন খুলে গেল। অমনি এক বিস্মৃত অতীত ঝিলিক দিল তার মনে। কৌশল্যার মুখখানা ভেসে উঠল। কৌশল্যা যেন তার মুখোমুখি স্থির অপলক চোখে দাঁড়িয়ে। ঘাতকের মত রহস্যময় তার চাহনি। অধরের হাসি বিস্তৃত হতে হতে আকর্ণ হয়ে উঠে। হৃৎপিণ্ডের সর্ব শক্তিকে কণ্ঠে সংহত করে চিৎকার করে বললঃ প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! সংগ্রামমত্ত দুর্গা প্রতিমার মত চোখের তারায় প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল কৌশল্যার। কৈকেয়ী স্থির স্বপ্নাবিষ্টের মত অস্পষ্ট স্বরে নিজের মনে উচ্চারণ করলঃ না। না। কিন্তু তার সেই নিঃশব্দ আর্তনাদ কেউ শুনতে পেল না। আতঙ্কে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের শব্দ দ্রিমি দ্রিমি করে বাজতে লাগল।

মন্থরার উত্তেজিত জিজ্ঞাসা কৈকেয়ী আত্মবিস্মৃতি ঘটাল। সম্মোহিতের মত তার বাদামী রঙের চোখের তারা দুটি স্থির হয়ে থাকে মন্থরার চোখের উপর। পরস্পরের দৃষ্টিবন্ধ মুহূর্তগুলো মহাকালের বেগে যেন প্রবলভাবে ঘূর্ণিত হতে লাগল। কৈকেয়ী খানিকটা অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল। বললঃ আমি জানি না। কারো সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা আমার মনে আসে না। যা মনে করতে পারি না তা বলব কেমন করে? স্বপ্নের মধ্যে শুধু বড় রাণীর মুখ ভাসে চোখে। কৈকেয়ীর স্বরে গভীর আতঙ্ক।

মন্থরার দৃষ্টিতে উদ্বেগ ফুটল। গভীর চিন্তামগ্ন মৌন মুখের পেশী ও রেখায় কাঠিন্যের ঢেউ জাগল। চোখের দৃষ্টিতে তার আগুন ছুটল। বিরক্তি, ক্ষোভ, প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল তার অন্তঃকরণ। গলার স্বর চড়িয়ে বললঃ তোমার অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টের কথা চিন্তা করে আমি আতঙ্কে কাঁপছি। ভরত শত্রুঘ্নকে অযোধ্যার বাইরে পাঠিয়ে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হচ্ছে। কেন জান? সে শুধু তোমাকে বিপদে ফেলার জন্যে। তা না হলে কখনও শুনেছ ঘরের ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে কেউ উৎসবের আয়োজন করে? ভরত শত্রুঘ্নের মত রামের অনুগত ভাইদের উপর এই

অবিশ্বাস সন্দেহ কেন ? কেন প্রাণ প্রিয় জ্যেষ্ঠের অভিষেকের উৎসবের যোগদান থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল ? তারা দু'ভাই কেকয় রাজ্যে পৌঁছানোর পর রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন কেন করা হল গোপনে এবং চুপি চুপি ? এই গোপনীয়তা কার স্বার্থে ? কোন উদ্দেশ্যে ? জান ? রামের নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভের পথের কাঁটা তুমি আর আমি। রাম রাজা হলে তোমাকে ও আমাকে কয়েদ করবে। ভরত শত্রুঘ্নকে কেকয় থেকে আর কোনদিন অযোধ্যায় ফিরতে দেবে না। অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার ছল করে হয় তাদের হত্যা করা হবে, নয়ত নির্বাসনে পাঠাবে।

কৈকেয়ীর চোখে এক সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা তাকে ক্রমে শক্ত ও সচেতন করে তুলছিল। তথাপি মন্থরার মুখোমুখি দাঁড়াতে সে কেমন ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। মন্থরার কথার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। তবু মনের ভেতর কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করে ফুটছিল আর নানান অনুভূতির মধ্যে কেমন একটা প্রতিবাদ ঠেলে উঠল। হৃৎপিণ্ডের সর্বশক্তিকে কণ্ঠে সংহত করে কৈকেয়ী তীক্ষ্ন স্বরে বলল : তুমি বড্ড আজেবাজে কথা বল। রাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমায় অধিক সেবা করে, রাম মহৎ উদার। তাকে এত নরাধম মনে করার আগে যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়।

দাঁতে দাঁত দিয়ে মন্থরা তার যন্ত্রণাবিদ্ধ অপমান রাগ সামলাল। হঠাৎ ফণা তোলার সাপের মত ঘাড় ফিরিয়ে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। দুচোখ তাঁর খাদ্যোতের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। ভ্রূকুটি দৃষ্টি ও মুখ পলকের জন্যে শক্ত হল। অধরে কুটিল হাসি খেলে গেল। কৈকেয়ীর দুর্বলতার রন্ধ্রপথগুলি মন্থরার নখদর্পণে। কখন কোন কথা, কিভাবে বললে কৈকেয়ীকে তার অনুকূলে টানা যায়, মন্থরা তা জানে। তথাপি সেই ক্ষণের মধ্যে আপন কর্তব্যে সে স্থির করল তার করণীয়। যা অনিবার্য ছিল বর্তমানে তাই হয়েছে। আত্মগোপনের অবকাশ অতিক্রান্ত। কৈকেয়ীর কথা শুনে তাই সে থমকাল। কিন্তু বিচলিত কিংবা লজ্জিত হল না। নাকের হীরায় দ্যুতি ছড়িয়ে কঠিন কর্কশ স্বরে ফুঁসে উঠল। বিদ্রূপে শাণিত হল তার কথা। বলল : প্রাণে লাগল কথাটা, তাই না ? তুমি বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসতে পার কিন্তু আমি'ত আর চোখের মাথা খেয়ে বসিনি। এ বাড়ীর কোথায় কে কি করে বেড়াচ্ছে সব আমি জানি। আমাকে তুমি জ্ঞান দিও না। তোমার নির্বুদ্ধিতা আমাকে লজ্জা দেয়। তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ্যু হয়। তুমি রাজার কন্যা, রাজার মহিষী হয়েও রাজধর্মের কঠোরতা কেন বুঝতে পার না ? সপত্নীপুত্র রাম কেন তোমার দুঃখের কারণ হবে ? এই'ত প্রশ্ন ? সৌভাগ্যের গর্বে একদিন তুমি সপত্নী রাম জননীকে অগ্রাহ্য করতে। অনেক দুঃখ, লাঞ্ছনা সে পেয়েছে। সে কথা রাম ভুলে গেলেও কৌশল্যা ভোলেনি। কৌশল্যা তোমার মত নির্বোধ নয়। রাম রাজা হলে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে। রামের কাছে তার জননীর চেয়ে তুমি বড় কখনই না। মায়ের প্ররোচনা কতদিন অগ্রাহ্য করবে রাম ? জননীর প্রতিহিংসার সাধ অবশ্যই পূরণ করতে হবে তাকে। লক্ষ্মণ মাতা সুমিত্রাও লক্ষ্মণকে নিশ্চিন্তে এবং শান্তিতে থাকতে দেবে না। অনুগত প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণের বাক্য ও প্ররোচনা রাম কেমন করে

উপেক্ষা করবে ? হিংসার আগুন একবার জ্বাললে তা নেভে না সহজে। তুমি আমি সে আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হবো। আমি সেই অনাগত ভবিষ্যতকে দেখতে পাচ্ছি। আমার তোমার ধ্বংস অনিবার্য। সময় থাকতে শুধু সাবধান হওয়া ভাল।

কৈকেয়ী চমকে উঠল। মন্থরার মুখের দিকে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর একটা প্রবল আতঙ্কে সে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল। বুকের ভেতর ক্রমবর্ধমান একটা ভয়ের অস্থিরতা তাকে উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট করে রাখল। ভাষাহারা কৈকেয়ী বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসায় মন্থরার মুখের প্রতিটি রেখায় তার জবাব সন্ধান করতে লাগল। বেশ বুঝতে পারছিল এক অজ্ঞাত অলৌকিক ভয় যেন তার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছিল। তথাপি মুখে কোন জিজ্ঞাসার স্বর ফুটল না। প্রকৃতপক্ষে কৈকেয়ী একটা আতঙ্কের মধ্যে ডুবে গিয়ে নিঃশব্দে যেন পরিত্রাণের জন্য চিৎকার করছিল।

কৈকেয়ীকে নিরুত্তর দেখে মন্থরার জিজ্ঞাসার রূপ বদলাল। মন্থরা জানে, ভাষার শক্তি কি অপরিসীম। কী তীব্র তার প্রতিক্রিয়া, কত ভয়ংকর তার আঘাত হানার ক্ষমতা। আর সেই জানার অভিজ্ঞতা সে অনেকখানি পেয়েছে কৈকেয়ীর কাছ থেকে। মন্থরা উত্তেজিত। আত্মরক্ষায় সে ভয়ংকর হয়ে উঠল। তার উষ্মা অতি তীব্র হয়ে তার মুখের ভাষাকে আরো তীক্ষ্ণ ও মর্মস্পর্শী করে কৈকেয়ীকে আক্রমণ করল। বলল ঃ এখন কি করবে ? প্রতিকারের কিছু কি দেখছ ? রামের অভিষেক মানে তোমার সর্বনাশ। তোমার ভুলের জন্যে তোমাকে সপরিবারে বিনাশ হতে হচ্ছে। এখন তোমার উপকার করতে এসে আমিও বিপদাপন্ন হলাম। বলতে কি, তোমার হিতার্থে সারাজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছি। কিন্তু শঠ, প্রতারক, অধার্মিক স্বামীর কপট প্রণয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে তুমি আমার সব কথাই সন্দেহের চোখে দেখেছ। মরে গেলেও আমার এই আত্মগ্লানি যাবে না। অথচ দ্যাখ, বাস্তব কি আশ্চর্য! নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! স্থান কালের পরিস্থিতিতে সেই অবিশ্বাসিনীই হল তোমার পরম নির্ভর, একান্ত আশ্রয়। কিন্তু আমিও বা কি করতে পারি ? শুধু উপায় বলতে পারি। তাকে কার্যে পরিণত করা বা না করা তোমার মর্জি।

কৈকেয়ী অকূলে কূল পেল যেন। কিন্তু দুঃখে, অভিমানে, কষ্টে, যন্ত্রণায়, ভৎর্সনায় সহসা তার দুচোখ ছাপিয়ে জল এল। দাঁতে দাঁত চেপে বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা প্রবল আবেগকে প্রাণপণে সামলাতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল তার স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে। তারপর, স্খলিত ভেজা গলায় কম্পিত স্বরে বলল ঃ আমার এক পিঠে তুমি আর এক পিঠে জীবন। আমাকে তুমি ক্রোধের বশে ত্যাগ কর না। আসন্ন ভরাডুবি থেকে আমাকে ও আমার সন্তানদের বাঁচাও তুমি।

কৈকেয়ীর কথায় মন্থরা একটুও অবাক হল না। বরং এরকম একটা কিছুর জন্যে তার প্রতীক্ষা ছিল। তবু কৈকেয়ীর কথার মধ্যে এমনই একটা অনিবার্যতা ছিল যা তার সমস্ত অনুভূতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। পলকের মধ্যে তার চেতনা আক্রমণ

প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়। দায়িত্ব সচেতন হয়ে উঠার জন্যে মন্থরা সহসা গম্ভীর হল। আত্মরক্ষার ভিতকে শক্ত করার চেষ্টায় সে আস্তে আস্তে বলতে লাগল : তুমি জান না, বহুকাল ধরে আমরা একটা মিথ্যের জালে বাস করছি। তাই ভুলের বোঝা আমাদের ভারী হয়েছে। তোমার সরলতা এবং বুদ্ধিহীনতার জন্যে ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠেছে। অযোধ্যাপতি নিজেও তোমার ভালোমানুষী এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে প্রবঞ্চনা করেছে। এসব কথা বলার আর কোন অর্থ হয় না। শুধু এটা যে মনগড়া গল্প নয় এই সত্যটা বোঝানোর জন্যে বলতে হচ্ছে।

মন্থরা এক মুহূর্তের জন্য থামল। কৈকেয়ীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকাল। একটা আতঙ্কিত অসম্মানের ছায়া তার মুখে থমথম করছিল। চোখের চাহনিতে কষ্টের আচ্ছন্নতা। ঘটনার গুরুত্ব ও বিপদ সম্বন্ধে সে এখন বেশ সচেতন। প্রতিকারের প্রত্যাশায় সে যেন একান্তভাবেই তার শরণাপন্ন। তার উৎকণ্ঠিত রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা মন্থরাকে উদ্বুদ্ধ করল। বলল : নিজেকে সব দিক দিয়ে বাঁচিয়েই বোধ হয় অযোধ্যাপতি মহারাজ কেকয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। সেই চুক্তি অনুসারে তোমার পুত্র ভরত হবে অযোধ্যার রাজা।

কৈকেয়ী চমকে উঠল। পলকের জন্য শিহরিত হল তনু। থর থর করে কম্পিত হল তার বুক। সাগর তরঙ্গের মত উল্লসিত হল তার বুকের নিরুদ্ধ আবেগ। বিস্মিত বিহ্বল দুই চোখের তারা থমকানো জিজ্ঞাসায় রহস্যময়। কৈকেয়ীর চমকানো বিস্ময় ভ্রূক্ষেপ করল না মন্থরা। নির্বিকারভাবে বলল : হ্যাঁ, ধর্মানুসারে অযোধ্যার রাজা হওয়ার কথা ভরতের। ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ অযোধ্যার সিংহাসন তার প্রাপ্য। এমন কি ভ্রাতাদের মধ্যে ভরত সর্বাগ্রজ। কারচুপি করে রামকে অগ্রজের আসনে বসানো হয়েছে।* আর্য-অনার্যত্ববোধের দ্বন্দ্ব, সংস্কার থেকে মহারাজের মনে এই বিভেদের বিষবৃক্ষের জন্ম হল। আর্যত্বের অভিমানে তিনি ধর্ম বিসর্জন দিলেন, বিবেককে হত্যা করলেন। পিতা হয়ে পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুর হতে তাঁর একটুও কষ্ট হল না। পুত্র ভরতকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার জন্যে তোমাকে নানাভাবে ঠকিয়েছেন। আর্য-অনার্যত্ববোধের পাদপ্রদীপে দাঁড়িয়ে কিন্তু কেকয়রাজ সেই সমস্যাকে বিষিয়ে দিয়ে রাজনীতির সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলেননি। যথেষ্ট ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। কিন্তু অযোধ্যাপতি সত্যকে বড় মিথ্যে দিয়ে ঢাকলেন। মিথ্যে এমন এক জিনিষ যার মধ্যে মানুষকে আচ্ছন্ন করে দেবার বিষ থাকে। অযোধ্যাপতি সেইভাবে এক মিথ্যে থেকে আর এক মিথ্যেয় গিয়েছেন। ক্রমেই তার পরিধি বেড়েছে। আরও বড় হয়েছে। এইভাবে একটা মিথ্যে মাথা তুলতে তুলতে কোথায় কোন চূড়ায় গিয়ে ঠেকে গেল—মহারাজের নিজেরও

* যদি ভরত ধর্মানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সকলের যে শুভ ফল লাভ হইবে……। বাল্মীকি রামায়ণ—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ২।৮।৮। পৃঃ ১৪৯ মন্থরার এই উক্তিতে ভরতের অগ্রজত্বকেই ইঙ্গিত করে। এবং এক জটিল রাজনীতির সংকেত বলে আমার মনে হয়েছে।

তা জানা ছিল না। প্রকৃত সত্যকে চাপা দেবার জন্যে রামের গল্প আর তার চারণ-গীতি দিয়ে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুললেন। কারণ, কেকয়দেশে ভরতের জনপ্রিয়তা তার বিরাট দিগ্বিজয়ের সাফল্য মহারাজ দশরথকে ভাবিয়ে তুলছিল। ভরত রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর মন সর্বদা তটস্থ। তাই ভরতের কাছে এবং ভারতবর্ষের নৃপতিদের চোখে রামের শ্রেষ্ঠত্ব, বিরাটত্ব, এবং মহত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এত আয়োজন। অথচ কেউ তাঁর সে কৌশল বুঝতে পারলে না। তুমিও না। তারপর, মিথ্যের সৌধ গড়া শেষ হলে রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করা হল। কিন্তু দশরথ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝল ভরতকে অযোধ্যায় রেখে রামের অভিষেক করা সম্ভব নয়। সত্য ও মিথ্যের পাশাপাশি সহবস্থান কখনও সম্ভব নয়। তাই সত্যকে বিসর্জন দেবার জন্যে ভরত শত্রুঘ্নকে কেকয়ে পাঠানো হল। অথচ কি আশ্চর্য দ্যাখ, রামের অভিষেক হচ্ছে জেনেও ভরত শত্রুঘ্নকে একবারও কেকয়ে যেতে বাধা দিলেন না। কিংবা পিতার কাছে সেরকম কোনও আবেদনও রাখেননি। ভরত শত্রুঘ্নের কাছে ঘৃণাক্ষরে তার অভিষেকের সংবাদও প্রকাশ করেননি। অভিষেকের দিনে ভরত শত্রুঘ্ন যে রাজধানীতে থাকছে না, সেজন্য তার কোন দুঃখ নেই। তাদের অনুপস্থিতির জন্য তিনি কোন আক্ষেপ কিংবা খেদোক্তি প্রকাশ করলেন না। কেকয় থেকে তাদের ফিরিয়ে আনারও কোন ব্যবস্থা করলেন না। এর পরেও তুমি রামকে বিশ্বাস করবে ? এ কি তার জ্যেষ্ঠের মত আচরণ ? রাম কতখানি ভ্রাতৃবৎসল, ধার্মিক, সৎ, আদর্শবান—তুমি বিচার কর ? রাম মহারাজ দশরথের মতই চতুর, খল, অভিসন্ধি পরায়ণ। আর্য-অনার্যত্ববোধে তার হৃদয় সংকীর্ণ। রাম যদি সত্যিকারের ভ্রাতৃবৎসল হত, তাহলে ভরতকে কখনও শত্রুর চোখে দেখত না। সে মুখেই ছোট মা, ছোট মা করে। আদর্শের কথা বলে। তার সবটাই অভিনয়। তার বাক্য মধুর স্বভাব মিষ্ট বলে তার শঠতা, ক্রুরতার পরিমাপ করতে পার না। তুমি ভ্রম বশে ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুর শত্রুকে মাতৃস্নেহে ক্রোড়ে তুলেছ। কিন্তু সর্প কখনও তার স্বভাব বদলায় না। এই সত্য বিস্মৃত হয়ে তুমি নিজের বিপদ ডেকে এনেছ। তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে রাম শুধু শুধু এই অভিষেকের সুযোগ পেল। নইলে এই অভিষেক রামের পরিবর্তে ভরতের হত। ধর্মানুসারে অযোধ্যার সিংহাসন ভরতের। ভরত এই রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী। তাকে বঞ্চিত করে মহারাজ দশরথ রামকে সিংহাসনে বসাতে চায়। এতবড় অধর্ম, মিথ্যা ভারতরাজ্যে ইতিপূর্বে হয়নি কখনো।

মন্থরার কথায় কৈকেয়ী চমকাল। বহুকালের একটা ধারণা বিশ্বাস ভেঙে খান খান হল। মন্থরার অভিযোগের মধ্যে কোথাও মিথ্যের ছিটে-ফোঁটা খুঁজে পেল না। কথাগুলো তার বুকের ভেতর উথাল পাথাল করছিল। আর তার ফলেই কৈকেয়ীর শরীর বিবশ হয়ে আসছিল। চোখের কোলে এক গভীর শূন্যতা নামল। ভেতরে ভেতরে ঘুণপোকার মত কি যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আর কেমন একটা অশান্ত অস্থিরতায় সে ছটফট করছিল। সেই অবোধ রহস্যময় অনুভূতি বুকের মধ্যে কষ্টে খামচে ধরছিল।

বুকটা একটু কেমন করছিল। সমস্ত মনটা দশরথের উপর বিষিয়ে উঠল। সে হল তার সবচেয়ে বড় শত্রু। একটা কঠিন ঘৃণায় তাকে বিরূপ করে তুলল। দশরথের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ কৈকেয়ীর অন্তরে এক নীরব বিদ্রোহ জাগাল। স্বাজাত্যবোধের অহংকারে উম্মাদ হয়ে সে তাকে প্রতারণা করেছে, তার সুখ, দুঃখ মনোবেদনার দিকে কখনও ফিরে তাকায়নি। সেই আর্যত্বের গর্ব অহংকার শেষ করে দেবার সংকল্প জাগাল তার মনে। তপ্ত মাথাটা অসহায়ের মত ক্ষণে ক্ষণে চেপে ধরছিল দুহাতে। কৈকেয়ীর বারংবার মনে হতে লাগল একটা বিপুল প্রতিক্রিয়া যে কোন সময় একটা অদ্ভুত কিছু ঘটাবে তার জীবনে। অবশ্যই একটা কিছু হবে। হয়তো উম্মাদ হয়ে যাবে সে। যদি তা না হয় তাহলে একটা সাংঘাতিক কিছু হয়ে উঠবে। সে—ডাইনি, রাক্ষসী অথবা প্রতিহন্তা! মোট কথা একটা কিছু লণ্ড ভণ্ড করতে এরকম একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া তার চিত্ত যখন উদ্‌ভ্রান্ত, অশান্ত, তখন মন্থরার কণ্ঠে রামের প্রতি প্রবল ধিক্কার চড়াগলায় বাজল। সহসা তার মগ্নতা ভেঙে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সে একজন আত্মসচেতন নারী হয়ে উঠল। তার সমস্ত শরীর যুগপৎ আনন্দ বিস্ময়ে মুহুর্মুহুঃ শিউরে উঠল। আশ্চর্য এক সুখানুভূতির মধ্যে ডুবে গেল তার চেতনা। স্বপ্নের আরামে দু'চোখ বুজে এল। একটু আগেই তার নিজের জন্যে ভরতের জন্যে কি উৎকর্ণ উৎকণ্ঠাই না ছিল। এই মুহূর্তে তার মস্তিষ্ক ভাবনাশূন্য।

মাথার ভেতর মেঘের মত টুকরো টুকরো চিন্তা ভেসে যায়। তার মধ্যে নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন জেগে ওঠে। ছেলেকে নিয়ে মা যে স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন। মন্থরার কথায় তার ভাবতে ভাল লাগছিল সে রাজমাতা হবে। পুত্র তার আসমুদ্র হিমাচলের অধীশ্বর হবে। সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে কানন বিহার করবে। শত্রুদল সংকুচিত হবে। আর রাম দীন কৃপাপ্রার্থীর মত তার চরণতলে এসে দাঁড়াবে। কৌশল্যা, সুমিত্রা তার অত্যন্ত অনুগত ও বাধ্য থাকবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে প্রফুল্লিত ভরতের মুখ মনে পড়ে। বাদামী রঙের চোখের মণিতে ফুটে উঠে শত্রুঘ্নের মুখ। জ্যেষ্ঠ সহোদরের মস্তকে রাজছত্র ধরে জননীর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে শত্রুঘ্ন। এদের মধ্যে মন্থরার হাসি হাসি মুখখানাও দেখল। সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যে যার কথা সবচেয়ে বেশী, সবচেয়ে গভীরভাবে ভাবল, তার মত বড় শত্রু, আর দ্বিতীয় নেই। সে শত্রুর নাম দশরথ।

কৈকেয়ীর বুকের ভেতর বহুকালের পুরনো নদীর পার ভাঙা শব্দ। যে আবেগটা দশরথ নামে একটা সীমানায় আবদ্ধ ছিল, তার বাঁধ ভেঙে গেছে। সে আর কেউ নয় দশরথের। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরাট ফাঁক। দশরথ নিজেই সেই ফাটল সৃষ্টি করেছে। মেরামতির দায় যখনই এড়িয়ে গেছে তখনই ফাটল আপনার নিয়মে ভেঙে চৌচির হয়েছে। সেজন্য কৈকেয়ীর কোন দুঃখ হয় না, রাগ হয় না, অভিমানও না। কেবল বন্ধন ছিন্ন হওয়ার কষ্ট বুকের ভেতর কান্নায় পাক খায়।

গহন বিষণ্ণতার মধ্যেও সত্যিকারের একটু আনন্দ অস্ফুট হয়ে ফুটল তার মুখাবয়বে।

আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল। মন ভেঙে দিয়ে এমন করে প্রলোভন দেখাচ্ছ কেন? কৈ এতকাল'ত এসব কথা শুনিনি। আজ তবে শোনালে কেন?

মন্থরা কৈকেয়ীর চোখের উপর চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল: প্রলোভন বলছ কেন? যা সত্য, তাই বললাম। মহারাজ দশরথের কাছে কেকয়রাজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে, যথার্থ সময় ছাড়া অথবা, একান্ত অপরিহার্য না হলে সে কথা কখনও প্রকাশ করা যাবে না। মহারাজ অশ্বপতি তাঁর প্রতিশ্রুতি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘটনা এমনই দাঁড়াল যে এখন তোমাকে সব না বললে শেষ রক্ষা হবে না। তুমিই কেকয়রাজের শেষ অস্ত্র।

কক্ষে কৈকেয়ীকে না পেয়ে দশরথ বিস্মিত হল।

জিনিসপত্তর সব লণ্ড ভণ্ড হয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। মূল্যবান শাড়ী অলংকারও ছিল মেজের উপর ছড়ানো। গোটা ঘরখানা কৈকেয়ীর ক্ষিপ্ত ক্রোধে তছনছ হয়ে আছে। অথচ কৈকেয়ী নেই কোথাও?

দশরথের বুকে যেন সহসা বজ্রপাত হল এবং তার ঝলকে যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। কৈকেয়ীর সঙ্গে দাম্পত্য প্রণয়ে এবং কলহে এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি কখনো তাকে দাঁড়াতে হয়নি।

দশরথ স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শূন্য শব্দহীন কক্ষে। অপলক দুই চোখ বিস্ময়ে জ্বল জ্বল করছিল। আকস্মিক বিস্ময়কর চমকের উৎস কোথায় তা নিয়ে দশরথের মনে নানাবিধ মিশ্র অনুভূতির জটিল প্রতিক্রিয়া তাকে অস্থির করে তুলল। কৈকেয়ীর কি হল? সে এখন কোথায়? কোথায় গেলে পাবে তারে? এমন কি ঘটল অজ্ঞাতে যে তাকে গৃহছাড়া হতে হল? কোন বাসনা অপূর্ণ তার? পৃথিবীতে এমন কি আছে, যা চেয়ে পায়নি কৈকেয়ী? তথাপি, কার উপর অভিমান করে কক্ষছাড়া হল সে? কার উপর? এসব ভাবতে ভাবতে সে ক্রোধাগারের দ্বারের সম্মুখবর্তী হল।

কক্ষের অভ্যন্তরে কে যেন গুমড়ে গুমড়ে কাঁদছিল? কার যেন চুপি চুপি শ্বাস পতনের শব্দ শুনল। দশরথের চোখের উপর আত্মাভিমানী কৈকেয়ীর মুখখানা ভেসে উঠল। দুই চোখে তার মুক্তার মত অশ্রু টলটল করছে কল্পনায় দেখল। দৃষ্টিতে দশরথের নিবিড় জিজ্ঞাসা কেন্দ্রীভূত হয়, যা একটি উদ্বেগে আক্রান্ত। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই স্বর, এই শ্বাস কৈকেয়ীর। কিন্তু ক্রোধাগারে কেন সে? এমন কি ঘটল যার জন্যে ক্রোধাগারে যেতে হল? তীক্ষ্ন বিদ্ধ সন্দেহে দুই চোখের ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে গেল। একটা অশুভ আশংকায় আতঙ্কিত হল তার মন। রামের অভিষেকের মাত্র আর একটা দিন বাকী। এ সময়ে কৈকেয়ীর ক্রোধ নানান আতংকিত সংশয়ে ও জিজ্ঞাসায় তার মস্তিষ্ক পূর্ণ করে তুলল। কৈকেয়ীর এই ক্রোধ কার জন্যে? কার উপর?

দ্বার ঠেলে কক্ষের অভ্যন্তরে যেতে তার কেমন ভয় করছিল। অনেক ঘটনা, কথা বিদ্যুচ্চমকের মত তার মনে ঝলকিয়ে উঠল। নিজের মনেই চমকে উচ্চারণ করেছিল ঃ জীবনের গতি কি বিচিত্র! আর কি বিপরীত! সুখের মুহূর্তে এ কোন্ বিদ্রোহ কৈকেয়ীর?

নানা অনুভূতির মধ্যে কেমন একটা দ্বিধা তাকে সংকুচিত করে রাখল। দ্বারের সুমুখে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল ঃ এই ভীরু সংশয় তার আসছে কেন? অকারণ সন্দেহে অন্তঃকরণ বিদ্ধ হওয়ার হেতুই বা কি? মনের এই যন্ত্রণাকাতরতার মধ্যে কেকয়ের হরপার্বতীর মন্দিরের ছবি তার চোখে ভেসে উঠল। কৈকেয়ীর ভালবাসার সমস্ত প্রতিবন্ধতাকে জয় করার একটা দুর্জয় প্রতিজ্ঞা সেদিন তাকে ভেতরে ভেতরে শক্তি যুগিয়েছিল। জয়ের সেই গৌরব তৃপ্তির উম্মাদনা আর'ত রক্তে কল্লোল জাগাচ্ছে না। কেন? বুকের ভেতর দুরন্ত বেপরোয়া সাহসকেও কোথাও পেল না খুঁজে? কেমন একটা উদ্বিগ্নতায় সে থমকে ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

অনেকটা জোর করেই অশান্ত প্রাণের তাড়নায় নিজেকে নির্ভয় করার তাগিদে দশরথ প্রচণ্ড জোরে কপাটে ধাক্কা দিল। দেয়ালে ঠোক্কর লেগে শব্দ হল। রুদ্ধ কক্ষের থমথমে স্তব্ধতাকে ভেঙে শব্দ যেন অলৌকিক হয়ে উঠল। ভয়ার্ত আর্তনাদের মত কক্ষের অভ্যন্তরে তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল। গম গম করে বাজতে লাগল সুরে।

দশরথের অনুভূতি সমূহ তখন তীব্র আলো অন্ধকারে চিকুর হানা মেঘের মত। আশঙ্কায় আর আতঙ্ক যেন পলকে পলকে তাকে আলোয় উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। একটা চমকানো আবেগে থির থির করে কাঁপছিল তার বুক। আশার সঙ্গে হতাশার যে এত নিবিড় বন্ধন দশরথ আগে কখনও জানত না। এ তার নতুন অভিজ্ঞতা।

কক্ষের মধ্যস্থলে, ভূমিতে বাম বাহুর উপর মাথা রেখে কৈকেয়ী নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিল। তার চুল খোলা। উস্কখুস্ক চুল ফুরফুরে হাওয়ায় মাটিতে ঝাপ্টাচ্ছিল। কখনও মুখের উপর পড়ে খামচে ধরছিল। বসনও অত্যন্ত মলিন, এলোমেলো অগোছালো। নিরাবরণ দেহে নেই কোন রত্ন আভরণ। এক দীন নিঃস্ব রমণীর মত ভূমিতলে সে শুয়েছিল। চোখের তারায় আগুনের ফুলকি, মুখে উত্তপ্ত অঙ্গারের রক্তাভ, কোমল ঠোঁটে পেশীর কাঠিন্য। দাঁতে দাঁত দিয়ে হাতের মুঠোতে কি যেন সমানে পিষতে লাগল, আর পায়ের পাতা ভূমির উপর ঘষছিল।

দশরথের আগমনে কৈকেয়ীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। চোখের সামনে দশরথকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কৈকেয়ী কথা বলল না। তার কোন ভাবান্তর কিংবা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

দশরথের অবাক জিজ্ঞাসা আরো তীব্র হল। চুপ করে বোকার মত তার সামনে দাঁড়িয়ে সে ঘামছিল। কৈকেয়ীর এইভাবে ভূমিতে শায়িত থাকাটা তার চোখে

একটা ভয়ংকর স্পর্ধা বলে মনে হল। ভিতরে ভিতরে সে বেশ বিরক্ত এবং অসহিষ্ণু হল। সমস্ত চেতনা জুড়ে একটা প্রতিবাদ তীব্র ঝংকারে বাজছিল। কিন্তু বাইরে তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। দশরথ উত্তেজিত আচ্ছন্নতার চেতনায় ত্রস্ত হয়ে ভয়ে ভয়ে কৈকেয়ীর পাশে বসল। তার মাথায়, চুলের ভেতর, গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল। আচ্ছন্নস্বরে প্রশ্ন করল ঃ আমার বুকের মাণিক ধুলোয় পড়ে কেমন করে সইব? এ দৃশ্য দেখার আগে আমার দৃষ্টি শক্তি অন্ধ হল না কেন? কঠিন কঠোর এই ভূমিতলে'ত তোমার যোগ্য শয্যা নয়। তুমি কেন শুয়ে আছ এখানে? শুভ্র ফেননিভ কোমল তনু তোমার কত না ক্লেশ পাচ্ছে? এই দৃশ্য আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কষ্টে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। ধুলো-মলিন এই ভূমিশয্যা ত্যাগ কর রাণী। রাজা দশরথের এ মিনতিটুকু রাখ।

দশরথের কথার ভেতর এমন একটা আন্তরিকতা এবং সম্মোহন আকর্ষণ ছিল যে কৈকেয়ীর সারা শরীরে শিহরণ জাগল। বুকের গভীরে তার সুর বাজছিল। চকিতবিদ্ধ একটা ব্যথার সঙ্গেই যেন দুর্বল আবেগ কষ্টে ও পুলকে তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু প্রাণের গভীরে তখন যে যন্ত্রণা ক্রিয়াশীল তা নানাবিধ অনুভূতির মিশ্রণে জটিল।

কৈকেয়ীকে তুলে ধরার জন্যে দশরথ তার দিকে দু'হাত বাড়াল। অমনি একটা লাঞ্ছিত অসম্মানের ছায়া কৈকেয়ীর মুখে নেমে এল। প্রবঞ্চনার দুঃখ, আত্মাভিমানের কষ্ট তার বুকে এত গভীরভাবে বেজেছিল যে ফুঁসে উঠা ঝংকারে দশরথ চমকাল। হাতদুটো ঠেলে দিয়ে বলল ঃ কে চেয়েছে তোমার সোহাগ? আমার কেউ নেই, কিছু নেই। তুমিও না। সব থাকতেও আমার মত দুঃখী, নিঃস্ব, রিক্ত কে আছে? সন্তান গর্ভে ধরেছি মাত্র। তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করতে দাওনি। মা ছেলের কোন সম্বন্ধই তৈরী হয়নি। কেন? তুমি সব কিছুর মূলে। তুমি আমার ভালোবাসাকে ঠকিয়েছ। শঠ, প্রতারক, লম্পট চলে যাও আমার সামনে থেকে। তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না, আমি। তুমি কেউ নও আমার। এ পৃথিবীতে আমার চেয়ে দীনতম দীন কে আছে?

দশরথ স্তম্ভিত। কৈকেয়ীর তীব্র বিরক্তি আর ঘৃণার স্বর তাকে অনেকটা অপরাধী করে তুলেছিল। তবু সে আচ্ছন্নের মত কৈকেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব খুঁজছিল। চিন্তিত স্বরে আপন মনে বলল ঃ ঘাট হয়েছে আমার। দয়া করে কক্ষে চল তুমি। এই ভূমিতলে অযোধ্যার রাজেশ্বরীকে মানায় না। এই দীন বেশবাস নিরাভরণ তনু ইক্ষ্বাকু বংশের কুললক্ষ্মীর শোভা পায় না। স্বর্ণ পালঙ্কের শুভ্র-ফেননিভ কোমল শয্যা, চারু চিত্রিত কক্ষ ছাড়া রাজমহিষী কৈকেয়ীর কোন গৌরব প্রকাশ পায়? পর্বত গুহাতেই সিংহ সুন্দর। সেটাই তার স্বক্ষেত্র। যার যেথা স্থান সেখানে ছাড়া মানায় না তাকে। তুমি রাজনন্দিনী, রাজবধূ, রাজমাতা এর অধিক কি বলব তোমায়?

কৈকেয়ীর কিন্তু তাতে মন গলল না। একটা তীব্র অভিমানবোধে তার মন টাটা-

ছিল। বুকের মধ্যে একসঙ্গে অসংখ্য কথা উথালি পাথালি করে উঠছিল। তথাপি, একটা কথাও বলতে পারল না। মন্থরার মুখ মনে পড়ল। অমনি বুকের ভেতর একটা ঝড়ের কম্পন অনুভূত হল। কৈকেয়ীর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখের কোণ কেমন একটা হাসিতে যেন চিক চিক করে উঠল। বুকের ভেতর তার অশান্ত অস্থিরতার চমক তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। ঠোঁট টিপে টিপে বলল ঃ রাজা, তোমার মত ঠক, প্রতারককে আমার স্বামী বলে ভাবতে কষ্ট হয়। তুমি আমার সরল বিশ্বাস নিয়ে খেলা করেছ, আমার মহান প্রেমকে ঠকিয়েছ। তোমার মুখ দর্শন করাও পাপ। আমার সুমুখ থেকে চলে যাও তুমি। কৈকেয়ী কথাগুলো রাগে, অভিমানে, দুঃখে, ক্ষোভে মরিয়া হয়ে বলল।

দশরথ সেই মুহূর্তের আকস্মিকতায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কারণ, দশরথ বেশ বুঝতে পারছিল কৈকেয়ী রহস্যের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসছে। এক অজ্ঞাত আশংকায় তার চিত্ত অস্থির হল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল ঃ কৈকেয়ী ক্রোধের বশে কি বলছ, তুমি জান না?

কৈকেয়ীর অধরে হাসি, চোখে আগুন নিয়ে দশরথকে প্রশ্ন করে ঃ বটে। আমার ক্রোধের কারণ জানতে চেয়েছ কখনও? একবারও কি প্রশ্ন করেছ কেন ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, বিদ্রোহী আমি? আমার কি হয়েছে, কি চাই, তার কোন খোঁজ নিয়েছ তুমি?

সে সুযোগ'ত তুমি আমাকে দাও নি। তোমার সন্ধানে এসে পেলাম শুধু লাঞ্ছনা। অথচ তুমিও ভাল করে জান, কি না করেছি তোমার জন্যে? শুধু তোমাকে খুশি করতে কৌশল্যা সুমিত্রা থেকে দূরে থেকেছি। রাজপ্রাসাদে তারা অত্যন্ত অনাদরেই থাকে। তবু তুমি আমাকে কটাক্ষ করছ। ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে, শ্লেষে জর্জরিত করছ। তুমি যা যা কামনা কর আমাকে বল। তোমার কষ্ট ভোগের প্রয়োজন কি?

ওটাই'ত তোমার নাটক। আমাকে বোকা বানানোর কৌশল। লোককে বিভ্রান্ত করার একটা সুন্দর উপায়।

ছিঃ ছিঃ, এসব কথা তোমার মুখে কোনদিন শুনতে হবে ভাবিনি। তোমার এত কালের শ্রেষ্ঠত্বকে কেন নীচে নামিয়ে আনলে রাণী? তোমার বাক্যেতে যা হত মধুর তাকে গরল করলে কেন?

নিস্পৃহভাবে কৈকেয়ী উত্তর দিল ঃ স্বপ্ন দেখার দিন শেষ হয়েছে বলে।

কৈকেয়ীর কথায় উত্তেজনা ছিল না। সে শান্ত। নিজেকে সে অনেকটা অকুণ্ঠ ভাবে প্রকাশ করল। কিন্তু তার অপলক চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দশরথের চোখে বিদ্ধ। দশরথ একটু অবাক হল। চকিতের জন্যে ভুরু কোঁচকাল। আশাভঙ্গের বেদনা বিস্ময় ও সংশয় সৃষ্টি করল। গভীর অন্যমনস্কতায় দশরথ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা স্খলিত অস্পষ্ট স্বর আবেগে গাঢ় হল। ধীরে ধীরে উচ্চারিত করল ঃ—কৈ আমি'ত কখনও মনে করি না। বরং কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি, তোমার জন্যেই আমি পিতা হতে পেরেছি। তুমি আমাকে সন্তানের পিতা করেছ। তোমাকে

না পেলে এ সাধ পূর্ণ হত না আমার। আমাকে তুমি পূর্ণতা দিয়েছ। এক নতুন পৃথিবী দিয়েছ, আমার নবজন্ম হয়েছে। আমার জীবন কাণ্ডারী হয়ে তুমি যেমনভাবে চালিয়েছ তেমনিভাবে চলেছি। আর এক দিক থেকে তুমি আমার জীবন-দাত্রীও বটে। তোমাকে আমি ভুলব কেমন করে? তুমি যে আমার! একান্তভাবেই আমার। সেখানে আর কারো স্থান নেই।

দশরথের স্বর কৈকেয়ীকে মুগ্ধতার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু দাবির আশ্বাস পূরণ হয় না বলেই তার কণ্ঠে শ্লেষ বিদ্রূপের বিস্মিত ঝংকার।—চমৎকার! অপূর্ব তোমার অভিনয়।

কৈকেয়ীর আচরণকে দশরথের জটিল মনে হল। দশরথের সমস্ত চিন্তার দিগন্তকে সে বিস্ময়াবিষ্ট করল। হতাশ গলায় বলল ঃ এত আন্তরিকতা সব মিথ্যে। সত্যি মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে কথা বলাই বৃথা হয়।

কৈকেয়ী খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল ঃ তুমি ঠিক বলেছ। এতকাল এই কথাটা আমার না বোঝার সুযোগ নিয়েছ তুমি।

কৈকেয়ী!

অবাক হয়ো না রাজা। আমাকে ঐ নামে ডেকে তুমি দুর্বল করে দিও না। তোমার মুখে ডাক শুনলে আমি স্থির থাকতে পারি না। আমাকে তুমি বলতে দাও। জানতে দাও। আমার বুকের ভেতর আগ্নেয়গিরির ঘুম ভাঙছে। তোমার সম্মোহনী বিদ্যা দিয়ে তাকে যাদু কর না। রুদ্ধ কর না তার গতিমুখ। বলার সময় কৈকেয়ীর মুখে রঙের ছটা লাগল।

দশরথ ভুরু কুঁচকে তাকাল তার দিকে। অবাক স্বরে বলল ঃ তোমাকে বাধা দেব এমন কথা মনে হল কেন? নিভৃতে দুটো কথা বলবার জন্যেই তোমার কাছে এসে-ছিলাম। কক্ষের শ্রী দেখেই বুঝলাম, তোমাকে এখানে পাব। এখন বল, কে তোমাকে অপমান করেছে, কে করেছে ভর্ৎসনা?

কৈকেয়ী আস্তে আস্তে উঠল। দশরথের চোখের উপর চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখ দিয়ে তেজ বিকীর্ণ হতে লাগল। কথা বলার সময় তার গলার স্বর কাঁপল। বলল ঃ আগে কথা দাও আমার কথা রাখবে, তা হলেই সব বলব।

তোমাকে অদেয় কিছু নেই রাণী।

বেশ, আমার প্রশ্নের তা-হলে উত্তর দাও।

বল, তুমি কি জানতে চাও?

মহারাজ, ইক্ষ্বাকুবংশের সিংহাসনে কার অধিকার?

দশরথ চমকাল। ভেতরে ভেতরে সে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। একটা ভীরু জিজ্ঞাসা তার চোখে থম থম করছিল। তথাপি, দশরথ নিজেকে শক্ত রাখল এবং নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলল গাম্ভীর্য আর দৃঢ়তাকে। মনের সমস্ত দৃঢ়তাকে একত্র করে সহজ গলায় বলল ঃ এমন অসংগত প্রশ্নের আবশ্যক কি?

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?

দশরথের নিঃশ্বাস বুকের কাছে যেন আটকে গেল। বিরক্তিকর অস্বস্তিতে ছটফট করছিল। মুখের অভিব্যক্তিতে সে অস্থিরতা না ফোটে যাতে সেজন্য আপন মনে গলার স্বর বদলিয়ে বলল ঃ পৃথিবীর সব রাজবংশেই জ্যেষ্ঠ সন্তান সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়। তোমার পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মনে হয় কাকে ?

কৈকেয়ীর উজানমুখী কথার উল্টোস্রোত দশরথের বুকের ভেতর ছলাৎ করে উঠল। দ্বিধাভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ভীরু গলায় বলল ঃ তুমি'ত এই বংশের বধূ একজন। সন্তানদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ-এর উত্তর আমার চেয়ে তুমি ভাল জানবে। এসব'ত মায়েদের জানার কথা। পিতারা জানবে কোথা থেকে ?

তোমরা যাকে জ্যেষ্ঠ বলে স্থির করেছ আমি তাকেই জ্যেষ্ঠ বলে জানি।

স্বামী। প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেও না। যা জানতে চাই, তার কথা বল ?

আমি'ত বুঝতে অক্ষম, জ্যেষ্ঠত্ব নিয়ে তোমার মনে সন্দেহ কেন ? কে বা কারা তোমাকে রাম বিদ্বেষী করে তুলল ? রাম তোমার পুত্রাধিক প্রিয়। তাকে ঈর্ষা করা জননীর শোভা পায় না।

কৈকেয়ীর ভুরু কুঁচকে গেল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে মনের কষ্ট চেপে বলল ঃ ঈর্ষা ! ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হাসি ফুটল। কৈকেয়ীর সমস্ত বুক জুড়ে তখন দশরথের বিবেকহীন মূঢ়তার প্রতি ধিক্কার। নিস্কুণ্ডল হয়ে পাক খেয়ে যেন গলার কাছে উঠে এল। বলল ঃ প্রসঙ্গান্তরে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তুমি আমাকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করছ। কিন্তু আমি তোমার কোন কৌশলে বিভ্রান্ত হব না। ভুল করে তোমার কথার ফাঁদে পা দিয়ে নিজের বিপদ বাড়াব না।

কৈকেয়ীর কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দশরথের ব্যক্তিত্ব এবং বিবেককে বিদ্ধ করল। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। কেমন যেন হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। অসহ্য একটা গ্লানিতে দশরথের কান জ্বালা করছিল। শরীরে ঘাম ফুটে উঠেছিল। সাহস সঞ্চয় করে নিস্পলক চোখে কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর অবাক স্বরে বলল ঃ ছোট রাণী, আজ তোমার মন ভাল নেই। তুমি উত্তেজিত। অপ্রকৃতিস্থ। এখন এসব নিয়ে আলোচনার সময় নয়। তোমার অসংলগ্ন, অসংগত প্রশ্ন আমার চিত্ত দাহের কারণ হচ্ছে।

কৈকেয়ীর মুখ রাগে, ক্ষোভে পাংশুবর্ণ হল। নিজেকে খানিকটা সংযত সচেতন করে নিয়ে বলল ঃ আবার শুরু হল মিথ্যের খেলা। যখন নিজেকে বাঁচানোর দরকার হয়, মানুষ কি না করে। নির্বিচারে মিথ্যে সাজাতেও তার ক্লান্তি থাকে না। তোমারও নেই। তাই, তোমার মুখেই শুনব প্রকৃত জ্যেষ্ঠ কে, আর কাকে জ্যেষ্ঠ কর হয়েছে ?

কৈকেয়ীর তিরস্কারে দশরথের বুক এত ভারী হয়ে উঠলযে সে নীরব রইল নিজের মিথ্যায় নিজেকে এভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে ভাবেনি দশরথ। তাই অপমানে যন্ত্রণায় তার দুই চোখ প্রায় বুজে এল। তবু কৈকেয়ীরমুখের দিকে বোকার ম

কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বিষণ্ণ ভারী ভাঙা গলায় বলল ঃ তা-হলে শোন। পুত্রদের মধ্যে রাম জ্যেষ্ঠ। অযোধ্যার সিংহাসন তার প্রাপ্য। লোকে রামের গুণকীর্ত্তন করে। আমিও করি।

কৈকেয়ীর ভ্রূকুটি চোখে কেমন একটা তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠল। কপট অবাক স্বরে প্রশ্ন করল ঃ আর ধর্মানুসারে অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধীকারী কে?

কৈকেয়ীর মুখে সহানুভূতি, সমবেদনা, মমতা, করুণার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না দশরথ। তার নাকের পাটা ফুলে উঠল। চোখে মুখে তীব্র অপরাধের কষ্ট তাকে বেদনা দিচ্ছিল। উত্তপ্ত আক্ষেপের স্বরে বলল ঃ তার মানে?

কৈকেয়ীর নির্বিকার মুখে বিজয়িনীর হাসি দীপ্ত হল। চোখে প্রতিশোধের ঘৃণা। বলল ঃ ভরত যদি দাবি করে এ সিংহাসন তার, কি উত্তর তুমি দেবে?

কৈকেয়ীর প্রশ্নে দশরথের মুখ চকিতে পরিবর্তন হল। তাকে গম্ভীর বিষণ্ণ দেখাল। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ে দশরথ। তার মনের আহত সংকুচিত দৃষ্টিতে বিরক্তি কিংবা বিরূপতা ছিল না। বরং কেমন কোমল আর করুণ দেখাল। কিন্তু বুকের ভেতর অশান্ত অস্থিরতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। তীব্র অপরাধবোধের কষ্ট প্রবল হল। উৎসুক চোখে তাকিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বলল ঃ না, না, ভরত সে রকম ছেলেই নয়। আমার পুত্রদের মধ্যে সে সর্বাধিক ধার্মিক, নির্লোভ সাধু চরিত্রের। ভ্রাতৃবৎসল ভরতের রাম হল জপতপ। সে কখনও জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। রামকে বঞ্চিত করে, ভ্রাতৃত্বের বিশ্বাস ভেঙে রাজসুখ গ্রহণে অভিলাষী নয় সে। অন্ততঃ ভরতের কাছে আমি কখনই সেরূপ প্রত্যাশা করি না।

কৈকেয়ীর দুই ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝিলিক দিল। ঠোঁট দুটি ধনুকের মত বাঁকল। ভ্রূকুটি বিস্ময়ে বলল ঃ মহারাজ তোমার জবাবে জোর কোথায়? ভরতের সিংহাসনের দাবিকে এক কথায় নাকচ করতে পারলে না। তোমার সংশয় দ্বিধাতে তার দাবির স্পষ্ট সংকেত। কেন জান? মানুষের বিবেক কখনও কখনও তার ইচ্ছায় চলে না। তাই চেষ্টা করেও তুমি মিথ্যে বলতে পারলে না। নিজের অজান্তে ভরতের অধিকার স্বীকার করেছ। মানুষের অপরাধের পাল্লা যখন ভারী হয়ে ওঠে তখন অপরাধ সচেতন মন তার তাল সামলাতে পারে না। তাই ভরতকে তোমার ভয়। ভরতকে সৎ, ধার্মিক, দয়ালু, ভ্রাতৃবৎসল, ত্যাগী এইসব গালভরা মিষ্টি কথায় তোয়াজ করে তাকে ভুলোচ্ছ। ভ্রাতৃবৎসল ভরত কখনও রামকে বঞ্চিত করে সিংহাসনের অধিকার নেবে না, এ কথা আবার বিশ্বাসও কর। কেন? সে কি শুধু ভরত, জ্যেষ্ঠ বলে?

দশরথ বিমর্ষ স্বরে প্রশ্ন করল ঃ এ সব তুমি কি বলছ?

আমি কেন বলব? তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করছ। ভরত সৎ-ধার্মিক, ভ্রাতৃ-বৎসল জেনেও তাকে বিশ্বাস করতে পার না। তাকে ভয় পাচ্ছ। পিতা হয়ে পুত্রের সঙ্গে কেমন নির্লজ্জ মিথ্যাচার করছ, অবাক হয়ে তাই শুধু দেখছি। ধন্য তোমার ধর্মবোধ। তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র আদর্শ নেই। তুমি সৎ নও—প্রতারক, প্রবঞ্চক, মিথ্যেবাদী। চতুর, নীচ, নিষ্ঠুর ধর্মহীন, বিবেকহীন এক অমানুষ। অপরাধ করতে

করতে তুমি একটা শয়তান হয়ে উঠেছ। নইলে, কোন পিতা তার ধার্মিক, নির্লোভ সাধু চরিত্রের পুত্রকে অবিশ্বাস করে ?

দশরথ বিব্রত বিস্ময়ে ডাকল ঃ প্রিয়তম রাণী আমার !

কৈকেয়ীর ঠোঁটের কোণ শক্ত দেখাল। দৃষ্টি কঠিন হল। বলল ঃ ঐ সম্মোহন স্বরে আমাকে ডেক না তুমি। আমাকে বলতে দাও। ভরতেব চিন্তা তোমার বিবেককে সকল সময় দংশন করছে। তাই তুমি সর্বদা অশান্ত, অস্থির, অপ্রকৃতিস্থ। তুমি তোমার দুর্বলতা জান না। একদিন ভরত সম্বন্ধে তোমার উৎকণ্ঠা দেখে আমি খুশি হতাম। কিন্তু সে যে তোমার বিবেক দংশনের প্রতিক্রিয়া, কেমন করে জানব ?

দশরথ মৌন বিস্ময়ে মাথা নত করল। কৈকেয়ী তার খুব গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চিবুকে হাত দিয়ে উঁচু করে ধরল তার মুখ। নিজের চোখের উপর দশরথের চোখ ন্যস্ত করে বলল ঃ মহারাজ এই চোখ দেখে ভুলেছিলে কোনদিন ? মনে পড়ে সে বিস্মৃত অতীত ? এই নারীর আশ্চর্য সেবায় মুগ্ধ হয়ে কি বলেছিলে সে কথা মনে আছে ? আমাদের পবিত্র প্রেমের নামে শপথ করে বল রামের অভিষেকের সময় ভরত-শত্রুঘ্নকে কেন দূরে পাঠালে ? তারা থাকলে রামের অভিষেকের কি ক্ষতি হত ? রামের অভিষেক নিয়ে তোমার গোপনীয়তা কেন ? তোমার ভাষায় প্রিয়তমা রাণী আমি, তাকেও কিন্তু সে বার্তা শোনাতে ভুলে গেলে। এ'ত ভারী আশ্চর্য !

দশরথ প্রায় খানিকটা অসহায় চোখে কেকেয়ীর দিকে তাকাল। কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে বলল ঃ কৈকেয়ী তোমার সন্দেহ তীব্র। বাক্য তীক্ষ্ন। নির্মম তোমার পরিহাস।

মহারাজ ততোধিক নির্মম তোমার কপটতা। ভরতের প্রতি তুমি কেন অকারণ নিষ্ঠুর হলে ? সেও তোমার পুত্র। তবে জ্যেষ্ঠের সম্মান কেন পেল না সে ? ইক্ষ্বাকুবংশের প্রথা হল পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে রাজা। ভরতের বেলায় তুমি সে নিয়ম মানলে না কেন ?

রাণী ! ভুল ভুল। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তোমার নয়নমণি রাম।

মহারাজ ঘটনা কিন্তু তা বলে না। রাম নিজেও জানত, ভরত এই সিংহাসনের রাজা হবে। তাই প্রিয়তম ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে সে অভিষেকে রাজী হল। ভরতের প্রতি তোমার অহেতু সন্দেহকে রাম কোন প্রশ্ন করল না। এর অর্থ কি বলে ? সন্দেহের শেষ এখানে নয়। এ শুধু সূচনা। অভিষেক অনুষ্ঠানে ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত নেই। একথা জেনেও রাম একটুও দুঃখ কাতর নয়। তার চিত্ত ভ্রাতাদের জন্যে কাতব হয় না। কিংবা কেকয় থেকে তাদের ফিরিয়ে আনার কোন কথাও বলল না রাম। তুমিও কিছু করলে না। চুপিচুপি অভিষেক করতে চেয়েছিলে। তাই অভিষেক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত রাজ্যন্যবর্গের তালিকা থেকে যথাক্রমে কেকয় রাজ এবং তাঁর বৈবাহিকী সাকাংশ্যরাজ কুশধ্বজকে বাদ দিলে। শুধু এঁদের আমন্ত্রণ করতে ভুল হল কেন ? এ ভুল কি তোমার ইচ্ছাকৃত নয় ?

কথার শেষে কৈকেয়ীর জ্বলন্ত দৃষ্টি পলকে দশরথের বিব্রত মুখ ছুঁয়ে গেল।

দশরথকে সংকুচিত দেখাল। অপ্রস্তুত হয়ে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল : তোমার এই অহেতু বিষ সন্দেহের কি জবাব দেব ?

কৈকেয়ীর দৃষ্টি ঝলকে উঠল তৎক্ষণাৎ। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল। ক্রোধে গরগর করতে করতে বলল : জবাব নেই বলে দিতে পারছ না। থাকলে ছাড়তে না। কেননা তুমিও জান ধর্মানুসারে অযোধ্যার সিংহাসন ভরতের প্রাপ্য। দু'ভাবে এই সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী সে। প্রথম তুমি তাকে জ্যেষ্ঠ না বললেও, ঘটনার পারম্পর্যে সে জ্যেষ্ঠ এই সন্দেহ রাজপ্রসাদের সকলের। দ্বিতীয়তঃ কেকয় রাজের কাছে তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তাঁর দৌহিত্রকে অযোধ্যার রাজা করবে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতিপালনের কোন সততা তুমি দেখাও নি। সত্যকে লুকোনোর অপরাধে তুমি ধর্মভ্রষ্ট হয়েছ।

বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে দশরথ কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। করুণ কণ্ঠে বলল : কৈকেয়ী দেবী তুমি অহেতু আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না। এত আয়োজন পণ্ড করে সবার সামনে আমাকে অপদস্থ কর না। আমাকে তুমি করুণা কর।

কৈকেয়ীর মুখ শক্ত হল। স্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল। বলল : রাজা নিজের সঙ্গে নিজে ছলনা করেছ তুমি। ভরতও তোমার ঔরসজাত পুত্র। তথাপি, সে তোমার স্নেহ সমাদর পেল না। অদৃষ্টে তার পিতার পক্ষপাত লেখা। ভরতের এই দুর্ভাগ্যের কোন পরিমাপ হয না। আচ্ছা তুমিই বলনা, ভরতকে কেন ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছ ? ভরত তোমার কি অনিষ্ট করেছে ? রামকে হতাশ করতে তোমার যেমন বুক ফাটছে তেমনি ভরতকে বঞ্চিত হতে দেখে আমারও মন পুড়ছে। তুমিই আমার বুকে আগুন জ্বালিয়েছ, সে আগুনে শান্তি পুড়ে ছাই হবে।

কৈকেয়ী তুমি শান্ত হও। অশান্ত হৃদয়াবেগ সংযত কর; রামের প্রতি প্রসন্ন হও।

কি করে শান্ত হব রাজা ? তুমি'ত জাননা আমার জ্বালা কোথায় ? রাম ভরত দুজনেই তোমার দেহজ, আত্মজ। কিন্তু রাম আমার কে ? আমার সপত্নী পুত্র ছাড়া'ত কিছু নয় ? তোমাকে নিয়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ। আমি তার গর্ভধারিণী নই। তবু তার প্রতি আমার মমতা, স্নেহ ছিল অসীম। কিন্তু রাম তার মর্যাদা রাখেনি। রাজা হওয়ার লোভে সে আমাকে কপট শ্রদ্ধা ভক্তি করত। তাই অভিষেকের সংবাদটা বিশ্বাস করে তার প্রিয় ছোট মা'কে বলত পারেনি। আমার স্নেহ ভালবাসার উপর তার বিশ্বাস নেই। সন্দেহ আছে। আমাকে সে শুধু 'ভরতের মা' মনে করে। আমার উপর তার দাবি নেই, জোর নেই। অথচ রাম তার ছোট মা'কে ভাল করেই চেনে। তবু রাম তার পিতার মতই কপট। বিমাতাকে বিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে, অবিশ্বাস করে ঠকা অনেক ভাল তার কাছে। এই দুঃখ প্রকাশ করার ভাষা নেই আমার। রাম একবার নিজে যদি তার অভিষেকের কথা জানাত কিংবা দাবি করত তা হলে খুশি মনে ভরতের সব অধিকার তাকেই দিতাম। কিন্তু একবার মর্যাদা হারানোর পর তা আর হয় না। ভরতের প্রতিও রাম যথেষ্ট উদার নয়। ভরতকে সে প্রতিপক্ষ ভাবে।

তাই, তার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসার উপর রামের কোন আস্থা নেই। লক্ষ্মণের প্রতি রামের যে বিশ্বাস, ভরতে তে কে? রাম আমাদের উভয়ের উপর যথেষ্ট অবিচার করেছে। তার আচরণ পুত্র সুলভ নয়। ভ্রাতৃসুলভও হয়নি। আমরা তার চোখে শত্রু। শত্রুকে কেউ বিশ্বাস করে না। রামও করেনি। অভিষেকের সংবাদ তাই গোপন করেছিল। রামের আচরণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। রাজা, তোমরা দুজনে আমার মন ভেঙ্গে দিয়েছ। ভাঙ্গা হৃদয় জুড়ব কি দিয়ে? অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে পর আপন হয় না কখনও। আমার সরল বিশ্বাস নিয়ে তুমি এবং রাম ছিনিমিনি খেলেছ। তোমাদের আর বিশ্বাস নয়। এবার চাই প্রতিকার।

প্রিয়তম রাণী আমার! রাম ছেলে মানুষ। কি করতে কি করে ফেলেছে। এসব জটিলতা সে বোঝে না।

উত্তম। তাহলে তুমি কেন অপ্রিয় কাজ করলে? আমাকে তোমার কিসের ভয়?

বেশ আমি দোষ করেছি। অকপটে স্বীকার করছি, আমার অপরাধ হয়েছে। এবার তুমি ক্ষান্ত হও। আমাকে কৃপা কর। আমি কখনও কারো করুণা ভিক্ষা করিনি। কোন ব্যক্তির দ্বারা পরাজিত কিংবা অপমানিত হই নি। আজ তোমার কাছে আমার মিনতি—

রাজনীতিতে কোন মিনতির স্থান নেই। শত্রু কালসর্পের মত। তাকে কখনও অল্পপীড়ন করে ছেড়ে দিতে নেই। একদিন পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমার পুত্র হবে অযোধ্যার রাজা। আর, অন্যরাণীদের পুত্র সন্তান হলে তারা যাবে নির্বাসনে। আমি সেই প্রতিশ্রুতি পালনের আহ্বান করছি। ভরতকে অযোধ্যায় সিংহাসনে রাজা করে রাম-লক্ষ্মণকে নির্বাসনে পাঠাও। এবং এখনি।

কৈকেয়ী, দয়া কর।

কোন কথা বল না রাজা। সত্যরক্ষায় তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রেমের দেবতা হরপার্বতী তার সাক্ষী। আর প্রমাণ তোমার বিবেক।

কৈকেয়ী শোন আমার কথা। অত নিষ্ঠুর হয়ো না।

রূপসী রাজবধূর ভিতর থেকে যেন এক বিষধর সাপ বেরিয়ে এসে ফণা তুলল। কৈকেয়ীর বিষদাঁত যেন সুড়সুড় করে উঠল। ভ্রূকুটি করে বলল ঃ মহারাজ তোমার কপটতার তুলনায় আমার, নিষ্ঠুরতা সামান্য। আমি কোন হীন সন্দেহে, কিংবা অবিশ্বাসে আমার প্রেমের স্নেহের অপমান করিনি। আমার মনেও নেই রামের প্রতি কোন ঈর্ষা বা ঘৃণা। কিন্তু আমরা তার চোখে চিরশত্রু। রাম শত্রুর যম একথা'ত প্রবাদের মত আজ লোকের মুখে মুখে শোভা পায়। রাজা হয়ে গৃহশত্রুর বীজ সে ধ্বংস করবে। শত্রুকে রাম ক্ষমা করে না। রাম সিংহাসনে বসলে আমরা নিশ্চিহ্ন হব। তাকে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নেয়ার সুযোগ দেব না। একবার যখন তার চোখে বিনা কারণে শত্রু হয়ে উঠেছি, তখন কোনদিন আর মিত্র হতে পারব না। তাই শত্রুর মতই আচরণ করব। শত্রুর সঙ্গে একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়। তাই তার নির্বাসন প্রার্থনা করছি।

রাণী! তুমি কি জান না নরোত্তম রামের অধিক প্রিয় আমার কেউ নেই।

মহারাজ, তুমি একমুখে দুরকম কথা বল। একটু আগে বলেছ পুত্রদের মধ্যে ভরতকে তুমি সর্বাধিক স্নেহ কর। এখন বলছ রাম তোমার প্রিয়। তোমার কোন কথাই বিশ্বাসের নয়।

দশরথ কথা খুঁজে পেল না। কেমন একটা অসহায় বোধে আচ্ছন্ন সে। ইতস্ততঃ করে বলল ঃ রাণী তুমি'ত কোনদিন নৃশংস প্রকৃতির ছিলে না। তুমি'ত লোভী নও। রামের কোন ক্ষতি তুমি সহ্য করতে পার না। তা-হলে আজ কেন তার অনিষ্ট চাইছ? আমিও বা প্রিয়তম পুত্রকে কোন অপরাধে ত্যাগ করব?

মহারাজ কোন্ অপরাধে মায়ের বুক থেকে তার সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে দূরে দূরে রেখেছ? তোমার কি ক্ষতি করেছি? বল। কেন তুমি স্নেহশূন্য করলে আমাকে। আমার বুকের সাগর সেঁচে আজ কোন্ শুক্তি তুমি সন্ধান করছ?

কৈকেয়ীর কথায় দশরথের চোখ মুখ অস্বাভাবিক তীক্ষ্ন আর গণগণ হয়ে উঠল। হতবুদ্ধির মত চুপ করে সে কৈকেয়ীকে এড়াতে চাইল। তাকে নিরুত্তর দেখে কৈকেয়ী বলল ঃ তোমার মনে রক্তের বিশুদ্ধতার শুচিবাই রয়েছে, তাই এত দ্বিধা। এ সংস্কার আমাকে ভাঙ্গতেই হবে।

দশরথ করুণ চোখে কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে রইল। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ঃ তোমাকে আমার সমস্ত ঐশ্বর্য দিচ্ছি রাণী তুমি শান্ত হও।

পুত্র আমার ঐশ্বর্য। আমার বিশাল সাম্রাজ্য। তার তুলনায় তোমার দান তুচ্ছ! পুত্র তার পিতার অনুগ্রহ চায় না। সিংহাসনে তার ন্যায্য অধিকার। সে অধিকার থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করলে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গকে জনে জনে শুধাব, দশরথ সত্যভঙ্গকারী, আদর্শহীন রাজা। ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক, সে শঠ, প্রতারক· প্রতিশ্রুতি দিয়েও রক্ষা করে না।

দশরথ হতভম্বের মত কৈকেয়ীর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। খুব চিন্তিতভাবে চোখ টান টান করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঃ কিন্তু এই অপ্রিয় কার্য করলে আমি কৌশল্যাকে কি বলব? আমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করেছি তার অন্যথা কেমন করে করব? নানা দিক থেকে আগত নৃপতিদেরও বা কি কৈফিয়ৎ দেব? আমার অনুগত প্রজাকুলের কাছে কোন মুখে দাঁড়াব? রামের অভিষেকের সব আয়োজন সমাপ্ত। কল্য প্রভাতে শুভলগ্নে সিংহাসনে আরোহণ করবে। এখন কেমন করে তাকে বনগমন করতে বলব?

মহারাজ, তুমি নিজেকে সত্যবাদী বলে, দৃঢ়ব্রত বলে থাক, তাহলে কেন স্নেহান্ধ হয়ে সত্য ধর্ম লংঘন করবে। সবার উপর ধর্ম। ধর্ম লংঘন করলে লোকে নরকগামী হয়। এসব জেনেও তুমি কেন প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করতে চাও?

রাণী, আমি বৃদ্ধ। শেষ দশায় এসেছি। দীনভাবে বিলাপ করছি, তুমি করুণা কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই রাজ্য তুমি একহাতে গ্রহণ করে অন্যহাতে রামকে দান করে পরম যশ লাভ কর।

কৈকেয়ী হাসল। গালে তার টোল পড়ল। বাদামী রঙের কটা বড় বড় চোখ দশরথের মুখে স্থিরভাবে স্থাপন করে বলল ঃ আশ্চর্য তোমার সংস্কার জ্ঞান। অযোধ্যার সিংহাসনের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার এই শুচিবাই তুমি ত্যাগ কর। ধর্মজ্ঞানীরা বলেন, সবার উপর সত্যই পরম ধর্ম, আমি তোমার সহধর্মিণী হয়ে সেই সত্যধর্ম রক্ষার পরামর্শ দিচ্ছি। রামকে ডাক। তাকে বনে পাঠিয়ে ভরতকে অভিষেক কর। সত্য রক্ষা হোক। সত্য রক্ষার জন্যে শ্যেন পক্ষীর সঙ্গে কপোতের বিবাদ উপস্থিত হলে রাজা শিবি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে স্বীয় মাংস দান করেছিল। রাজা অলর্ক প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য নিজ চক্ষুদ্বয় অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করে দিব্যগতি লাভ করেছিল। সত্যব্রত রাজার অন্ধ স্নেহ মোহে ধর্মত্যাগ করে, রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা কখনও উচিত হবে না। সত্যের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় তোমাকেও জয়ী হতে হবে। সত্যধর্ম রক্ষা না করলে তুমি নরকগামী হবে।

বামনের বাক্যে বলি যেমন বদ্ধ হয়েছিল, দশরথও সেইরূপ কৈকেয়ীর বাক্যজালে জড়িয়ে পড়ল। অশ্বকে তীক্ষ্ন কশাঘাত করে যেমন আজ্ঞাধীন রাখা হয় তেমনি কৈকেয়ীর নির্মম বাক্যে দশরথও বশীভূত হয়ে রইল। ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল ঃ অদৃষ্টের বন্ধনে আবদ্ধ আমি। এর থেকে আমার মুক্তি নেই। আমাকে নিয়ে তুমি তাই যা খুশি করতে চাইছ। ব্যাপারটা এখানে শেষ হওয়া দরকার। এই মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে এবং পুত্র ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে সব সম্বন্ধ অস্বীকার করলাম। তোমাদের সঙ্গে আমার ধর্মবন্ধন শেষ হল। তুমি আর আমার কেউ নও। প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্বও আর রইল না।

আচমকা এরকম একটা কথায় কৈকেয়ী অবাক হল। দপ্ করে জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। আকস্মিক এই অপ্রিয় প্রসঙ্গে কিন্তু সে কথার খেই হারিয়ে ফেলল না। শুধু অস্থিরভাবে বার কয়েক তার মুখের দিকে কটমট করে তাকাল। তারপর তেজের সঙ্গে ঝাঁঝাল স্বরে বলল ঃ মহারাজ আমি কি তোমার খেলনা? ইচ্ছে হল খেললে, পছন্দ হল না ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এত সহজ লভ্য কিন্তু আমি নই। ক্রোধে তোমার মাথা ঠিক নেই। কি বলছ তুমি, ভাল করে জান না। মুখ ফস্কে কথাটা একবার বেরোল অমনি সব চুকে বুকে গেল। স্ত্রী ত্যাগ করা এত সহজ ঘটনা? রীতিমত অগ্নি সমক্ষে মন্ত্র দ্বারা শপথ করে পাণিগ্রহণ করেছ, হরপার্বতীর পাদস্পর্শ করে আজীবন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছ। সাত পাকের ফেরে ফেরে বাঁধা পড়েছে সে প্রতিশ্রুতি। সে বাঁধন ছেড়া তাই সহজ নয়। বিয়ের মত শক্ত বাঁধন আর কি আছে? এক অগ্নি সুমুখে রেখে আমরা মিলেছি, আর এক অগ্নিতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এই মিলনের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই। সুতরাং ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে কৈকেয়ীকে ভয় দেখানো যায় না। অনাদর করে ফেলে দেবে সেও আমি নই। তোমার দুর্মতি হয়েছে, তাই মুখে এমন কথা বলতে তোমার লজ্জা করল না। তুমি ধর্মত্যাগ করে অধর্মের পথে রামকে রাজ্য দিয়ে কৌশল্যার সঙ্গে সুখে বিহার করতে চাও। আমি এখন তোমার পথের কাঁটা। আমাকে নির্মূল করতে চাও। বেশ, প্রতিশ্রুতি যদি

না রাখ তবে আজই তোমার সুমুখে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব। বেঁচে থেকে স্বামীকে সত্যভ্রষ্ট দেখার চেয়ে মরণ অনেক ভাল।

পাপ সংকল্প ত্যাগ কর রাণী।

পাপ কেন হবে রাজা? পাপ অভিপ্রায় ছিল তোমার মনে। পুত্র ভরত তোমার অনার্যা জননীর সন্তান বলে আর্য পিতার সাম্রাজ্যের কোন অধিকার তুমি তাকে দিতে চাও না। তোমার নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই চলছে আর্য অনার্যের সীমারেখায়। দীর্ঘকাল ধরে তার প্রস্তুতি চলেছে তোমার মনের অভ্যন্তরে। আজ ধরা পড়ে গেল তোমার গোপন অভিপ্রায়। নিজের পাপ, অপরাধ, অধর্ম ঢাকতে তুমি আমাকে মিথ্যে তিরস্কাব করছ। কিন্তু ভেবে দেখ রাজা ইক্ষ্বাকুবংশে পাপ অধর্ম কে ঢুকিয়েছে? তোমার কর্মফলের জন্য তুমি দায়ী। আমি তোমাকে সেই অন্যায় অধর্ম থেকে নিবৃত্ত করছি। আমার পাপ কোথায়? আমার প্রার্থনা'ত কিছু অন্যায় নয়। তোমার প্রতিশ্রুতি তোমাকেই রক্ষা করতে বলা। একে পাপ সংকল্প কেন বলছ রাজা। তোমারই ঔরসজাত আর এক পুত্রকে ধর্মানুসারে রাজা করবে। সিংহাসনে তারই ন্যায্য অধিকার। সেই অধিকার থেকে তাকে জোর করে বঞ্চিত করতে চাইছ বলে, ধর্ম-সত্য-বিবেক ত্যাগ করতে হচ্ছে তোমায়।' আর নিজের মনে ক্ষত বিক্ষত হয়ে জ্বলছ। অথচ, প্রতিজ্ঞা পূরণ হলে সত্যরক্ষা পায়। তবু আর্য-অনার্য সংস্কার বশে ভরতের ন্যায্য অধিকার মেনে নিতে পারছ না। পিতার এই পক্ষপাতিত্ব থাকবে কেন? রামকে নির্বাসনে পাঠাতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে ভরত শত্রুঘ্নকে নির্বাসন দিতে তুমি কোন কষ্ট কিংবা দুঃখ, অনুতাপ বোধ করনি। আশ্চর্য তোমার বাৎসল্য! শুনে রাখ রাজা, জেদ রাখতে তুমি যেমন কৃতসংকল্প, আমিও তেমনি তোমাকে প্রতিজ্ঞা পূরণে বাধ্য করব।

কৈকেয়ী তুমি মানুষ নও। স্ত্রী জাতির কলংক। শঠ স্বার্থপর মেয়েমানুষ। নৃশংস, দুষ্টচরিত্রা। কুলনাশিনী, পাপিনী। রাম ও আমাকে বিনাশ করতে চাও রাক্ষুসী। দশরথের দুই চোখ লাল হল। উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তার।

কৈকেয়ীর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। অবিচলিত স্বরে বলল: মহারাজ, তুমি স্বামী। স্ত্রীদের যা খুশি করা এবং বলার অধিকার স্বামীদের একচেটিয়া। নারী হয়ে জন্মেছি। সমাজ'ত নারীকে অবলা সাজিয়ে রেখেছে। পুরুষের মত নারী অশালীন হতে পারে না। এসব অমার্জিত কথাবার্তা কিন্তু তোমার প্রেমের গৌরব প্রকাশ করে না। তোমার বুকের অন্তঃস্থলে লুকানো সত্যকে শুধু প্রকাশ করে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র সাক্ষী, তোমাকে আমি অপমান করিনি। কটু কথাও বলিনি। শুধু স্ত্রীর কর্তব্য করেছি। ধর্মের প্রতি স্ত্রীজাতির একটা অন্ধ আনুগত্য আছে। আমি তোমাকে সেই ধর্মপালন করতে বলেছি।

কৈকেয়ীর বাক্য দশরথের শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল দামামার মত। সেই রণবাদ্য যা অবশ্যম্ভাবী হল দুই বিপরীত মানসিক প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব সংঘাতে ও সংঘর্ষে।

মুখে চোখে তার বিহ্বলভাব। বুকের ভেতর অকস্মাৎ যন্ত্রণার সূত্রপাত হল। মাথার ভেতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাক থেতে লাগল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। পায়ের তলায় মাটি দুলছিল। দেহ টলছিল। চোখের চাহনিতে কেমন একটা অস্বাভাবিক অপ্রকৃতিস্থতা। তবু সে কষ্টের ভেতর কথাগুলো টেনে টেনে বলতে লাগল। তোমার বুদ্ধি অল্প নয়। ব্যাধ যেমন বধের আগে হরিণকে গানের দ্বারা আকৃষ্ট করে বধ করে তুমিও সেরকম প্রিয়বাক্যে আমাকে মুগ্ধ করে বধ করতে উদ্যত হয়েছ। এই অপ্রিয় কাজ করলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। তখন আমার ও রামের অভাবে তুমি আকুল হয়ে পড়বে। নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনা ভোগ করবে। অনুতাপে দগ্ধ হবে তোমার হৃদয়। রামের নির্বাসন যদি তোমার একান্ত অভিপ্রেত হয় তা হলে আমার মৃত্যু অবধারিত। রামের বনগমন হলে তুমি বিধবা হবে। তুমি কি সেই মৃত্যু দেখতে চাও? কেকেয়ীকে নিরুত্তর ও অধোমুখী দেখে দশরথ কাঁপতে কাঁপতে বলল: তা-হলে শুনে রাখ, আমার মৃত্যুর পর ডাইনীর পুত্র ভরতের প্রেতকার্যের কোন অধিকার থাকবে না। তুমি বিধবা হয়ে পুত্রের সঙ্গে সুখে রাজ্যভোগ কর।—এ কথা বলতে বলতে দশরথ ছিন্ন তরুর মত ভূতলে পতিত হল।

অনেকক্ষণ পর দশরথের মূর্ছা ভাঙল। জবা ফুলের মত লাল টকটকে দুই চোখে তখনও অপ্রকৃতিস্থতার ঘোর। স্বপ্নাতুর ঘোলা ঘোলা দুই মান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজছিল। এক এক করে চোখ রাখল সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, কৌশল্যা, সুমিত্রার মুখের উপর। কিন্তু রাম লক্ষ্মণকে কোথাও দেখল না। তাদের না পেয়ে হতাশ হল। কষ্টে দশরথের দুই চোখ বুজে এল। বোজা চোখ ফেটে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে অধীর হৃদয়াবেগ সংবরণ করল। তারপর ভেজা গলায় কাঁপা স্বরে বলল: সুমন্ত্র, আমার প্রাণাধিক রাম কোথায়? তার সব কুশল'ত?

সুমন্ত্র হাঁটু গেড়ে দশরথের সামনে বসল। বিভ্রান্তের মত দশরথের দিকে তাকাল। অনুসন্ধিৎসু চোখ দিয়ে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে দেখল দশরথকে। তারপর বলল: মহারাজ আপনি শান্ত হোন। কুমার তার নিজ গৃহেই আছে।

দশরথের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আস্তে আস্তে বলল: তোমরা'ত কেউ আমার খবর রাখ না। আমার আজকের দিনটা মোটে শুভ নয়।

দশরথের অসহায়তা সুমন্ত্রের হৃদয় স্পর্শ করল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল: আপনার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে দিনও ভাল কাটছে না।

সুমন্ত্রর কথা শুনে অদূরে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকা কৈকেয়ী যেন একটু খুশি হল। একটা দুষ্টু ক্ষণেক খেলা করে গেল তার মুখে। চোখের কৌতুক দৃষ্টি মেলে সে যেন উত্তরটা বেশ উপভোগ করল।

কিন্তু দশরথ এ কথায় মুখ তুলে তাকাল সুমন্ত্রর দিকে। ভুরু কুঁচকে গেল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় কাঁপতে কাঁপতে জ্বরাগ্রস্ত রোগীর ভাঙা বিকৃত গলায় বলল: মনের আর দোষ কি সুমন্ত্র? নিজের মত করে থাকবার উপায় নেই। কোন্ পাপে অজ্ঞানবশে

আমি কেকয় রাজকন্যার কণ্ঠলগ্ন হলাম বলতে পার ? কে জানত, এই ছোট রাণী থেকেই আমার সর্বনাশ ?

বাতায়ন পাশে দাঁড়িয়ে শুনল কৈকেয়ী। কিন্তু দশরথের কথার কোন উত্তর দিল না। এক পা এক পা করে সে এগোল দশরথের দিকে। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা নীরব গাম্ভীর্যে ঢাকা ছিল যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কেউ কটু মন্তব্য করতে পারল না। কৈকেয়ী ভ্রূকুটি করে বলল ঃ আমাকে গালমন্দ করাই তোমার কাজ। কিন্তু এই গালমন্দ করার কি কারণ হল, তা'ত এদের শোনালে না। আমার দোষের কথা ওদের শোনাও। স্বামী বলে যা খুশি অপমান করতে পার না তুমি।

দশরথ কথা খুঁজে পেল না। রুদ্ধ রোষে টকটকে লাল হয়ে গেল তার মুখ। কৈকেয়ী চুপ করে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা একটু ভেবে নিল। তারপর নির্ভয়ে সুমন্ত্রর দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গী করল। দশরথের কপটতার রহস্য বুঝতে পারার কৌতুকে তার হাসি দাঁতের ঝিকিমিকির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেল। বলল ঃ মহামাত্য সুমন্ত্র, জ্ঞানহারা হয়ে মহারাজ প্রলাপ বকছেন। তিনি প্রকৃতিস্থ নন। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের বিভ্রান্তি বাড়ে। আপনি রামকে একবার ডাকুন এখানে।

সুমন্ত্র কৈকেয়ীর দিক থেকে দশরথের মুখের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঃ দেবী, আমাকে অপরাধী করবেন না। আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। রাজাদেশ ছাড়া রামকে এখানে ডেকে আনার হুকুম নেই। মহারাজ আদেশ না করলে, আমি নিরুপায়—

কৈকেয়ী কিছুটা অপ্রতিভ ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টে বলল ঃ তা-হলে, আমাকেই যেতে হয়।

দশরথ বার দুই ঢোঁক গিলে তৎক্ষণাৎ বলল ঃ সুমন্ত্র, আমি রামকে দেখতে চাই। তুমি শীঘ্র তাকে ডেকে আন এখানে।

কৈকেয়ী হাসল। দারুন উত্তেজনার ভেতর তার মনে হল, এই লোকটার তার প্রতি একটা প্রবল দুর্বলতা আছে। নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সেটাকে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে সে। তাই, জুলুমের অন্ত নেই তার। প্রকারান্তরে দশরথের জন্যে তার জেদ অগাধ প্রশ্রয় পেয়েছে। এই মানুষটার জন্যে নিজেকেও সে উজার করে দিয়েছে। দেবতাকে যেমন উৎসর্গ করে, তেমনি নিজেকেও নিবেদন করেছে সে। কিন্তু তার আত্মনিবেদন স্বার্থে কলুষিত নয়। দশরথের স্বার্থপরতা তার প্রেমকে অপমান করেছে। দশরথের অবিশ্বাস, সন্দেহ, শঠতা, প্রবঞ্চনা কৈকেয়ীর কাছে সবচেয়ে বেদনাময় হয়ে উঠেছে। তাই আঘাত এত নির্মম আর কঠিন হল।

রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে সুমন্ত্র খুব দ্রুত বেগে রাজপথ অতিক্রম করে রাজভবনে উপস্থিত হল। রাম দশরথের কাছে গিয়ে দেখল তার মুখ শুষ্ক এবং বিষণ্ণ। রামকে দেখামাত্র দশরথের বুক ঠেলে একটা চাপা কান্না বেরিয়ে এল। ঠোঁট টিপে মুখ বিকৃত করে সে প্রাণপণে শব্দহীন কান্নায় বেশ সামলাতে লাগল। একটা দারুণ ব্যর্থতা এবং পরাভবের গ্লানিতে তার কষ্ট নিদারুণ হল। পিতার বিহ্বলতায় রামের

বক্ষ বিদীর্ণ হল। ব্যাকুলভাবে সেও নিঃশ্বাস ফেলছিল। পিতাকে প্রশ্ন করে রাম তার মর্মজ্বালা বৃদ্ধি করল না। অবাক চোখে তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দশরথের দিক থেকে সে কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। উদ্গত নিঃশ্বাস বুকে চেপে ধরে ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় জিগ্যেস করল ঃ ছোট মা, পিতার কি হয়েছে? অমন করছেন কেন? তাঁর শরীর মন ভাল আছে'ত? ছোট মা, তুমি কথা বলছ না কেন? অজ্ঞানবশে আমি কি পিতার কাছে কোন অপরাধ করেছি? কুমার ভরত, শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে ভাল আছে'ত?

কৈকেয়ীকে নিরুত্তর দেখে রাম পুনরায় প্রশ্ন করল ঃ দেবী, তুমি কি অভিমানবশে পিতাকে কোন রূঢ় কথা বলেছ? তুমি চুপ করে থাকলে যে জবাব পাই না। কথা বল। আমাকেই বা এখানে ডাকলে কেন?

রামের কথা শুনে দশরথের বুক কাঁপছিল। কৈকেয়ীকে নিয়ে দশরথের ভয় সব সময়। রাম জানে না, কৈকেয়ী কেন ডেকেছে তাকে? সরল মনে রাম তার মনোভাব ব্যক্ত করে যে মারাত্মক ভুল করল তা থেকে কৈকেয়ীর চিন্তা ও দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে আনার জন্যে সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। একবার 'হা রাম' উচ্চারণ করে মূর্চ্ছা গেল। আর কোন কথা বলতে পারল না। মূর্চ্ছা নয় মূর্চ্ছার ভান করল দশরথ। মহারাজার অবস্থা দেখে রাম চিন্তিত ও বিমর্ষ হল। আর্ত গলায় বলল ঃ পিতাকে কষ্ট দিয়ে আমি এক মুহূর্ত বাঁচতে ইচ্ছা করি না। আমিই বোধ হয় তাঁর মনোকষ্টের এবং আত্মগ্লানির কারণ। এখানে থাকলে মনোকষ্ট তাঁর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আমি বরং এস্থান ত্যাগ করে যাই ছোট মা।

কৈকেয়ীর পাষাণ হৃদয় দশরথের জন্য একটুও বিচলিত হল না। তার মূর্চ্ছা যাওয়া ঘটনার প্রতি কোন আগ্রহ নেই কৈকেয়ীর। অবাক চোখে সে দৃশ্যটা দেখল। বুকের ভেতর তখন প্রমত্ত বাতাসের অস্থিরতা তার। এক পলক তাকাল রামের দিকে। রামের কথার মধ্যে যে গভীরতর ইঙ্গিত ছিল তা সে বুঝল। কিন্তু তা নিয়ে প্রশ্ন করল না। তবে, তার কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব ভাবটা কেটে গেল। ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাব থেকে কৈকেয়ী যেন জেগে উঠল। অনুচ্চ স্বরে রামের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বলল ঃ কোথায় যাবে? এত ব্যস্ত কেন? অভিষেকের শুভ লগ্ন এখনও দেরী অনেক। ঝড় ঝাপ্টাত বাড়ীর বড় ছেলেকে সামলাতে হয়। প্রবাদ আছে, বড় গাছেই ঝড় বাধে। সবে ঝড়ের সূচনা। মহারাজার আশা ভরসার দীপ ঝড় না বইতেই নিভে যাবে? কৈকেয়ীর মৃদু স্বরে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষের ঝাঁজ।

কৈকেয়ীর বাক্যে রাম মর্মাহত হল। ধীর স্বরে বলল ঃ আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলছ কেন? তুমি কি আমার ছোট মা? তোমার স্বর শুনে আমি চিনতে পারছি না কেন? তুমি কে? তোমার কণ্ঠে ও কার স্বর?

রামের আতঙ্কিত উদ্বেগ হঠাৎ কৈকেয়ীর মুখ রুদ্ধ রোষে টকটকে লাল হয়ে উঠল। রাগলেও সেই রাগ রামের উপর প্রকাশ করল না। কিছুটা সময় নিয়ে সে নিজে সামলে নিল পরিস্থিতিটা, একটুক্ষণ ভেবে নিল। কথাগুলো কিভাবে সাজালে

ভাল হয়, ধার ভার দুই বাড়ে—এ সব স্থির হয়ে গেলে হঠাৎ চোখে একটু বিস্ময়াবোধ ফুটে উঠল। গম্ভীর হয়ে বলল ঃ মহারাজের তোমাকে কিছু বলবার আছে। কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। আর সে জন্যই একটা দুর্বিষহ কষ্টে তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অস্ফুট একটা শব্দ করল রাম। তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বলল ঃ পিতার মনস্তাপ দূর করার জন্যে যা যা করা দরকার আমি করব। তাঁর এই কষ্ট আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না। পিতার জন্যে আমি সব করতে পারি। কোন কিছুতেই ক্লেশ বোধ করব না!

কৈকেয়ীর উজ্জ্বল চোখে কৌতুক খেলা করছিল। রাম বড় বড় চোখে চেয়ে কৈকেয়ীকে নিঃশেষ করে দেখল। রাম টের পাচ্ছিল, একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, তার স্বরূপ হয়ত বুঝতে পারছিল। আবার পারছিলও না। আলো আঁধারের সীমা-রেখায় সে দাঁড়িয়েছিল। তাই ভেবে কুল কিনারা করতে পারছিল না।

লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে দশরথ পাথর হয়ে গিয়েছিল। বজ্রাহতের মত স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক চোখে সে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছুক্ষণ তার কোন জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ আত্মসম্বিৎ পেয়ে তীক্ষ্নস্বরে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করে বলল ঃ মানুষের মনের নোংরামি দেখলে আমার ভারী ঘৃণা হয়। পৃথিবীতে তোমার মত কুশ্রী মানুষের কোন প্রয়োজন নেই। তবু তোমরা জন্মাও। সুখের সংসার পুড়িয়ে ছারখার করে দাও।

সকলের সম্মুখে দশরথ কৈকেয়ীকে তিরস্কার করলে তার মুখ লজ্জায় রাঙা হল। অবাক স্বরে বলল ঃ রাজার পাপেই নগর পোড়ে এ কোন নতুন কথা নয়। তুমিই বহু কিছুর জন্যে দায়ী। তোমার লোভ, পক্ষপাতিত্ব, কপট স্নেহ, কূট রাজনীতি, রক্ত সংস্কার, বিভেদ নীতি, এ সব না থাকলে সমস্যার কথা কেউ বুঝতে পারত না। এই পরিবারের ভিতরে ভিতরে যে বিভেদ, বিদ্বেষ, ও অবিশ্বাস জন্মেছে বহু দিন ধরে তা তোমার তৈরী। তুমি এর স্রষ্টা। আজকের এই অবস্থার জন্যে আমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। তোমার ধর্মাধর্ম জ্ঞান, ন্যায়বোধ যে কেমন, তা আমি জানি। তোমাকে আর সাফাই গাইতে হবে না।

কৈকেয়ীর কথায় দশরথ চুপ করে রইল। তার বুকের ভেতর ধরফড় বাড়তে লাগল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। মুখ চোখ রাগে লাল হল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে একটি প্রতিবাদও করল না। খুব শান্ত হয়ে রইল। তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং থমথমে।

পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল রাম। সে বুঝতে পারছিল, এতদিন যা জানত সে তার সব যথার্থ নয়। কিছু রহস্য আছে। কিন্তু সে গভীর রহস্যের উৎস কোথায়, পরিষ্কার হচ্ছিল না তার। রাম কৈকেয়ীর দিকে তাকাচ্ছিল না। জানলার ধারে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ প্রকৃতির মৌন শান্তরূপ দেখছিল। কুয়াশা মাখা অন্ধকার ভুতুড়ে ছায়ার মত তেড়ে এল চারিদিক থেকে।

বাস্তব হারিয়ে গেল এক রহস্যময় কুহেলিকায়। সরয়ূর বুক থেকে হু হু করে এক ঝলক বাতাস এসে ঘরে ঢুকল। দূরে এক পাল শেয়াল গলা মিলিয়ে ডেকে উঠল প্রহর জানাতে।

রাম নিজের মনেই চমকে উঠল। অমঙ্গল আশংকায় তার বুক তোলপাড় করল। বোবা বিস্ময়ে সরল চোখে কৈকেয়ীকে পলকের জন্য দেখল। কৈকেয়ীর দেহে দুকুল ছাপানো যৌবন এখনও অটুট। একদিন ঐ রূপের চুম্বক আকর্ষণে পিতা মজেছিল। আর, তার নগদ দাম আদায় করতে কেকয়রাজ পিতাকে এক অলিখিত শর্তে দায়বন্ধ করল। এ কথা বশিষ্ঠ তাকে ইংগিত করেছিল মাত্র। কিন্তু সব ঘটনা জানে না সে। তবে পিতার উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা, ভয়, সংশয় দ্বিধা, অনুশোচনা, আপশোষ থেকে সে শুধু অনুমান করতে পেরেছিল যে, অযোধ্যার সিংহাসন ভরতের। কিন্তু সে অধিকার ন্যায়সংগত কিংবা ধর্মসম্মত ছিল না। পিতার নিছক একটা মারাত্মক মোহ, আর তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের একটা বেপরোয়া কৌতুকের ফলশ্রুতি ছিল। সেই বিষফল ভক্ষণের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। কক্ষের পরিবেশের ভেতরে ঘটনার বিষণ্ণ রেশটুকু সে খুঁজতে থাকল। অগাধ বিস্ময় নিয়ে সে একবার দশরথের দিকে একবার কৈকেয়ীর দিকে তাকাল। কৈকেয়ী আর জননী নেই। দুই চোখ তার অঙ্গারের মত ধক্‌ধক্‌ করছিল। মুখেতে নেই প্রসন্ন ত্যাগের সুখ ও শান্তির লালিত্য। ভাষাতেও নেই নিজের ভেতরের মহত্ত্বে জেগে উঠার বাণী। তার উক্তিতে নগ্ন স্বার্থপরতা আর ধূর্ততা প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু আবেগবশতঃ সে তা না বুঝে পিতার কষ্ট লাঘবের জন্য যে কোন ত্যাগ এবং দুঃখ বরণ করতে প্রতিশ্রুত হল। নির্বোধের মত সে তার অভীষ্ট লাভের পথকে প্রশস্ত করে দিল। নিজের এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে তার ভেতরে ভেতরে অনুতাপ হচ্ছিল। আর তখনই মনে হল নিয়তিই হয়ত কৈকেয়ীরূপে তাকে রাজ্যহীন করতে এসেছে। এ তার ভাগ্য। বিশ্বামিত্রও বলেছিল, বনবাস তার অদৃষ্টের লিখন। সীতাও পরম সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলত: এত সুখ কি সইবে স্বামী? সব সময় আমার ভয় করে। ভাগ্যে আমার বনবাস আছে—তুমি থাকলে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু চোখে তার জল এসে যেত। এ কি সেই বনবাসের সংকেত? তার অদৃষ্টের লিখন? এ থেকে কি তার মুক্তি নেই? তবু বিধিলিপির বঞ্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত করার স্বপ্ন সাধ দুইই ছিল তার। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! তাই আত্মশক্তি, সাহস, পৌরুষত্ব বীর্য দিয়ে সে প্রতিকূল অবস্থাগুলি একে একে জয় করেছিল। তারপর পিতা যখন গুরুভার চাপাতে চাইল তখন ভাবল ভাগ্য প্রসন্ন। কিন্তু অবস্থা দেখে রামের মনে হল নিয়তি কৌতুক করেছে তার সঙ্গে। নইলে, নিজের জননী অপেক্ষা ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে যাকে জয় করল সেই ভরত জননী কেন এত নিষ্ঠুর পাষণ্ড হলে? কৈকেয়ীর চণ্ডালিনী রূপ সে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

রাম স্থির চিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা থম থম করছিল। কৈকেয়ী অপলক চোখে রামের দিকে তাকিয়ে সেই নিস্তব্ধতাকে অনুভব করল। দূরে শিয়ালের প্রহর ঘোষণার ডাক এই নিস্তব্ধতাকে আরো গভীর ও বিষণ্ণ করে তুলল।

প্রসঙ্গটা খুব লজ্জাজনক, তাই কৈকেয়ী একটু দ্বিধাগ্রস্ত। ভেতরে ভেতরে সে শক্তি সংগ্রহ করার জন্যে চুপ করেছিল। এই নীরবতার মধ্যে দশরথ গলার স্বর নামিয়ে মিন মিন করে বলল ঃ ভরত জননী, আমাদের দাম্পত্য কলহের মধ্যে রামের কোন স্থান থাকার কথা নয়। ওকে যেতে দাও। স্বামী স্ত্রীর কথার মধ্যে অনেক কিছুই হয়, সবটা পুত্রদের কানে না যাওয়াই ভাল।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ার মত দপ্ করে জ্বলে উঠল কৈকেয়ী। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বলল ঃ হ্যাঁ, পুত্রদের নিয়ে যখন কথা, তখন অবশ্যই থাকতে হবে তাদের। অপ্রিয় হলেও রাম জানুক, অযোধ্যার সিংহাসন তার নয়, ভরত এ রাজ্যের রাজা। রাম লক্ষ্মণের তার দীনতম প্রজা হওয়ারও অধিকার নেই। ভরতকে তারা শত্রুর চোখে দেখে। ভায়ে ভায়ে শত্রুতার পরিণাম ভয়ংকর। সুতরাং রাম লক্ষ্মণের বনে যাওয়াই ভাল। মহারাজ নিজের মুখে সে কথা বলতে আত্মগ্লানি অনুভব করছেন। এই মুহূর্তে জটা বল্কল পরে পিতার আদেশ মত বনে গমন কর। বৎস রাম, তোমার এই পুরী না ছাড়া পর্যন্ত তোমার পিতা স্নানাহার, পান কিছু করছে না।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হল সেখানে। দশরথ আর্তস্বরে ককিয়ে উঠল। দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল ঃ উঃ কি ভীষণ নিষ্ঠুর! কি মর্মান্তিক বাক্য! হৃদয় আমার বিদীর্ণ হচ্ছে। বক্ষ জ্বলে যাচ্ছে। উঃ বড় কষ্ট। ধিক্ ধিক্! রামচন্দ্র পালাও—পালাও। এ মানুষের আবাসস্থল নয়, রাক্ষুসীর বাসস্থান। আমি বৃদ্ধ, অশক্ত, অসহায় পিতা তোর। সাধ্য নেই রাক্ষুসীর মুঠি থেকে মুক্ত করব তোদের। আমাকে অভিশাপ দিয়ে তোরা চলে যা। মতলববাজ, লোভী পিতাকে তোরা ঘৃণা কর। অবজ্ঞা কর। আত্মধিক্কার আর ঘৃণায় পাগলের মত আচরণ করতে লাগল দশরথ। পুঞ্জীভূত অনুতাপে, আত্মানুশোচনায় মাথায় করাঘাত করতে লাগল। আমি কী করেছি। উঃ, এ আমি কি করলাম! ঈশ্বর, কোন্ পাপে আমার এই সর্বনাশ হল?

রাম নির্বাক পাথরের মূর্তি। দেহে যেন প্রাণের স্পন্দন নেই, সমস্ত মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই। মুখেতে কঠিন রেখা পড়েছিল তার। অনুভূতিশূন্য মূর্তির মত তাকিয়েছিল রাম। সে কিছু ভাবছিল না। শুধু দাঁড়িয়েছিল। তার নির্বাক ক্ষমাহীন দুই চোখে মরুভূমির জ্বালা। শূন্য দৃষ্টি ধু ধু করছিল। আর বুকের ভেতর মনে হচ্ছিল হাড় পাঁজরগুলো ধরে ধরে যেন ভাঙছে কেউ?

রামের এমন পাথর মূর্তি আগে কেউ দেখেনি। কিন্তু রামের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে শুধু চেয়ে আছে কৈকেয়ীর দিকে। কয়লার টুকরোর মত জ্বলছিল তার দুই চোখ।

কৈকেয়ী রামের দিকে তাকিয়ে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। থেকে থেকে তার মনে হতে লাগল রাম নিঃশব্দে অভিযোগ জানাচ্ছে তার প্রতি। তাকেই সে যেন দায়ী করছে। রাম এরকম একটা ভাবছে মনে হতেই সে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ল। নিজেকে তার ভীষণ একা এবং অসহায় মনে হল। দুঃসহ একাকীত্ব থেকে উত্তরণের পথ খোঁজবার জন্যে বলল ঃ মহামাত্য সুমন্ত্র, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রামের

জন্য আপনি অত্যন্ত কাতর হয়েছেন। কিন্তু আপনার এই ভাবালুতা শোভা পায় না। দ্রুতগামী অশ্বে ভরতকে মাতুলালয় থেকে আনতে এখনি দূত পাঠানোর সব আয়োজন করুন। রামের স্থলে ভরতকে অভিষিক্ত করে মহারাজের সত্যরক্ষা করুন।

কৈকেয়ীর বাক্যে রাম সম্বিৎ পেল। বুকের অতলান্ত থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস নামল। বুকের ভেতরটা তার মোচড় দিল। মনে মনে অবিরাম একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজল রাম। কেন? কেন, কৈকেয়ীর এই বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে তার এ ক্ষোভ? এর মূল কোথায়? বুকের ভেতর এসব কোনদিন লুকানো ছিল না তার ছোট'মার। থাকলে সে তার আভাস পেত। রাম ভাল করেই জানে ছোটমা কোন কথা লুকোতে জানে না। তাহলে, এসব তাকে কে বলল? রাম তার নিজস্ব প্রজ্ঞাবলে বুঝল, রাজঅন্তঃপুরের খুব গভীরে ষড়যন্ত্রের শিকড় ছড়ানো আছে। নইলে, পিতাকে এমন করে দাঁড়িয়ে অপমান করার মানুষ নয় কৈকেয়ী।

কৈকেয়ীর বক্তব্যের পর আরো কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। রাম বিভ্রান্তের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার চুলে এলেমেলো বাতাস এসে লাগল। ঊর্ধ্বমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে কি যেন ভাবল। একটা আবেগ তার ভাবনার ভেতর গলা বেয়ে উঠে এল। বলল: দেবী রাগ কর না। এই কেলেংকারীটা না করে নিজে কেন ভরতের অভিষেকের কথা আমাকে বললে না। পিতার আজ্ঞায় কেন, তোমার আজ্ঞাতেই আমি ভরতকে নিঃসংকোচে সিংহাসন, রাজ্য, ঐশ্বর্য সব দিতে পারি। এমনকি নিজের এই তুচ্ছ প্রাণটা পর্যন্ত। শুধু একবার আদেশ করে দেখলে না কেন?

কৈকেয়ীর ওষ্ঠে আচমকা তড়িৎপ্রবাহের মত একটা হাসি খেলে গেল। মনের সমস্ত জোর দিয়ে সে উচ্চারণ করল: চমৎকার অভিনয় জানো রামচন্দ্র। তোমার ভরত প্রেম কোথায়? তাদের বাদ দিয়ে'ত চুপি চুপি নিজের অভিষেক সেরে ফেলেছিলে। এখন ধরা পড়ে মহত্ত্বের অভিনয় করছ। সুন্দর তোমার অভিনয় জ্ঞান! আমার পুত্রদের প্রতি যার এত উপেক্ষা, এত উদাসীনতা তার কুম্ভীরাশ্রু প্রদর্শন মর্মান্তিক দুঃখের এবং যন্ত্রণার। নিজপুত্রের এই অপমান, অবহেলা চোখে দেখতে না পেরে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি! এই পরিবারে এবং রাজ্যে আমার পুত্রদের যে একটা স্থান আছে, তুমি বা তোমার পিতা কখনও মনে কর না। আমি শুধু তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আবেদন করেছি। প্রতিশোধ কিংবা প্রতিহিংসা বশে কিছু করিনি। মনেতেও সে অশুভ চিন্তা স্থান দিইনি। দাবির ধাক্কায় পরিবারের বহুকালের নিয়মটা ভেঙে গেল। তোমার পিতার কপটতার মুখোশ খুলে গেল। এই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানটির ছত্রচ্ছায়ায় যে সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবিরোধী, সংকীর্ণ-মনা মতলববাজ বাস্তব ঘুঘু আছে তাদের বাসস্থানটি ভেঙে অযোধ্যাকে মুক্ত করেছি। তার গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছি। এ রাজ্য শুধু আর্যর নয়, মিলিত আর্য-অনার্যর রক্তধারায় গঠিত এক অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর দেশ। এ-দেশ শাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীত্ব ভরতের পাওয়ার কথা। দেরীতে হলেও মহারাজ সেই দায়িত্ব ভরতকে দিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

কৈকেয়ীর বাক্য রামচন্দ্রকে পুনরায় নীরব করে দিল। কিন্তু লক্ষ্মণের গলায় বাজ ডাকল। এইভাবে গোটা পরিবারের সম্মান বিপন্ন করে এক নজিরহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনের কোন অধিকার তোমার নেই।

কেকেয়ীর অবিচলিত স্বরে দৃঢ়তা। কেন লক্ষ্মণ, বাঁচার অধিকার সকলের আছে। আমি'ত বাঁচার অধিকারে নিরুপায় হয়ে তোমার পিতাকে সত্যভ্রষ্ট হতে দিইনি। অধর্ম থেকে তাকে বাঁচার পরামর্শ দিয়েছি। এতে আমার কোন অন্যায় হয়নি। মাতার পুত্রের দাবি প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করা'ত কোন গর্হিত কর্ম নয়। নিত্য পরিবর্তনশীল রাজধর্মে রাজা কারো স্থায়ী পরিচয় তো নয়। যে কেউ তা হতে পারে। সব সময় বংশধারা প্রথা মেনে চলতে হবে তার কি মানে আছে? মহারাজ যযাতি'ত কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনের যোগ্য মনে করে অভিষেক করেছিল।* ভরতের যোগ্যতা রামের চেয়ে কোন অংশে কম নয়?

কিন্তু রামের জন্যে তোমার একটুও মায়া হল না।

এই মায়া দেখানোর চেয়ে জননীর কাছে তার নিজ সন্তানের দাবি অনেক বড়। তার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব জননী কৈকেয়ীকে কর্তব্য সচেতন করেছে। তাই বারংবার মনে হয়েছিল রামের উপর মায়া দেখাতে গেলে মহারাজের ধর্ম রক্ষা হয় না, ভরত তার ন্যায্য অধিকার হারায়। রাজনীতিতে মায়া, স্নেহ, ধর্ম বলে কিছু নেই।

লক্ষ্মণ কি জবাব দেবে? কৈকেয়ীর কথার মধ্যে যে গভীরতার ইঙ্গিত ছিল তা বুঝে সে নিরুত্তর হল।

অতঃপর রাম জননী কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য পরিজনদের নিকট বিদায় নিয়ে, প্রভূত ধনরত্ন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, সেবক, বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ এবং বন্ধুদের বিতরণ করে সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে মহারাজ দশরথের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করল।

লোকমুখে রামের আকস্মিক অযোধ্যা পরিত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক রামের প্রাসাদের সামনে ভীড় করল। জনতা ভেদ করে পদব্রজে দশরথের প্রাসাদে যাওয়া রামের কঠিন হল। সেনাধ্যক্ষরা বিমর্ষ বিষণ্ন জনতাকে ঠেলে রাম লক্ষ্মণ এবং সীতার চলার পথ করে দিতে লাগল।

রাম রাজপুরীতে এলে সুমন্ত্র তাকে নিয়ে দশরথের কক্ষের দিকে গেল। সে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আগে আগে চলল। অনেক সিঁড়ি অতিক্রম করে, লম্বা লম্বা বারান্দা পার হয়ে দশরথের কক্ষেতে এল। দ্বারে পা দিয়েই কক্ষের অভ্যন্তরে দশরথের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। থমকে দাঁড়াল সেখানে। দশরথ বিষণ্ন গলায় বলছিল: কৈকেয়ী

* যযাতি চন্দ্রবংশের রাজা। চন্দ্রবংশ (মহাভারত) ও সূর্যবংশ (রামায়ণ) থেকে ইক্ষ্বাকুবংশের উদ্ভব। এই হিসাবে রামায়ণ কাহিনীর বহু আগেই উল্লিখিত যযাতির উপাখ্যান ছিল।

তুমি কোনদিন আমার কোন অসুবিধে বুঝলে না। কোনটা আমি ভালবাসি আর বাসি না সেটা জেনেও তুমি সব সময়ে অপছন্দের কাজটা আমাকে দিয়ে করাতে চাও। এই যে কাজটা করলে, এতে তোমার কি গৌরব বাড়ল ? তুমিও ছোট হলে, আমারও মাথা হেঁট হল। এই যে, বাইরে থেকে অতিথিরা এসেছেন, তাঁরা বা কি ভাবল ? কি কৈফিয়ৎ দিয়ে ফিরে যেতে বলব তাঁদের ? কোন মুখে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াব ? ইক্ষ্বাকুবংশের সব গৌরব, খ্যাতি আমার হাতে ধূলিসাৎ হল। এই দুঃখ রাখার জায়গা নেই আমার। এ তুমি কি করলে কৈকেয়ী ? একবার কি তোমার শ্বশুরকুলের কথা ভাবলে না ? যে মাটি থেকে রস শোষণ করছ সেই মাটির রস শুকিয়ে গেলে, কি করে বাঁচবে ? এত হঠকারিতা কর না। আমি তোমার সব দাবি মেনে নিয়েছি ; তুমিও রামকে নির্বাসনের দণ্ড দিয়েছ, রামও তা মেনে নিয়েছে—আমার সত্যধর্ম রক্ষা হয়েছে। ব্যস্, এবার'ত রামকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে আর বাধা নেই। তুমি নিজের হাতে তাকে রাজবেশ পরিয়ে দাও, ললাটে রক্ত তিলক এঁকে দিয়ে সিংহাসনে অভিষেক কর। চতুর্দিকে তোমার জয়জয়কার পড়ে যাবে। অযোধ্যার সম্মান বাড়বে, তোমার গৌরব এবং যশ অম্লান থাকবে। তুমি শুধু প্রসন্ন হও রাণী। তোমার করুণার সাগর থেকে রাম যদি একমুঠো ফেনা নিয়ে যায় তা' হলে সাগর কি রিক্ত হবে ?

কৈকেয়ীর মুখে কিছু কোমলতা ফুটল। যেমন শিশুর প্রগলভতা দেখে মায়ের মুখে কৌতুক সঞ্চার হয় অনেকটা সেরকম। তাতে অপরূপ হয়ে গেল কৈকেয়ীর মুখ। শুধু চেয়ে থাকল দশরথের চোখের দিকে। কক্ষ নীরব। নিঃশ্বাস পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়।

এই অবকাশে সুমন্ত্র ঢুকল। রাজপুরীতে সুমন্ত্রর ছিল অবাধগতি। সব কক্ষেই তার যাওয়া আসার দ্বার অবারিত। তাই, নির্বিকারভাবেই সে কক্ষের ভিতর পা রাখল। কৈকেয়ীকে দেখেও ভ্রূক্ষেপ করল না। ত্রস্তভাবে বলল ঃ মহারাজ রাজকুমার রামচন্দ্র আপনার দর্শনপ্রার্থী। দ্বারের বাহিরে লক্ষ্মণ ও সীতাসহ তিনি অপেক্ষারত। অনুমতি করলে, তাঁদের এখানে আনতে পারি।

অকস্মাৎ উচ্চকিত রক্তের চাপে দশরথের চোখ মুখ রাঙা হয়ে গেল। দুরন্ত আবেগে ও উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। বুকের ভেতর একটা অস্থিরতা। চকিতে শয্যার উপর উঠে বসল। কৈকেয়ীর দিকে রক্ত নয়নে তাকিয়ে বলল ঃ এ তুমি কি করলে রাণী ? আমার বুকের পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে। তাকে বনবাসে পাঠিয়ে আমি কেমন করে বাঁচব ? আমার ইহ বল, আর ইষ্টই বল—সব রামচন্দ্র ? তাকে ত্যাগ করলে আমার আর কি রইল ? তুমি শুধু একবার আমাকে করুণা কর, আমাকে ক্ষমা কর। রাজধর্ম, সত্যধর্মের উপর পিতৃধর্ম। আমাকে সে ধর্মভ্রষ্ট করে তুমি অপরাধী কর না। দয়া কর কৈকেয়ী। আমি পিতা।

কৈকেরী প্রস্তর মূর্তিবৎ আচ্ছন্ন। তার অটল ইচ্ছের উপর যেন খিল তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বন্ধ দরজার ওধারে যেন নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার কোন চাঞ্চল্য নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। কৈকেয়ী যেন দশরথকে দেখতে পাচ্ছে না, তার স্বর

শুনতে পাচ্ছে না। দশরথও তার অশক্ত দেহটা নিয়ে বন্ধ দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার খিল ভাঙতেও পারছে না। মাথা কুটেও যেন সাড়া পাচ্ছে না। নিদারুণ অসহায়তা বোধে মুষড়ে পড়ে সে কৈকেয়ীর ইচ্ছের দরজার উপর মাথা রেখে মৃদু কিল দিতে দিতে চাপা গলায় মিনতি জানাতে লাগল।

দশরথের আকুল আকুতির সুস্পষ্ট কোন উত্তর কৈকেয়ীর জানা ছিল না। তার নির্বিকার ভাবলেশহীন মূর্তির কঠোরতার দিকে তাকিয়ে দশরথ চমকে উঠল। বুকের ভেতর থেকে একটা শ্রান্ত নিঃশ্বাসের ভার নামল। দশরথকে অবসন্ন ও বিমর্ষ দেখাল। দুই চোখে তার কি করুণ অসহায়তা, কি গভীর মায়ায় ছলছল। অথচ তার কিছু করার নেই। নিদারুণ অসহায়তাবোধে ছটফটিয়ে উঠল বুকের ভেতর। কৈকেয়ীর নিথর নীরবতায় তার কান্না পেল। চোখ ভেঙে নামল অশ্রুর বন্যা। ভেজা গলায় দশরথ সুমন্ত্রকে বলল ঃ সুমন্ত্র, বৃশ্চিক ক্রোধের বশে বিষপুচ্ছ শিরে হেনে নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। তেমনি আমার ভুলেই আমার সর্বনাশ হচ্ছে। এই মনস্তাপে কষ্ট পাচ্ছি। বুকে আমার হলাহলের জ্বালা। ছোট রাণীর কাছে আমার সব আবেদন, মিনতি নিস্ফল। এখন একমাত্র ভরসা তুমি। রামকে ফেরাও। তার বনবাস বন্ধ কর। তাকে এখানে আন। সে আমার দেহজ, আত্মজ। আমার অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে। তার ক্ষমা কিংবা করুণা না পেলে আমার হৃদয় জ্বালা জুড়োবে না। তুমি তাকে শীঘ্র ডাক এখানে।

দশরথ থরথর করে কাঁপছিল। পালঙ্কের বাজুতে পিঠ রেখে সে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ। চোখের পাতায় একটা হাল্কা নীল রঙের ছোপ পড়েছে। ঠোঁট শুকনো, মুখ সাদা। নরম বিছানায় আধশোয়া ডুবন্ত শরীরটা স্খলিত, শীর্ণ, শান্ত, স্থির। ফর্সা সুন্দর দেহটার কি দশা হয়েছে!

দৃশ্যটা দেখে রামচন্দ্র শিউরে উঠল। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। রামচন্দ্র দৃষ্টি সরাতে পারছিল না। কৈকেয়ীও নির্নিমেষ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। রামচন্দ্রের মনে হল, কৈকেয়ী তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। তাই তার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হয়েছে। ইচ্ছে সত্ত্বেও কথা বলতে পারছে না কেন? জিহ্বা আড়ষ্ট, ঠোঁট শুকনো কেন?

রাম শয্যার খুব কাছে সরে এল। অসহায়, বিকারগ্রস্তের মত ডাকল ঃ পিতা!

দশরথ চোখ খুলল। অবসন্ন শরীরটা বিছানার উপর নড়ে উঠল। রামের দিকে তাকাবে কি! দু'চোখ তার জলে ঝাপ্সা হয়ে গেল। রামের দিকে দু'খানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্খলিত ভেজা স্বরে বলল ঃ আয় বাবা, কাছে আয়। বুক আমার খাঁ-খাঁ করছে। মরুভূমির মত শূন্য এই বুকে তোরা আমার মরূদ্যান। তোদের ছেড়ে আমি থাকব কি নিয়ে? কার উপর অভিমান করবি বাবা? আমি তোর বৃদ্ধ অক্ষম অসহায় পিতা। আমাকে কাঁদিয়ে তুই কোথায় যাবি? তোকে ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে?

রামের মুখ বিবর্ণ হল। পিতার ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাস তার ছিল না। তবে,

বুকে তার এক প্রগাঢ় যন্ত্রণার থাবা গেড়ে বসেছিল। কোন ব্যথা বেদনা কিংবা জ্বালা নয়। একটা দুঃসহভারে হৃৎপিণ্ডটা যেন ঝুলে পড়ছিল। আর তার মর্মবিদারী কষ্টে তার শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হল। আসন্ন বিচ্ছেদের একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছিল কক্ষে। রাম তার সঙ্গে একটা দূরত্ব রচনা করার জন্য যথাসম্ভব নিজের হৃদয়াবেগকে সংযত করল। গম্ভীর মুখে চেয়ে রইল দশরথের দিকে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল। সহসা স্বরভঙ্গ ঘটল তার। ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল ঃ পিতা সময় বয়ে যাচ্ছে, আমাকে বিদায় দাও। আশীর্বাদ কর বনবাসান্তে আবার তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি।

দশরথের কণ্ঠ থেকে এক অদ্ভুত আর্তস্বর নির্গত হল। একমাত্র পরিজনহীনতার চরম বিচ্ছেদের কষ্টে হাহাকার করে উঠা বুকের শূন্যতা থেকে সে স্বর শুধু বেরোয় শিশুর মত অসহায় সে কান্না। উহুঃ—উহুঃ—

এরকম শূন্য অসহায় বিষণ্ণ কান্নার শব্দ রাম আগে শোনেনি। তার পায়ের নীচে মৃদু একটা ভূকম্পন টের পাচ্ছিল। অপ্রতিরোধ্য হৃদয়াবেগ হতে উৎসারিত স্বরে এক প্রবল সম্মোহন ঃ পিতা!

সরু স্বরে কেঁদে উঠল দশরথ ঃ রাম। কত আদরের তুই আমার—

পিতা, ধর্ম সবার বড়। আমাকে রাজ্যত্যাগের অনুমতি দাও—

পুত্র, শৈশব গেছে, যৌবন গেছে এখন এল বার্ধক্য। এই বার্ধক্যে তোমার বিচ্ছেদ আমি সইতে পারব না। আমি অশ্বপতিকে মোহগ্রস্ত হয়ে শপথ করেছি। তাতে শুধু কৌতুক ছিল। সত্য ছিল না। তাকে লংঘন করলে ধর্মের অমর্যাদা হয় না। ধর্ম কি খেলার বস্তু?

সুমন্ত্র বিষন্ন মুখে উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়েছিল। অনেক উল্টোপাল্টা যুক্তিহীন কার্যকারণ তার মনের ভেতর তোলপাড় করছিল। দশরথের কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল। একটা বড় শ্বাস পড়ল। জড়তা বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে। বলল ঃ ঠিক কথা; রাজ্য কারো খেলার সম্পদ নয়। যখন যাকে খুশি তাকে দান করতে পারে না রাজা। রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করতে হলে রাজাকেও তাঁর মন্ত্রণা পরিষদের অনুমতি নিতে হয়। রাজ্য বহু স্বার্থের মিলিত প্লাটফরম। রাজার অধিকার নেই, নিজের মর্জিতে যা খুশি করার।

কৈকেয়ী তার নীরব স্তব্ধ গাম্ভীর্য থেকে যেন জেগে উঠল। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। সুমন্ত্রর দিকে চোখ টান টান করে বলল ঃ আমাত্য প্রধান সুমন্ত্র, রাজনীতি শাস্ত্রে আপনার জ্ঞানের দীনতা আমাকে লজ্জা দিচ্ছে। নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে আমিও অনভিজ্ঞ নই। রাজতন্ত্রে রাজা একেশ্বর। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজের কাজের জন্য কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না তাঁর, কিংবা কোন কৈফিয়ৎ দিতেও বাধ্য নন তিনি। রাজতন্ত্রে রাজাই সব। তার মুখের কথাতে ওলোট পালোট হয়। মহারাজ হরিশচন্দ্র নিজের প্রতিশ্রুতির মর্যাদায় বিশ্বামিত্রকে সর্বস্ব অর্পণ করে ভিখারী হল কার অনুমতি নিয়ে? বামনের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়েও বলিরাজ কিন্তু

তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য নির্বাসন মেনে নিল ; তথাপি তার আমাত্যদের কেউ প্রশ্ন করল না ; এ ছলনা,—এ প্রতারণা মানতে বাধ্য নয় রাজা। রাজার কার্যের প্রতিবাদ করার অর্থ হল আনুগত্য হীনতা দেখানো। এ ধৃষ্টতা বেয়াদবীকে কোন বীর্যবান তেজস্বী রাজা সহ্য করে না। নিবীর্য অযোধ্যা মহারাজেরই সে সহিষ্ণুতা কেবল আছে।

কৈকেয়ীর নগ্ন আক্রমণাত্মক জবাব সুমন্ত্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে আর কোন কথা বলতে পারল না। প্রগাঢ় বোবা যন্ত্রণায় তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল।

কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে বিরক্তি, ঘৃণা ফুটে উঠল। কৈকেয়ীর কথাগুলো ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত লক্ষ্মণকে নাড়া দিল। তার সর্বশরীর আলোড়িত হল। উত্তেজিত আচ্ছন্নতায় কাঁপছিল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল। চাপা গর্জন করে বলল ঃ ছিঃ। ছিঃ। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না হয়। তুমি মা ডাকের অযোগ্য। নির্বোধ, অহংকারী, ক্ষমতালোভী। স্নেহ, দয়া, মায়া, করুণা, প্রেম তোমার শরীরে নেই। তোমার নিঃশ্বাসে শরীরের রক্ত শুকিয়ে যায়। চোখের আগুনে রাজ্য পুড়ে যায়। তুমি ডাইনী হয়েছ। ডাইনীর বাঁচার কোন অধিকার নেই। ডাইনীর পাপে রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল হয়। তোমাকে তীক্ষ্ন শরে বধ করে আমি অযোধ্যার কলুষ দূর করব। যারা ভরতের পক্ষে আছে তাদের সকলকে বধ করব। যা ন্যায়তঃ রামের প্রাপ্য তার উপর অন্যের অধিকার আমার জীবন থাকতে বসতে দেব না।

লক্ষ্মণের মুখচোখ লাল হল। সর্বশরীরে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। ধনুঃশর হাতে করে সে কাঁপছিল। তার অনলবর্ষী দুই চোখের দিকে তাকিয়ে কৈকেয়ী নির্বিকারভাবে গম্ভীর স্বরে বলল ঃ পুত্র তীর ধনু দিয়ে সব কিছু ফয়সালা হয় না। সত্য কখনও চাপা থাকে না। বৃথা আস্ফালন না করে রামকে প্রশ্ন কর—কার জন্যে এই দুর্ঘটনা ? কে দায়ী ?

লক্ষ্মণের কাঁধের উপর রামের হাত। মৃদুস্বরে ভৎর্সনা করে বলল ঃ ছিঃ। জননীকে হত্যা করতে তোমায় হাত উঠল ?

লক্ষ্মণ সক্রোধে বলল ঃ জামদগ্নমুনির আজ্ঞায় পুত্র পরশুরাম কুঠারে মাতা রেণুকার শিরচ্ছেদ করেছিল। আমিও জ্যেষ্ঠের সম্মানে বিমাতাকে যদি হত্যা করি অপরাধ কোথায় ? শাস্ত্র বলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য।

রাম লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তিতে বিমোহিত হয়ে মৃদুস্বরে ভৎর্সনা করে বলল ঃ ছিঃ লক্ষ্মণ! গুরুজনকে কটুবাক্যে অসম্মান করা তোমার মত বীরের শোভা পায় না। আমার প্রতি তোমার গভীর স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আছে জানি। কিন্তু সে ভালবাসা অন্যকে অসম্মান করে কখনও নয়। পিতা একবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করতে পারে না। আমাদের বংশেই মহারাজ সগরের আদেশে তাঁর পুত্রেরা ভূমি খনন করতে গিয়ে প্রাণ হারাল, তবু পিতৃ আজ্ঞা কোন অজুহাতে লংঘন করেনি কেউ। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমন্তপঃ—একথা তুমি ভুলে গেলে ?

আমার দুর্ভাগ্য অদৃষ্টের লিখন। ছোট মা, পিতা শুধু উপলক্ষ্য। দৈবের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কে?

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সিংহের মত গর্জন করে উঠল। বলল: পুরুষ তার পুরুষকার দিয়ে দৈবের চক্রান্ত ব্যর্থ করে। দৈবকে বাধা নিয়ে অকৃতকার্য হলে, কখন নিরুদ্যম হয় না সে। উদ্যম সৌভাগ্যের মূল। দৈব নিবীর্যের সান্ত্বনার মন্ত্র, দুর্বলের আত্মরক্ষার ধর্ম। কিন্তু বীর কখনও দৈব বিড়ম্বনায় অবসন্ন হয় না।

রামের অধরে বিচিত্র হাসি। চাহনিতে মুগ্ধ বিহ্বলতা। পৌরুষ মানে দম্ভ নয়, বাহুবল নয়, বলপ্রকাশের শক্তিও নয়। অন্তর্নিহিত এক অব্যক্ত শক্তির আশ্চর্য তেজ, বুদ্ধি, সাহসের দৃঢ়তা, বিক্রম, মহত্ত্ব এবং মধুর ও কঠোর চরিত্রগুণের সমন্বয়। হীরকের দ্যুতিই পুরুষের পৌরুষ। দৈবও তদ্রূপ। তাকে চোখে দেখা যায় না। কর্মফল ছাড়া তাকে নিরূপণ করা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, তার সঙ্গে যুদ্ধ করব কি দিয়ে?

রামের বাক্য মুগ্ধ করল কৈকেয়ীকে। নিজের নিষ্ঠুরতায় সেও ক্লান্ত। নিজেকে তার ভীষণ একা লাগছিল। তথাপি, নিজের অসম্মান, অমর্যাদার বেদনা ভুলতে পারছিল না। আবার, রামকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভরত তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে সেও সহ্য হচ্ছিল না। রামের অবিশ্বাস, সন্দেহ, কপটতা, দশরথের প্রতারণা, শঠতা, ক্রুরতা যতক্ষণ মনে থাকবে ততক্ষণ তার সঙ্গে মনের লড়াই শেষ হবে না; এটা বেশ বুঝতে পারছিল কৈকেয়ী। লড়াইটা তার নিজের সঙ্গে বহু কিছুর। অনুভূতিশীল মনের মধ্যে এইরকম একটা ভাবাবেগ ক্রিয়া করছিল। চোখে একটু বিস্ময় বোধও ফুটেছিল।

আকস্মিক ঘটনার গভীরতা রামের চিন্তার জগতে আলোড়ন জাগাল। নিজেকে তার এক অদৃশ্য বন্ধনের ক্রীড়নক মনে হল। কারণ, যে ঘটনায় তার নিজের কোন কার্যকরী হাত নেই, অথচ তারই দায়িত্ব এসে কাঁধে ভর করল, প্রতিটি আকস্মিক ঘটনার মধ্যেই একটা রহস্য ছিল যা তার জ্ঞান হওয়ার মুহূর্ত থেকেই দেখতে পায়। একদিন যে নারী তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন—শ্রদ্ধাপূর্ণ, স্নেহস্নিগ্ধ হঠাৎ তার আচরণ এমন বিপরীত হল কেন? কৈকেয়ীত এত অনুভূতিহীন নয়। তাহলে? একটা বিদ্বেষ অনিবার্যভাবেই তার মনে গ্লানির সৃষ্টি করল। তাই, কথা বলতে বলতে থেমে গেল। ভীষণ যন্ত্রণাকর মনে হল নিজের অবস্থা।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। ঐ সময়টুকু ধরে কক্ষে নিথর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। লক্ষ্মণের ভ্রূকুটি তীব্র চোখের দিকে তাকিয়ে রাম অসহায়ভাবে বলল: পিতা—পিতৃসত্য রক্ষা এবং বিমাতার নির্দেশ পালন করতে লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যবহার আমি বনে যাচ্ছি। আপনারা উভয়ে আমাকে অনুমতি করুন। বনবাস অন্তে আবার যেন আমরা পুনর্মিলিত হই, এই আশীর্বাদ করুন।

দশরথের বক্ষপিঞ্জর বিদীর্ণ হল। একটা দম আটকানো কষ্টে সে খামচে ধরল। হু-হু করে প্রবল কান্না বুকের তল থেকে যেন ঠেলে উপরের দিকে উঠে এল।

দশরথের মুখ অশ্রুতে মাখামাখি হল। মস্তকে করাঘাত করে বলল: হায় পুত্র, আমার কর্মফলের জন্যে তোমার এই নিদারুণ এই ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে। আমি মোহগ্রস্ত হয়ে কি বলতে কি বলেছি জানি না। কিন্তু সে আমার প্রাণের কথা নয়। এক নিষ্ঠুর মিথ্যে। তবু সেই কথাই সত্য হবে? অপ্রকৃতিস্থ মাতালের সঙ্গে কামপরবশ পুরুষের কোন প্রভেদ নেই। উভয়ের শপথ সমান অগ্রাহ্য। তা-হলে তুমি অকারণ বনে গমন করবে কেন?

রাম দশরথের যুক্তি শুনে নতুনতর অস্বস্তিবোধ করল। সিংহাসন নিয়ে এই দ্বন্দ্ব জমে উঠবার আগে পর্যন্ত একটা সুন্দর কোমল অনুভূতির স্নিগ্ধ আবেশ তাকে মুহূর্মুহূর্ চমকে দিচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানের বাস্তব অবস্থা তাকে এক চরম সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। সিংহাসনের ব্যাপার নিয়ে প্রতিটি কথাই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর সংবাদের মত। যা তার অপরাধকে কৈকেয়ীর কাছে কেবল বাড়িয়ে তুলছিল। কেকেয়ীর চোখে সে লোভী, স্বার্থপর আদর্শহীন এক শঠ-প্রতারক হয়ে উঠেছে এটা সে বেশ আন্দাজ করতে পারছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করে এদের চুপ করানো ছিল আরো শক্ত। কোন যুক্তি, কৈফিয়ৎ তারা মানতে চায় না। তাই, তার বিড়ম্বিত মুখের অপ্রস্তুত হাসিতে অপরাধবোধের ছায়া পড়ল। ম্লান মুখে বিষণ্ণ স্বরে বলল: পিতা স্নেহবশে সত্যভ্রষ্ট হয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমিও তা পারব না করতে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সত্যের জন্যে প্রিয়তমা পত্নী ও একমাত্র প্রিয়তম পুত্র রোহিতাশ্বকে ত্যাগ করেছিলেন। আপনি ধর্মজ্ঞ। আপনার ব্যাকুলতা শোভা পায় না। আমাকে অনুগ্রহ করে বিদায় দিন।

অমন কথা মুখে উচ্চারণ করা পাপ। এরাজ্যের এখনও পর্যন্ত আমি রাজা। তুমি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভুজবলে অযোধ্যা জয় করে তুমি বন্দী কর আমায়। তারপর এরাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ কর। সিংহাসন তোমার হোক। আমিও সত্যভ্রষ্ট হব না।

দশরথের যুক্তিতে রাম বিব্রত বোধ করল। অসহায়ভাবে বলল: পিতা প্রলোভনে আমাকে বন্দী করো না। সিংহাসনে আমার মোহ নেই। অরণ্য আমাকে ডাকছে। আমাকে বিদায় দাও।

দশরথের হৃৎস্পন্দনের তালে বেজে উঠল: অরণ্য আমায় ডাকছে। অবাক জিজ্ঞাসু চোখে কেকেয়ীর দিকে তাকাল। রুদ্ধশ্বাসে বলল: কৈকেয়ী শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি বধির? এ কথা শোনার পরও তোমার হৃদয় ফেটে চৌচির হচ্ছে না? রামকে ফেরাও। অভিমানী পুত্র আমার তার ছোট মা'র উপর অভিমান নিয়ে চলে যাচ্ছে,—এদৃশ্য তুমি দেখতে পাচ্ছ? একবার ওকে নিষেধ কর। বল, ফিরে আয় আমার নয়নমণি।

দশরথের আকুল আবেদন কেকেয়ীর বুকে সঞ্চারিত হল। কিন্তু তা আপাতত আড়াল করে নারীর নিজস্ব অহংকার ও আত্মাভিমান জেগে উঠল। মনের নেপথ্যে যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল যার খবর নিজেও জানত না সেই আগুন মূর্ত হয়ে উঠল

তার চোখের দৃষ্টিতে। মুহূর্তে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। নির্বিকার মুখে চতুর হাসির ধার। বলল ঃ তোমরা সকলে রামকে সিংহাসনে বসাতে ব্যস্ত। ফেরানোর জন্যে কত টানাটানি করছ, তবু সে ফিরছে না। আর আমার কথায় সে রাজি হবে, এরকম ধারণাটা হল কেন? রাম'ত কারো কৃপা চায় না। তবে, কৃপা দেখিয়ে কেন তাকে অপমান করব? আমাকে অসম্মান করার সুযোগ রামকে দেব কেন? তারও যেমন আত্মসম্মানবোধ আছে, আমারও আছে। আমি জননীর সম্মান চাই, বিশ্বাস চাই, ভালবাসা চাই। কারো কাছে বিশ্বাসী ভালবাসার দাবিতে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে চাই নিজেকে। কিন্তু রামের ভেতর সেই জগৎ কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না? তার বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। মনের তার কোন আশ্রয় নেই। প্রাসাদের চৌহদ্দির বাইরে সে দিনযাপনে ব্যগ্র হয়েছে। রাজধানীতে থাকার আগ্রহ তার কমেছে। আত্মসম্মানের প্রশ্ন তার কাছেও বড় হয়ে উঠেছে। তবু সাহস করে, আমার কাছে তার দোষ কবুল করতে পারল না। জোর করে আমার স্নেহের সিংহদ্বারে আঘাত হেনে তার দাবির কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না। কেন পারল না? তোমরা সবাই চাইছ রামকে। কিন্তু কারো কথা সে শুনছে না, শুনবেও না। তার হৃদয়ে তোমাদের জন্যে সে ভালবাসা কোথায়, পিতার প্রীতি তার কর্ত্তব্য, মায়ের উপর বিশ্বাস কোথায়? অরণ্য তাকে ডাকছে। তাই, তোমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ওকে ফেরার কথা বলতে পারছি না। আমার কাছে ওটা তত বড় মনে হচ্ছে না।

চুপ কর। ধমকে উঠল দশরথ।

দশরথের কথা শুনে কৈকেয়ীর মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। তিক্ত কণ্ঠে বলল ঃ রাজা, বনবাস রামের অদৃষ্ট লিখন। পুত্র বিরহের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা তোমার অন্ধমুনির অভিশাপ। রামের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তুমি চিরকাল ভরত শত্রুঘ্নকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এই যন্ত্রণা দিয়েছ। আজ চোখের সামনে তোমাকে যখন সেই আগুনে পুড়তে দেখছি তখন ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। এত সুখ, তৃপ্তি জীবনে কখনও পাইনি।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সে কিন্তু নির্বাক। মাথা নিচু করে ঝড়ের ঝাপটা সামলাচ্ছিল। কৈকেয়ীর অভিযোগগুলির এমন একটা নির্মম সত্য ছিল যা অগ্রাহ্য করা শক্ত। তার কথাগুলোর ভেতর একটা প্রবল জ্বালা আছে—কি যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব চাপা রয়েছে। যা বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণা নয়, রাগ বিরাগ বা হিংসা নয়। তবু তার ঝাঁঝ অগ্রাহ্য করা শক্ত। তার মুখের ভাব ভাষা একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা হল বিশ্বাস। বিশ্বাস ভঙ্গের জ্বালায় জ্বলছে তার স্নেহ ভালবাসা। কি অপূর্ব জ্যোতির্ময়রূপ কৈকেয়ীর। রাম মুগ্ধ হল। মনে হল তার স্নেহের ধারায় অবগাহন করে যে তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছিল, আজ তা অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল তার জীবনে। এই প্রাপ্তিকে সে কিছুতে ছোট হতে দেবে না। মুগ্ধতাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে লোভীর মত সিংহাসনের জন্যে ব্যবহার করতে রামের পৌরুষে, আত্মসম্মানবোধে এবং মনুষ্যত্ববোধে বাধল। তাই নিরাবেগ চিত্তে নির্বাসনকে মেনে নেবার জন্যে যন্ত্রবৎ

পিতাকে প্রণাম করে বলল ঃ পিতা, কর্ত্তব্যপালনের জন্যে আপনাকে ছেড়ে যেতেই হবে। আমারও মন কেমন করছে। বিশেষ করে আপনার জন্যে, মাতা কৌশল্যা এবং সুমিত্রার জন্যে। কিন্তু স্বার্থের সঙ্গে যখন সংঘাত বাধে তখন পিতা পুত্রও তফাৎ হয়ে যায়। তফাৎ যদি এখন না হই তাহলে হয়ত তিক্ততার সৃষ্টি হবে। সেই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগে আমি এই স্থান ছেড়ে যেতে চাই। একটা বৈরাগ্য এসেছে আমার মনে। এই বৈরাগ্য আমাকে শক্তি দিচ্ছে লোভ জয় করতে। ত্যাগের মধ্যেও যে একটা আনন্দ সুখ আছে তাও নিবিড় করে অনুভব করতে পাচ্ছি। বনবাসে আমার কোন কষ্টই হবে না। অরণ্যভুমি বিরাট। যে কোন মানুষ সেখানে নিজের স্থান করে নিতে পারে। আমরাও পারব।

রামের কথায় সকলের মুখ গম্ভীর, বিষাদগ্রস্ত দেখাল, কেউ কোন কথা বলল না। কৈকেয়ীর চোখে মুখে আর উত্তেজনা নেই। দশরথের মধ্যেও নেই পূর্বের অস্থিরতা। কিন্তু অশ্রুতে তার দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে দশরথের গলা থেকে স্খলিত অস্পষ্ট স্বর উচ্চারিত হল। উত্তেজিত ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ঃ সুমন্ত্র, কর্তব্য বড় নির্মম। রাম তার সঙ্গে কোন সন্ধি করল না। নিরাপত্তার জন্য রামের সঙ্গে চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিয়ে দাও। অরণ্য বিশেষজ্ঞ ব্যাধদের অবশ্য পাঠাবে তার সঙ্গে। উত্তম আয়ুধ, শকট, অশ্ব, ধন রত্ন দিতে ভুলো না যেন। ঋষিদের উপযুক্ত দান-দক্ষিণা দিয়ে তাদের আশ্রমে রামের দিনযাপনের ব্যবস্থা কর। হৃৎপিণ্ডের কষ্টকে সর্ব-শক্তিতে নিঃশ্বাসে সংহত করল দশরথ। বুকের ভেতর ধক্ ধক্ করে বেজে যায় জীবনের স্পন্দন, কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ে না। ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল চেতনা। চোখের তারায় কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নতা। ক্ষণেকের জন্যে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দেহটা একবার দোল খেল এধার ওধার। তারপর মৃগী রোগীর মূর্ছা যাওয়ার মত ধপ করে নরম বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

রামের বনগমনের ছয়রাত্তির পর দশরথের প্রাণ বিয়োগ হল। কেকয় থেকে ভরত শত্রুঘ্ন প্রত্যাবর্তন করেনি। পুত্রদের কেউ রাজপুরীতে নেই বলে দশরথের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মত দিল না মন্ত্রীরা। বশিষ্ঠের পরামর্শে রাজার শবদেহ বিবিধ আড়কে ভিজিয়ে স্ফটিকপাত্রে রাখা হল।

অযোধ্যা থেকে কেকয় ছয় দিনের পথ। অযোধ্যার রাজদূত কেকয়ে পৌঁছনোর পর দশরথের মৃত্যু হল। কিন্তু অশ্বপতি দূতের আগমন বৃত্তান্ত আগে থেকেই জেনেছিলেন। তাঁর গুপ্তচর বাহিনীর দৃষ্টি খুবই সজাগ। গোপন পথে তারা তীরবাহী

সংবাদদাতার মাধ্যমে অশ্বপতিকে অযোধ্যার সব খবর দিল। এমন কি দশরথের মৃত্যু অবধি।

দূতের সঙ্গে ভরত-শত্রুঘ্নকে যখন অযোধ্যায় প্রেরণ করল তখন দৌহিত্রদের সঙ্গে ছোট-খাট এক চতুরঙ্গ বাহিনী পাঠাল অশ্বপতি। ভরতের তাতে আপত্তি ছিল। কিন্তু অশ্বপতি তার কোন আপত্তিই শোনেনি। উত্তম হস্তী, দ্রুতগামী অশ্ব, পদাতিক, অশ্বারোহী সৈনিক, রথ, বাছা বাছা বীর যোদ্ধা, ভীষণদন্তী কুকুর, বেশ কিছু পদস্থ, বিশ্বস্ত কূট রাজনৈতিক কর্মী ও আমাত্য তার সঙ্গে পাঠাল। এসব যে অশ্বপতি কেন করলেন, ভরত তার কিছুই জানল না।

বহু নদী, পর্বত, অরণ্য, জনপদ অতিক্রম করে ছয়রাত্তির পর ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যা রাজ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু তাদের আগমনের জন্যে অযোধ্যার কোন সাজসজ্জা চোখে পড়ল না। কৌতূহলী জনতার ভীড় ছিল না পথে। বলতে গেলে রাজপথ ফাঁকা। দু'চার জন দর্শক যা চোখে পড়ল, ভরতকে দেখে তারা অধোবদন হল। কেউ মাথা নিচু করে দ্রুত স্থানান্তরে গমন করল। অনেকে দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। কেউ বা অশ্রু গোপন করতে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকল। জনতার এরকম অস্বাভাবিক আচরণ ভরতকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। আশ্চর্য হয়ে ভাবল, রামচন্দ্রের মত সেও প্রজাগণের প্রিয়। কিন্তু তারা এমন বিমর্ষ কেন? তাদের অন্তর থেকে হর্ষ, উল্লাস কে বা কারা হরণ করল? তাদের মুখশ্রী মলিন কেন? অকস্মাৎ তাদের হল কি? সকলে নিরানন্দ, নিঃশব্দ, গম্ভীর দুঃখে মুহ্যমান কেন? তাদের বোবা চাহনি নীরব প্রতিবাদ কার-বিরুদ্ধে? অথচ অযোধ্যায় থাকাকালে এইসব নামহীন সাধারণ মানুষের দল তার মিষ্টি স্বভাব ও মধুর আলাপের জন্য কত না উল্লসিত হত? আজ তাদের এই পরিবর্তন কেন?

রথ যথাসাধ্য দ্রুতবেগে চলছিল! তবু ভরতের মনে হল, সময়ের গতি দীর্ঘ আর মন্থর। পথ যেন ফুরোতে চায় না। রথ যেন চলছে না। বড় ধীর বড় শ্লথ। ভরত অধৈর্য হল। অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা তার মাথায় ভীড় করল। তার ভেতর দশরথের চিন্তাটা স্থায়ী হল। যত ভাবে তত বুকটা বিপদে উথাল পাথাল করে আর চোখ ভরে যায় জলে। পিতা বৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর জন্যেই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। অকস্মাৎ কিছু হওয়া তাঁর আশ্চর্য নয়। হয়ত বা তাই হয়েছে, নইলে, অযোধ্যার এই শ্রীহীন অবস্থা কেন হবে? ভরত দুরু দুরু বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরল। ভিতরে ভিতরে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল: সারথী, আরো জোরে, আরো জোরে।

অমনি সপাসপ, চাবুক পড়ল অশ্বের পিঠে। চাবুক খেয়ে অশ্ব বিপজ্জনকভাবে দৌড়তে লাগল।

সরযূর ধার ঘেঁষে সটান যে সড়ক গেছে সেই রাস্তা বরাবর রথ ছুটল। এই দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও সে অন্যমনস্ক হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির রূপ দেখছিল। অনিদ্রা-জনিত জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, প্রকৃতি কেমন শান্ত, নির্বিকার, নিজের আনন্দে মশগুল। মানুষের বিপদ, উদ্বেগ, অশান্তি, দুঃখ, যন্ত্রণার

প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এক কণা সহানুভূতি পর্যন্ত না। গাছপালা, নদী, আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, পাখি, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গের এমন উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা শঙ্কা কিংবা উদ্বেগ নেই। কেবল মানুষের যত দুর্ভাবনা, আর কষ্ট।

শহরে ঢুকে ভরতের মন আরো খারাপ হল। এ দিকটা আরো নির্জন। পথি পার্শ্বের গৃহগুলো থেকে নারীদের আর্ত্তহাহাকার ভেসে এল। পুরুষেরা বাতায়নে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যে কটু কথা উচ্চারণ করল। পথচারীরা থমকে দাঁড়িয়ে দ্রুত ধাবমান রথের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে বলল: ফিরে যাও রাজপুত্র। অযোধ্যার কেউ নও তুমি। অযোধ্যায় কোনকালে তুমি থাকনি। এ দেশের প্রতি তোমার দরদ, মমতা কিছু নেই। অযোধ্যা এই শ্রীহীন হল কার পাপে? কে দোষী? হীন মাতার কপট পুত্র তুমি। তোমাকে ধিক্কার। তোমার কৃতঘ্নতার তুলনা তুমিই।

শহরের মানুষের এরকম অসৌজন্য, অশোভন বাক্যে ভরত মর্মাহত হল। অপমানে মুখ-চোখ রাঙা হল। লজ্জাও পেল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্তিমিত গলায় দূতকে জিগ্যেস করল: শহরের মানুষ এসব কথা বলছে কেন? তাদের কথা শুনে আমার মন বড় অস্থির আর উতলা হয়েছে। আমার ভীষণ ভয় করছে। পিতার কিছু হয়েছে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। তুমি সত্য করে বল—পিতা কেমন আছে?

দূত হঠাৎ কথা বলতে পারল না। লজ্জায় মাথা নিচু করল। কুণ্ঠার সঙ্গে বলল: বৃদ্ধ পিতার ভাবনার উদ্বেগে আপনার মনটা কেমন হয়ে গেছে।

ভরত শশব্যস্ত হয়ে বলল: চিন্তার কারণ তো বটেই। একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত মনটা কেমন করে ঠাণ্ডা হবে?

আর কোন কথা হল না। কেবল উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল ভরতের। মনের ভেতর দুর্ভাবনার বর্ষণ নামল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। চাপ চাপ অন্ধকার নামল। আকাশে চাঁদ নেই। অন্ধকার গভীর, গাঢ়, নিরেট। নীলাকাশ জুড়ে অসংখ্য তারারা মৌন বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে পৃথিবীর তমিস্রার অলৌকিক রূপ। থম থমানো স্তব্ধতার মধ্যে এক তীব্র উৎকর্ণতা। নিঝুম নিস্তব্ধ চারদিক। অন্ধকারের বুকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ঝিল্লীর ঝংকারে নিরন্তর বুক ফাটা হাহাকার। অন্ধকার বৃক্ষ শাখার অন্তরালে নিশাচর বিহঙ্গের পাখা ঝাপ্টার শব্দ, সব মিলিয়ে একটা অলৌকিক ভয় ভয় ভাব পরিবেশে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ। ভরত শত্রুঘ্ন দুজনে নীরব। কারো মুখে কোন কথা নেই। দু'জনের মুখে এক অসহায় উদ্বেগ ফুটল। একটা চকিত দিগ্ধ কষ্ট তাদের আচ্ছন্নতার মধ্যে স্থায়ী হল। এ এক আশ্চর্য কষ্ট। যার কোন অভিজ্ঞতা তাদের নেই। এবং তার সঙ্গে একটা ভয় ভয় ভাব তার বুকের মধ্যে আমূল প্রোথিত হল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসার স্তব্ধ অন্ধকারে আশঙ্কা জাগল।

অযোধ্যার প্রাসাদে রথ থামল। ভরত শত্রুঘ্নকে অভ্যর্থনা করতে কেউ এগিয়ে এল না। সে সব ভ্রূক্ষেপ না করেই দু'ভাই রথ থেকে লাফিয়ে নামল। তারপর, কোনদিকে না তাকিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত একরকম দৌড়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

পিতাকে গৃহে দেখতে না পেয়ে ভরত জননী গৃহে প্রবেশ করল। স্বর্ণ পালঙ্কে কৈকেয়ী নীরব হয়ে বসেছিল। পরিচারিকাদের একজন চামর ব্যাজন করছিল, অন্যেরা পদসেবা এবং চুলবিন্যাস করে দিচ্ছিল। তাদের পরিচর্যা, সেবা ও আরামের মধ্যে ডুবে গিয়ে কৈকেয়ী তার সান্ধ্য তন্দ্রায় মগ্ন রইল। অকস্মাৎ ভরতকে সেখানে উঁকি দিতে দেখে কৈকেয়ীর মুখের রূপ ও রঙ বদলে গেল। নিজের অজান্তেই বেশ হাস্যময় প্রশান্তিতে তার চোখ ও মুখ দীপ্ত হল। অন্ধকারের ভেতর সহসা আলো দেখলে যে ভরসা জাগে অনেকখানি সেরকম একটা আনন্দ ঝলকে উঠল তার মনেতে।

ভরতের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরিচারিকারা প্রস্থান করল। ভরত কৈকেয়ীর সামনে দাঁড়াল। মুখে তার অদ্ভুত শান্ত হাসির অভিব্যক্তি। দুই অপলক কালো চোখের বড় বড় পাতার ছায়ার মধ্যে হাসি তার উপছে পড়ল। ঠোঁটের কিনারায় দীঘির জলের মত খুশি টলটল করছিল।

ভরত অল্প সময়ে বেশ খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে থাকল। তার মুখ উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় কাতর। তাকে খুব উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। চোখে মুখে একটা আশ্চর্য বিহ্বলতা। কষ্টের ছায়া তার নিশ্চল স্তব্ধ মূর্তিটিকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাই, তাকে খুব স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন একটা নিষ্প্রাণ ছবির মত মনে হচ্ছিল। তার চোখে মুখে কোন আবেগ ছিল না। তার শান্ত, স্তব্ধ, নির্বাক চোখের দিকে তাকাতে কৈকেয়ীর ভয় ভয় করছিল। মনের অসহায় অবস্থাটা কাটিয়ে উঠার জন্যে মৃদুস্বরে প্রশ্ন কবল ঃ এত দেরী হল কেন বাবা? পথশ্রমে তোকে ভীষণ ক্লান্ত এবং বিমর্ষ দেখাচ্ছে। এখন হাত মুখ ধুয়ে স্নান করে বিশ্রাম নাও। তারপর, কেকয়ের সংবাদ শুনব। পিতা অশ্বপতি এবং ভ্রাতা যুধাজিতের কুশল 'ত?

ভরত নির্বাক। আতঙ্কিত শঙ্কা ও উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় বিহ্বলতা তাকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখল যে জননীর প্রশ্ন তার মনকে স্পর্শ করল না। কোন সাড়া দিল না সে। নিজের জিজ্ঞাসায় সে স্তব্ধ; নির্বাক। তার দৃষ্টি ছিল কৈকেয়ীর মুখের উপর।

কেকেয়ীর প্রশ্নে কক্ষের গাম্ভীর্য কিছুমাত্র নষ্ট হল না। বরং তা স্বাভাবিক হয়ে এল। ভরত শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল। বুকের ভেতর থেকে একটা পাষাণ ভার যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে নামল। কিন্তু তাকে খুব বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছিল। অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল ঃ পিতা কোথায়? ভরতের কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ন সন্দেহে দৃঢ় গম্ভীর, কঠিন

কৈকেয়ীর বুকটা থর থর করে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বুকটা তার হঠাৎ কেমন করে উঠল। বারবার মনে হচ্ছিল, এবার একটা কিছু হবে, কিছু ঘটবে, জীবনে একটা মোড় ফিরবে। কিন্তু কোন দিকে ঘুরবে, সেটাই কেবল জানে না। জানবে কোথা থেকে? পুত্রদের সঙ্গে একসাথে থাকলে যেভাবে মায়ে পোয়ের বোঝাপড়ার সম্পর্ক স্নেহ ভালবাসায়, শ্রদ্ধায় নিবিড় হয় পুত্রদের সঙ্গে তার' সে হৃদয় বন্ধন হয়নি বলে মনের ভেতর একটা সর্বদা আতংক আর শংকা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। সন্তানেব উপর জননীর যে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস এবং সরল আস্থা থাকে

কৈকেয়ী চেষ্টা করেও বুকের ভেতর তার ভরসার ক্ষেত্র তৈরী করতে পারছিল না। আর সেজন্যই একটা কুণ্ঠা আর সংকোচে তার মনটা দীন হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা নত হল। নিজেকে মনে হল জননী হিসাবে সে কত নিঃস্ব, কত অসহায়, আর কি ব্যর্থ। ভরতের ছোট্ট জিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়া যে এত নিদারুণ হয়ে উঠবে জীবনে ও মনে সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। পুত্রের মঙ্গল এবং করুণার কথা চিন্তা করে সে যা করেছিল তা যেন এই মুহূর্ত্তে সব অপরাধ হয়ে উঠল তার কাছে। ভরত যেন তাকে অপরাধী করে আসামী করেই প্রশ্নটা করেছে। মনের সে কষ্টে চোখে বুজতেই চোখের কোল ভরে গেল জলে।

নির্বাক জননীর অশ্রু ভেজা মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নিজের মনও আর্দ্র হল। ভেজা গলায় বলল : কি হল জননী ; কথা বলছ না কেন ? অযোধ্যা আজ বিষণ্ণ কেন ? সে কি পিতৃহীন হয়েছে ?

কৈকেয়ী সহসা নীরব হয়ে গেল। কারণ ভরতের মধ্যে পিতা সম্পর্কে তার নিজের স্নেহ, মমতা, উৎকণ্ঠার একটা অনুভূতি কাজ করছে। এখন ভরতের মুখোমুখি হয়ে যে জায়গায় সে দাঁড়িয়ে সেখানে একটু অসতর্ক হওয়া বিপজ্জনক। ফলাফল কি হবে বা হতে পারে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ভরতের বুকে উৎকণ্ঠার সমুদ্র উদ্বেলিত। কৈকেয়ী স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিল পিতাকে ঘিরে আশঙ্কা, চাঞ্চল্য অস্বস্তি, বেদনা আরো কত কিছুতে টাটাচ্ছিল তার বুক। এই অবস্থার ভেতর কৈকেয়ী কি করবে ? কিভাবে কথা বললে পরিণাম সুখের এবং আনন্দের হয় তা সে ঠিক করতে পারছিল না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। এ রকম নীরব অপেক্ষা তার কাছে এবং ভরতের কাছেও অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। কৈকেয়ী বেশ খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে থাকল। কৈকেয়ী কথা বলছে না দেখে ভরত অভিভূত গলায় প্রশ্ন করল : মাগো পিতার কি হয়েছে ? নিজের কক্ষেও তিনি নেই, তোমার কক্ষেও নেই ; তা-হলে তিনি কোথায় ? রাজপুরী এত প্রাণহীন কেন ? সমগ্র অযোধ্যাতে শ্মশানের স্তব্ধতা। তুমিও চুপ করে, কথা বলছ না কেন ? আমাদের প্রিয়তম অগ্রজ রামচন্দ্রই বা কোথায় ? ভরতের গলা বেশ ভার হয়ে গেল।

ভরতের প্রশ্নে কৈকেয়ী বিব্রত বোধ করল। ভয়ে মুখখানি বিবর্ণ হল। মাতা পুত্রের অস্বাভাবিক শ্বাসের শব্দে ঘরখানা সহসা ভরে উঠল। কক্ষের মধ্যে এমন একটা স্তব্ধ বিহ্বলতা সৃষ্টি হল যে কৈকেয়ী নিজেকে খানিকটা সংযত সচেতন করে নিয়ে বিষণ্ণ গলায় বলল : পুত্র, পৃথিবীতে কোন কিছুই নিত্য নয়। মায়ামোহে বদ্ধ জীব তবু ভাবে, সব কিছু সে চিরকাল ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু কালের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। মৃত্যু একদিন তার দ্বারে অবশ্যই হানা দেবে। সেই দিনটা মানুষের সব চেয়ে কষ্টের, দুঃখের এবং যন্ত্রণার। প্রিয়তম মানুষটির মৃত্যুর কথা মুখে বলা যে কত মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা তা তোমাকে বোঝাই কি করে ? সব জীবের যে গতি হয়, তোমার পিতারও সে গতি হয়েছে, এ কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে। তবু তোমার তৃপ্তির জন্যই সে কথা বললাম। কৈকেয়ীর গলার স্বর ভঙ্গ হল।

অমনি ভরতের বুকে একটা প্রগাঢ় যন্ত্রণার থাবা গেড়ে বসল। বুকের ভেতর এক অপ্রতিরোধ্য যন্ত্রণার আন্দোলন তার শরীর অস্থির করে তুলল। দু'চোখের তারায় জল টলটল করতে লাগল। টেপা ঠোঁটের কোণে চাপা কান্নার কুঁই কুঁই আওয়াজ।

কৈকেয়ীর ভুরু কুঞ্চিত মুখে যথাযথ উদ্বেগ। দশরথের বিয়োগজনিত শূন্যতার অনুভূতিতে কৈকেয়ীর মন টাটাচ্ছিল। আস্তে আস্তে সে ভরতের দিকে সরে এল। স্খলিত ভেজা গলায় বলল : পুত্র নিজেকে আজ ভীষণ একা লাগছে। তোমরা'ত আছ, তবু আমাকে একলা মনে হচ্ছে কেন?

ভরতের বুকের ভেতর হাহাকার বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে কৈকেয়ীর হাতখানা সে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তৃপ্তিতে, সুখে, আনন্দে কেকেয়ী দু'চোখ বুজল। ভরতের হাতে হাত রেখে বলল : মৃত্যু মাত্রেই খারাপ। মৃত্যু মানে একাকীত্ব। দুঃসহ দুঃখে বুকটা পাষাণের মত ভার হয়ে যায়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির স্বর্গীয় আত্মা কি একমুহূর্তের জন্যে টের পায়?

মাতা পুত্র কথা বলে না। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। ভরতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল কৈকেয়ী। ভরত বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। কৈকেয়ীর কেমন একটা বিহ্বলতাভাব এল। ডান হাতটা আস্তে করে ভরতের কাঁধে রেখে নরম গভীর গলায় ভরতকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল : পুত্র, মৃত্যুতে একটা জীবনের পরিসমাপ্তি বটে, কিন্তু মৃত্যুই শেষ নয়। মানুষ বেঁচে থাকে তার বংশধরের ভেতর। বংশ পরম্পরায় সেই স্রোত বয়ে নিয়ে যায় সে। মা হল জন্মদাত্রী। মার কাছ থেকে সন্তান তার রূপ পায়, পিতা মায়ের সেই রূপকে ভাব দেয়, তাকে গড়ে তোলে। তোমার পিতার মৃত্যুতে তোমাদেরও সব শেষ হয়ে যায়নি। মহারাজের সব রয়েছে তোমার ভেতর, আমার মধ্যে। আমার সমস্ত স্নেহ মমতা ভালবাসা দিয়ে তোদের দু'ভাইকে ঢেকে রাখব। ভালবাসা দিয়ে এই সংসারের সব কিছু যদি দেখিস, বিচার করিস তা হলে কোথাও কোন ভুল হবে না। কোন কিছুর জন্যে কষ্ট হবে না। কৈকেয়ীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, সংযত, চিন্তিত।

কৈকেয়ীর কাঁধের উপর মাথা রেখে ভরত নিশ্চল চোখে তাকিয়ে রইল প্রদীপ শিখার দিকে।

সমস্ত ঘরের মধ্যে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা আড়ষ্টতা নেমে এল।

ভরতকে এমনই উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল যে, কৈকেয়ীর মনে হল ভরত যেকোন সময় শোকে উন্মাদ হয়ে একটা কিছু করে ফেলতে পারে। এই ভয় ও আশঙ্কায় কৈকেয়ী স্বস্তি পাচ্ছিল না। ক্রমাগত চিন্তার ফলে তার মাথায় কেমন যেন এক তালগোল পাকানো অবস্থা হয়ে গেল। কপাল ভারী এবং জমাট লাগছিল।

ভরত সামান্য সময় নীরব থাকল। চোখের জল মুছে জিগ্যেস করল : প্রিয়তম

অগ্রজ রামচন্দ্র কোথায় ? আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়েও তিনি এলেন না কেন ? তিনি কি তবে অযোধ্যায় নেই ?

কৈকেয়ীর বুকের ভেতর থর থর করে কেঁপে উঠল। সাহস সঞ্চয় করে পুত্রের মুখের দিকে তাকাল। ঘটনার আকস্মিকতায় ভরতকে সব কথা জানানোর এক সুন্দর সন্ধিক্ষণ অজান্তে সৃষ্টি হল। সুতরাং তার অপেক্ষা করা ঠিক মনে হল না। ভরতের কুল থেকে নিজের কূলে পৌঁছানোর জন্যে একটা সেতু স্থাপনের প্রয়োজন। ভরতের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলল ঃ তোমার অনুমান যথার্থ। রামচন্দ্র বর্ত্তমানে অযোধায় অবস্থান করছে না। তোমার প্রতি তার কোন স্নেহ নেই। তোমার সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তোমাদের প্রবঞ্চনা করছিল সে। তাই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে মহারাজ তাকে বনে নির্বাসিত করেছে।

জননী ! আর্ত্তযন্ত্রণায় ভরত চিৎকার করে উঠল।

পুত্র, তোমার বিবেক এতটা কাতর হচ্ছে কেন ? সে কিন্তু তোমার জন্যে উতলা হয়নি, তার বিবেকও কাতর হয়নি। তোমার বিশ্বস্ততায় তার সন্দেহ। চোখের সামনে তার এই মিথ্যাচার সইতে পারলাম না। পুত্র তুমি অধীর হয়ো না। তুমি অন্ততঃ বোঝবার চেষ্টা কর। আমি মা।

ছি ছি জননী, এ তুমি কি করেছ ? মাথায় তোমার একি দুর্বুদ্ধি এল।

কৈকেয়ীর সব চিন্তা ভাবনা শুকিয়ে গেল। ভরতের অভিযোগ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে কৈফিয়তের সুরে বলল ঃ ভরত আমি তোদের মা। সন্তানের জন্য মায়ের কোন লজ্জা, সংকোচ, অপমান থাকে না। এই পুরীতে আমার ছেলেরা অনাথ, পরিত্যক্ত হয়ে থাকবে এ আমি জননী হয়ে সইব কেমন করে ? সংসার বড় নিষ্ঠুর জায়গা। এখানে স্বার্থই সব। মহারাজ স্বার্থের বশে মিথ্যেকে আকাশচুম্বী করে তুললেন। কারণ মিথ্যেকে আরো বড় মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে হয়। আর মিথ্যে এমন জিনিস, যার মধ্যে মানুষকে আচ্ছন্ন করার বিষ থাকে। তোমার পিতা নিখুঁতভাবে সেই বিষ ঢালছিল। আমি সেই বিষক্রিয়ায় নীল হয়ে যেতে দিইনি আমার পুত্রদের। এই আমার অপরাধ ? সব মা'ই তার পুত্রের জন্যে এটুকু করে। আমিও করেছি। এ নতুন কিছু নয়।

ভরতেব বুকে কৈকেয়ীর প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা জেগে উঠল। বিদ্যুৎ হানার মত প্রবল ধিক্কার আর অপমানবোধ তার বুক চিরে বেরিয়ে এল। বলল ঃ ছিঃ মা, ক্ষুদ্র ঈর্ষায় তুমি আমার ঋষিতুল্য ভাইকে স্বর্গ থেকে আবর্জনায় নামিয়ে আনলে ? এত বড় কলংক তুমি কেন দিলে আমায় ? তুমি জান না, কি ক্ষতি তুমি করলে আমার ?

কৈকেয়ীর দু'চোখ ক্রোধে দপ্ করে জ্বলে উঠল। বলল ঃ কে তোমার ঋষিতুল ভাই ? রামচন্দ্র ? নিজের লোভ ছাড়া ক্ষমতা ছাড়া যে, কিছু চেনে না, জানে না তাকে বল ঋষিতুল্য ব্যক্তি ? রামের সঙ্গে ঋষির তুলনা করে, ঋষিদেরই ত্যাগ তিতিক্ষা, দয়া, মমতাকে ছোট করলে। রামের মত লোভী, স্বার্থপর, ভণ্ড, কপট প্রতারক আর কে আছে ?

ভরত প্রায় আর্ত্তস্বরে কাঁপা গলায় চিৎকার করে বলল ঃ জননী, তুমি কি জ্ঞান হারালে ? ক্রোধে উন্মাদিনী হয়ে কি বলছ, জান না ?

আমি সব জেনে শুনে ভেবেই বলছি পুত্র। কেন বলছি শোন ? রাম সিংহাসনের লোভে তোমাদের দু'ভাইকে বাদ দিয়ে চুপি চুপি তার অভিষেকটা সেরে ফেলছিল। এই কি তার প্রবাসী ভাই'র প্রতি বিশ্বাসের নিদর্শন ? সততার কোন পরিচয় রামচন্দ্র রেখেছে তার কাজে ? ভারতবর্ষের ছোট বড় সব নৃপতিই অভিষেক সভায় আমন্ত্রিত হল, কেবল বাদ থাকল বৈবাহিকী সাংকাশ্যরাজ কুশধ্বজ জনক আর তোমার মাতামহ অশ্বপতি। কপট পিতার হীন দুরভিসন্ধি অবগত হয়েও রামচন্দ্র লোভীর মত পিতার বাধ্য ও অনুগত থেকে সিংহাসনে অভিষিক্ত হতে চেয়েছে। রামচন্দ্রের লোভ কপটতা, অবিশ্বাসের স্বপক্ষে এটাই যথেষ্ট বলা। রামচন্দ্রের এই সংকীর্ণ কপট ভ্রাতৃপ্রেম উচ্চাসন পাওয়ার অযোগ্য।

ভরতের মুখ সহসা মলিন হল। কি যেন ভেতরে ভেতরে তাকে অস্থির করে তুলল। কৈকেয়ীর কথাটা ফেলতে পারল না, আবার বিশ্বাস করতেও তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। কৈকেয়ীর কথায় ভরত স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, তার অনুপস্থিতে অযোধ্যায় এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে যার আলোড়ন উত্তেজনার ব্যাপ্তি ব্যাস, বেধ আর পরিধি অযোধ্যার সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে আবৃত করেছে, শুধু দৃষ্টি দিয়ে যার কুল মেলে না। এই মুহূর্ত্তে তার কোন বিচার শক্তি ছিল না। দৃষ্টির অতীত ঘটনার অনুভবের বিষাদে নিঃশব্দে আন্দোলিত হচ্ছিল তার বুক। ভরত অসহায় বোধ করছিল। প্রচণ্ড একটা বেদনা বুকে নিয়ে সে আর্ত্ত স্বরে বলল ঃ জননী আমার সরল ভ্রাতৃপ্রেমে এনো না সংশয়। তুমি চুপ কর।

ভরতের হৃদয় যেন গলে গলে পড়ল তার কণ্ঠস্বরে। চোখের মণিতে তার রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা কিছু নেই। একটা ভয় পাওয়া আরষ্ট ভাব তাকে কেমন শান্ত ও নির্বিকার করে রাখল। মুখ ফ্যাকাশে। ভরত বিবেচক ছেলে। সে জন্যে উদ্বেগে কৈকেয়ীর মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। হঠাৎ তীব্র আত্মাভিমানে মরিয়া হয়ে বলল ঃ কেমন করে চুপ করি বৎস। বুক আমার অহর্নিশি জ্বলছে। মনকে বোঝাতে পারছি না। ভুলতে পারছি কৈ রামের প্রতারণা ? আমার নির্মল মাতৃস্নেহের উপর তার তীব্র সন্দেহ জাগল কেন ? তার অবিশ্বাস, সন্দেহের তীরে বিদ্ধ আমার হৃদয়। রক্তঝরা সে বেদনার ভাষা আমি বোঝাই কারে ? আমার কে আছে ? গর্ভজ পুত্রের কাছে মায়ের চেয়ে ভাই বড় ! ভাইর দুঃখ কষ্টে তার বুক ফাটে, অথচ মায়ের দুঃসহ জ্বালা, যন্ত্রণায় তার প্রাণ কাঁদে না। সমবেদনায় মন টলে না। এর চেয়ে জননীর আর কি বড় দুর্ভাগ্য থাকতে পারে ? হাউ হাউ করে কাঁদল কৈকেয়ী। অনেকক্ষণ ধরে অসহায়ের মত কাঁদল।

ভরত কৈকেয়ীকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিল। মুখের উপর ঝুলে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে অপলক চোখে জননীর চোখে চোখ রাখল। কৈকেয়ীর বুকটা আপনা থেকেই থর থর করে কেঁপে উঠল। আরামে দু'চোখ বুজল।

চোখের কোল ভরে গেল জলে। জননীর আঁচল দিয়ে সে জল ভরত নরম হাতের ছোঁয়ায় মুছিয়ে দিল। তৃপ্তিতে শান্তিতে কৈকেয়ী ভরতের বুকের উপর মাথা রাখল। মনটা আবেগে নুয়ে গেল। গলা ভিজে গেল আনন্দে! অস্ফুট স্বরে বলল ঃ জননীর কাছে সন্তানই সব। স্বামীর থেকে সন্তান বড় জননীর কাছে। জননীর স্নেহ অপার, অসীম। সমুদ্রের মত স্নেহধারা বইছে তার বক্ষ জুড়ে। স্বপ্ন, কামনা বাসনা, আকাংখার ঊর্মিতে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হচ্ছে জননীর হৃদয়। জননীর অন্তরে সে স্নেহ ঝর্ণার মত কখন শীর্ণস্রোতা আবার কখনো ব্যাপ্তিতে, বিশালতায় গভীরতায় মহাসমুদ্রের মত অসীম, অনন্ত, অতল। আমার বুকেতেও তেমনি এক স্নেহের মহাসাগর ছিল পুত্র। সে ছিল মুক্ত, স্বাধীন। রাম লক্ষ্মণের জন্যে ছিল অবারিত। সপত্নী পুত্র বলে আলাদা চোখে দেখিনি কখনও। আমার আত্মজ বলেই ভাবতাম। আমার দুই নয়নমণি ছিল তারা। তবু আমার স্নেহ ভালবাসার উপর তাদের দু'ভাইর অবিশ্বাস সন্দেহ প্রবল। সব অদৃষ্ট পুত্র!

ভরত কোন কথা বলল না। তার দৃষ্টি ফাঁদে পড়া পাখীর মত। জিজ্ঞাসা নিবিড় দৃষ্টি কৈকেয়ীর চোখে বিন্ধ হয়ে রইল। নিজের অজান্তে বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর শ্বাস আস্তে আস্তে নামল। কৈকেয়ী ভরতের মনের তল খুঁজে পেল না। চমকানো বিস্ময়ে তার বুক টন টন করল। ভরতের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনের ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে সম্মোহিতের স্বরে বলল ঃ তোমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্যে তুমি দায়ী নও। কারণ যে বিশ্বাসের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ, সংস্কার বশে সম্মান করে এসেছ তাকে। হঠাৎ সেই বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কারের থিত ভিত্ যদি ভেঙে চৌচির হয়ে যায় তাহলে ভাঙা মনের এই আর্তিটুকু'ত থাকবেই। তোমার মত আমারও আছে। তাই'ত যন্ত্রণায় বেদনায় একরকম পাগল হয়ে গেছি। যারা আমাকে ও আমার পুত্রদের অবহেলা করল, অনাদর দেখাল, যাদের উপেক্ষা, ঘৃণা, বঞ্চনা আমাদের অপমান করল তাদের আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তারা আমাদের পরম শত্রু। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করেছি আমি। শেষ করবে তুমি। তোমাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত না করা পর্যন্ত আমার মন শান্ত হবে না।

কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ভরত। বুকে তার নৈঋতের মেঘ। ঝড়ের সংকেতে যেন শাসাচ্ছিল তাকে। নিজের বিবেকের জিজ্ঞাসায় সে স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার গম্ভীর। ভুরু কোঁচকাল। তার মনে হল, কৈকেয়ী জননী হয়ে বিভ্রান্ত করছে তাকে। তার কানে বিষ বর্ষণ করে মনকে বিষিয়ে তুলছে অগ্রজের প্রতি, পিতার প্রতি এবং পরিবারের প্রতি। অন্ধ পুত্র স্নেহে জননী তার অনেক নিচে নেমে গেছে। ঘোর স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিতে তার বুক টাটাচ্ছিল। জননীর প্রবল আত্মাভিমানের যে আগুণ মনের নেপথ্যে ধিকি ধিকি জ্বলছে, হঠাৎ যেন তার চোখে মূর্ত হল তার নীল শিখা। মায়ের রোষ-ভরা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভয় পেল ভরত। ঠোঁট কাঁপছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শ্বাসে তার কম্পন। চোখের দৃষ্টিতে অসহায় বিহ্বলতা। ভরত দুর্বল বোধ করছিল। কৈকেয়ীর দিকে বিমূঢ়ের

মত অপলক স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। ভুরু কোঁচকাল। স্তিমিত গলায় অস্ফুটস্বরে ডাকল : মা, মাগো! জননী হয়ে যে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তুমি বয়ে আনলে সে যে আমার জীবনের কত বড় দুর্ভাগ্য তা তুমি জান না। নির্দোষ, নিরপরাধী ভরতের জীবনে এই সিংহাসন আরোহণের মত বড় কলংক আর কিছু নেই। আমার সব সুকৃতি ঢেকে দেয়ার পক্ষে এই কলংকটুকু যথেষ্ট। আমার ভাবমূর্তি তুমি এভাবে নষ্ট করে দিতে পার, কোন্ অধিকারে?

কৈকেয়ী উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। রামের বনগমনের দিন থেকে একটানা অনেকগুলো দিন ধরে যে কোন পরিণামের জন্য প্রস্তুত ছিল। তবু ভরতের রূঢ়বাক্য শোনা মাত্র সে চমকে উঠল। কৈকেয়ী স্থির চোখে দেখল তাকে। বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড তেজ তার গলার অন্তঃস্থলের এক অব্যক্ত অধিকার বোধের উৎস থেকে নির্গত হল। ধীর শান্ত কণ্ঠে কৈকেয়ী বলল : জননীর অধিকারে। জননীর কাছে সন্তানের থেকে বড় কেউ নয়। শিশুকাল থেকে রোগের হাত থেকে, মৃত্যুর হাত থেকে, নৈতিক মৃত্যু কিংবা অধঃপতন থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে জননী। বাঁচবার অধিকারে সন্তানকে বড় করে তোলা জননীর শ্রেষ্ঠ কাজ। হীনতার লজ্জা থেকে, মনুষ্যত্বের অপমান থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছি। বাঁচাবার অধিকার সকলেরই আছে। সব মা চায় ছেলে বড় হবে, অনেক অনেক বড়। এতবড় যে সহজে যার নাগাল পাবে না কেউ। সেদিন রত্নগর্ভা জননী হয়ে সে বেঁচে থাকবে ছেলের মধ্যে।

ভরতের বুকের ভেতর এক বিচিত্র অনুভূতির শিহরণ জাগল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণে একটা দুরন্ত ভয়ে সে বিব্রত ও স্থির হয়ে পড়ল। ভর্ৎসনা করে বলল : কিন্তু এভাবে তোমার কাছে বাঁচতে চাওয়া ভীষণ অন্যায়। নিন্দের অপবাদের মুখে আমাকে এরকম করে ঠেলে দিতে তোমার একটুও বিবেকে লাগল না, আমার জন্যে তোমার এতটুকু মায়া হল না?

কৈকেয়ীর দু'চোখ তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। ঈষৎ বিস্মিত মুখে ভরতের দিকে তাকিয়ে সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারল তার অস্বস্তিকে। আর মনে মনে অবিরাম সে তার প্রশ্নের জবাব খুঁজছিল। স্নেহের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এখন সে একটা আত্মঘাতী দাহে জ্বলছে। কৈকেয়ী এখন নিজের কথা ভাবছে না, ভরতের কথা ভাবছে। ভরত তাকে কেন বুঝতে চেষ্টা করছে না? কেন মনের এই জিজ্ঞাসার জানলায় দাঁড়িয়ে কেকেয়ী বিভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর তার কাছে সরে এল। ঠোঁট কাঁপছিল। চোখ জ্বলা করছিল। গম্ভীর গলায় বলল : মায়ার থেকে তোমার অধিকার রক্ষার দায়িত্ব আমার কাছে বড় ছিল। মায়া করলে সে চেষ্টা করা যেত না। পুত্র, সংসার বড় নিষ্ঠুর জায়গা। সেখানে স্বার্থই সব। তোমার পিতা অবিমিশ্র আর্যরক্ত সংস্কারের বশে রাম-লক্ষ্মণকে তাঁর পুত্র বলে গ্রহণ করেছিল। আর তোমরা হলে তাঁর স্নেহ বঞ্চিত এক দুর্ভাগা সন্তান। মহারাজার কাছে রামচন্দ্রের স্বার্থ ছিল বড়। আমার কাছে তোমার স্বার্থ বড়। এর মধ্যে বিবেকের কথা আসবে

কেন ? অযোধ্যাপতিকে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করতে বলে কি অন্যায় করেছি ! পিতার বাক্য ও প্রতিশ্রুতির যথোচিত মর্যাদা দেয়া'ত পুত্রের কর্তব্য। রামচন্দ্রের বনে যাওয়া, তাই কোন আশ্চর্য ঘটনা নয় ! এসব ঘটনায় তুমি উতলা হচ্ছ কেন ? যা সত্য তাই'ত ঘটেছে। তবু দুঃখ্য কেন ? মনে রেখ সত্য সব সময় গৌরবের হয় না। মহারাজের সত্যভঙ্গ ঠেকাতে আমার কঠোর হওয়াটা মোটেই গৌরবের হয়নি। কিন্তু সত্যটা প্রকাশ হয়েছিল। সোনার অযোধ্যা আমি ভাঙতে বসিনি, একে শ্রীহীনও করিনি। তবু মানুষ নানারকম স্বার্থে আমার নামে অপবাদ দিচ্ছে। এটা যে সত্যি নয়, তোমারও বুঝতে হবে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার কথা তোমার ভ্রাতৃত্ববোধে ও পিতৃত্ববোধে সংস্কারে ঘা খাচ্ছে। তাই, তোমার দ্বিধা ও সংশয়। কিন্তু সেই মিথ্যে সংস্কারকে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে সত্যকে অস্বীকার করলে তোমার গৌরব বাড়বে না। বরং পদে পদে বিপদ বাধা আসবে। তুমি একবার দুর্বল প্রতিপন্ন হলে খেলার বস্তু হয়ে উঠবে। সাবধান !

আজ বুঝতে পারছি সংঘর্ষ কেন হয় ? মানুষ হয় দু'রকমের। একদল শান্তিতে থাকতে চায়, আর একদল লোক চায় প্রভুত্ব। এরাই নেয় দেশ পরিচালনার ভার। সমস্ত কিছুকে নিজের কর্তৃত্বে আনতে চায়। ফলে সংঘর্ষের উৎপাতে জীবন ঘুলিয়ে যায়। এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির, এক ধর্মের সঙ্গে অন্যধর্মের সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিয়ে এইসব ক্ষমতা লোভী ধন লোভী মানুষ জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশকে ক্রীতদাস করে। নির্যাতিত করে। সংঘর্ষ ধর্মে আর ধর্মে হয় না, হয় মানুষে মানুষে। ইতিহাস কোন রাজা বা রাজপুত্রের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দ্যুতক্রীড়া হতে পারে না।

তুমি চিরকাল আবেগপ্রবণ বিবেকবান, সরল, কল্পনাপ্রিয় বাস্তব বুদ্ধিহীন এক আশ্চর্য সুন্দর পুত্র আমার। তোমার আয়ত চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে তেজোময় ব্যক্তিত্ব, আত্মিকশক্তির আভাস। তুমি বীর। রাজা এবং নেতা হবার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মেছ। কেকয়রাজ্যে তোমার কার্যের জন্যে তুমি সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি। জাতি ও ধর্মের পরিত্রাণের, জন্য জাতিনির্বিশেষে তুমি সকল কেকয়-বাসীকে একমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছ। এটাই ছিল তোমার পিতার দুর্ভাবনার বিষয়। অযোধ্যার মাটিতে সেরকম কোন বীজ থেকে যদি তার চারাগাছ জন্মায় তা হলে অযোধ্যার আর্যত্বের অভিমান বিপন্ন হবে। এই ভয়ে তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক হয়নি। তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে তার একটা ব্যবধান তিনি তৈরী করেছিলেন। রামের মনে এই বিভেদের বীজ অঙ্কুরিত। তার শিক্ষাই সেজন্য দায়ী। রামচন্দ্র কোনদিনই আর্য-অনার্যবোধের প্রাচীর ভাঙতে পারবে না। বরং তার দেয়ালকে আরো শক্ত ও মজবুত করে গড়বে। আমি অনার্য কন্যা হয়ে তা সইতে পারছি না।

কৈকেয়ীর কথায় অসহিষ্ণু হয়ে ভরত বলল : তোমার সামাজিক নীতিবোধ অতি সংকীর্ণ। তাই রামচন্দ্রের ধার্মিক, পূত চরিত্রের লোককে অবিশ্বাস করছ। সর্বদিক দিয়ে তার মতো ব্যক্তিত্বশালী লোক আমাদের ভারতবর্ষে নেই। তার মত ভ্রাতা পাওয়া গৌরবের। তার বিপক্ষে আমি যাব না।

ভরতের কথায় কৈকেয়ী চমকে উঠল। হঠাৎ একটু দিশাহারা হয়ে পড়ল। বুকের বাঁ-ধারে একটা অবোধ যন্ত্রণা বোধ করল। নিঃশব্দ এক আর্ত্তনাদ বুক থেকে উঠে এল। হতাশ গলায় ডাকল ঃ পুত্র!

কৈকেয়ীর মুখের দিকে খানিক হতভম্বের মত চেয়ে রইল ভরত। তারপর আস্তে আস্তে কুণ্ঠার সঙ্গে বলল ঃ মাগো, কেন বোঝ না মানুষের মনের ভেতর যে দেবতা আছে সে বদলায় না। সেই মনটার উপর দাঁড়িয়ে আছে সমাজ, সংসার, মানুষের সভ্যতা। হঠকারিতা করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। সংসারে থাকতে হলে একটা আপোষ করে চলতে হয়। নইলে সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না।

কৈকেয়ীর কণ্ঠে আশাভঙ্গের ধিক্কার উৎসারিত হল। ছিঃ, ছিঃ! কেকয়ের দিগ্বিজয়ী বীর এত ভীরু, কাপুরুষ'ত জানতাম না। আমাকে তোমার পুত্র মনে করতে ঘৃণা হচ্ছে। পৌরুষ এবং আত্মসম্মানবোধের নাম মনুষ্যত্ব। কিন্তু তোমার সেই পৌরুষ, মনুষ্যত্ব কোথায়?

মাগো, তোমার ক্ষোভ যেন আগুনের শিখা হয়ে জ্বলছে। স্বার্থ, রাজনীতি, ধর্ম, আদর্শ, দুর্নীতি, সুনীতি সব যেন এক হয়ে তোমার বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তুমি মশাল হয়ে পুড়ছ। তোমার হৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলো পুড়ছে। নিজের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছ আর জ্বালাচ্ছ। একেই সত্যের জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি ভাবছ। কিন্তু একসময় ইন্ধন ফুরোবে। আগুন নিভবে। তখন দেখতে পাবে স্বার্থের অশোভন প্রকাশ তোমাকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে গেছে। সিংহাসনের জন্যে তোমার এই নির্লজ্জ হ্যাংলামি আমার ভাল লাগছে না। তোমার এই কাজের ভেতর আমার মন যে কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না। আমি কারো করুণা কিংবা কৃপা চাই না, কারও কাছে। নিজের চরিত্র গৌরবে আমি সবার পূজা পেতে চাই। ভালবাসার দাবিতে নিঃশেষে সমর্পণ করতে চাই নিজেকে। ভাইর বিশ্বাস ভেঙে তার মনে কষ্ট দিয়ে সিংহাসন, রাজ্য আমি কিছু চাই না। আমাকে তোমার অযোগ্য পুত্র মনে করেই ক্ষমা কর।

ভরত আর দাঁড়াল না সেখানে। দ্রুতপদে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

কৈকেয়ী স্তব্ধ নির্বাক। মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভরতের কথার সত্যটুকু তার হৃদয় স্পর্শ করল। চোখের দৃষ্টি দিয়ে যে আগুনের ঝলক বেরিয়েছিল হঠাৎ তার তেজ যেন দপ্ করে নিভে গেল। কৈকেয়ীর মুখে চোখে বিহ্বলভাব।

কৈকেয়ী বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কি। ভরত রাজা হবে এই প্রস্তাব তার ভেতরে যে রোমহর্ষ রহস্যময় আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল তা এক ফুৎকারে উড়ে গেল। তীব্র অপমান, লজ্জায় ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তার মুখ চোখ।

ভরতের ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কারণ কি? একটা চক্রান্ত! একটা গণ্ডগোল! অথবা একটা অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের আশংকা কি তার মনে জাগল? নইলে সিংহাসনে অভিষেকের কথা শুনে অমন সাদা হয়ে গেল কেন? অমন বিমর্ষ তাকে দেখাল কেন? একটা তীব্র সন্দেহে ঘুলিয়ে উঠল মনটা।

মন্থরা শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ভরত সিংহাসনে অভিষিক্ত হতে রাজি হল না। রামচন্দ্রের অভাব অযোধ্যাকে শ্রীহীন করল। সমগ্রপুরী নিরানন্দ। রাজধানীতে ভরতকে নিয়ে জল্পনা কল্পনার বিরাম ছিল না। শুধু অযোধ্যায় নয়, সমগ্র আর্যাবর্তে সে এখন সর্বাধিক সমালোচিত ব্যক্তি। বিতর্কিত মানুষ। তাকে নিয়ে জলঘোলা হল অনেক। রাজনৈতিক ঘোলাজলে অবগাহন করে সিংহাসনে বসতে ভরতের রুচি, শিক্ষা এবং বিবেকে বাধল। রাজ্য ও সিংহাসনের ঘূর্ণাবর্তে তার হৃদয়দেশ অস্থির হল। অস্তিত্বের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। একদিকে মানুষের সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা, ভাগ্যের কলংক, নিয়তির অভিশাপ, অন্যদিকে জাগ্রত বিবেক, মহান ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃসত্য জননীর আকৃতির মধ্যে এক প্রবল সংঘাত উপস্থিত হল। এরকম দারুণ চিত্ত সংকটে ভরত কখন পড়েনি জীবনে।

কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ভরতের কোন সংশয় ছিল না, তবু বাইরের প্রবল চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে' তার ব্যক্তিত্বের যেন পরীক্ষা দিতে হল। বারংবার মনে প্রশ্ন জাগল : স্বার্থের লোভে জননী কৈকেয়ী এ কোন্ পাতালে নামল? জননীর সঙ্গে তাকেও পাতাল দেখতে হল। মাতা পুত্রের ভাগ্য গর্ভস্থ শিশুর মত চিরকাল কি একসূত্রে বাঁধা থাকে? মায়ের কর্মফলের পরিণাম পুত্রকে কেন ভোগ করতে হয়? রামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে কোন মুখে মায়ের ইচ্ছেতে তার স্বপ্নের সিংহাসনে বসবে সে? জননী'ত কোনদিন সংকীর্ণমনা ছিল না? তার মত অসাধারণ জননী বিরল। রামচন্দ্র তার নিজের পুত্রের চেয়ে অধিক প্রিয়। তাই রামচন্দ্র তার নির্মল জননীত্বকে সন্দেহ করেনি। তবে, কার প্ররোচনায় জননী এমন বিবেকহীন হল? কে সে? নিজ পুত্রের স্বার্থের দাবি মেটাতে গিয়ে অযোধ্যাকে সে নিঃস্ব রিক্ত করে ফেলল। রামের অভাবে অযোধ্যাবাসী শুধু নিরানন্দ নয়, নিজেকে তারা অবলম্বনহীন মনে করতে লাগল। নিরাপত্তার অভাব বোধ করল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ছবি তাদের মনে ছিল না। উদ্বিগ্ন অসহায়তাবোধে তারা কিছুটা অশান্ত। এরকম একটা ভয়ংকর রাজনৈতিক এবং মানসিক অস্থিরতার মধ্যে সিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে কখনও ভাল হয় না, তাতে তার গৌরবও বাড়বে না। মায়ের আশা পূর্ণ হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সে ভীষণ ছোট হয়ে যাবে। রামচন্দ্র আযোধ্যার জনগণের হৃদয়ের রাজা সেখান থেকে তাকে নির্বাসিত করার সাধ্য নেই কারো। আর সে ইচ্ছাও তার মনে কখনও জাগেনি। কেবল বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব বুঝতেই চিন্তাসূত্রে কথাটা মনে এল মাত্র।

রাজা হওয়ার স্বপ্ন আকাংখা ছিল রামচন্দ্রের অন্তরে। সে কোনদিন এর স্বপ্ন দেখেনি। কোন উচ্চাশা নিয়ে রাজনীতিও করেনি। তুচ্ছ ক্ষমতালোভের উম্মাদনায় পারিবারিক কলহে ইন্ধন দিয়ে সিংহাসনে বসার নোংরা রাজনীতিতে তার রুচি নেই।

আপন কুলের গৌরব হেঁট করে দিয়ে ভরত কোন রাজকীয় গৌরব, মর্যাদা চায় না—এই কথাটা অনেক দাম দিয়ে লোককে জানাতে হবে তার।

জননী কৈকেয়ীকে হতাশ করতে ভরতের খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সে নিরুপায়। অযোধ্যার সিংহাসন তার কাছে শৃংখল। জেনে শুনে নিজেকে শৃংখলিত করতে পারবে না। মাতৃ আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে নিজেকে শুধু কষ্টের শৃংখলে বাঁধা। বন্ধন মানে বিড়ম্বনা আর যন্ত্রণা। কিন্তু জীবন বন্ধন স্বীকার করার জন্যে নয়। বন্দীত্ব জীবনের অভিশাপ। জীবন মানে চলা। ঝর্ণার মত অফুরাণ চলা। সে চলা হবে অনন্ত। কখনও থেমে থাকবে না। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য থাকবে তাতে। দু'হাতে আনন্দের ধন বিতরণ করতে করতে রাজর্ষির মত চলবে। তবেই সে চলাতে অবসাদ থাকবে না। রামচন্দ্র এমন করে চলতে আরম্ভ করেছিল। সংগ্রামী যোদ্ধার মত রাক্ষসদের ভয় ভীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সে যাত্রা শুরু করেছিল। চলাতে রামচন্দ্রের আনন্দ। তাই বিমাতার দেয়া বনবাসের দুঃখ, দুর্ভোগের কষ্ট তার চলার পথে বাধা হল না। মুক্ত পুরুষ নির্বিকার চিত্তে মায়ের নির্বাসনকে আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করল। আশাহত হওয়ার দুঃখ, বঞ্চনার কষ্ট তার চিত্ত ভারাক্রান্ত করল না। কারণ সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য কৈকেয়ীর উপর তার কোন রাগ, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, অভিযোগ কিছুই ছিল না। রামচন্দ্র মহান। অধসাধারণ এক আশ্চর্য মানুষ। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভরতের মাথা নুয়ে গেল।

রামের সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রে এমন একটা জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি কখনো তাকে দাঁড়াতে হয়নি। তাই একটা জিজ্ঞাসার আর্তি ছিল তার অন্তরে। নিরপেক্ষ বিচারে জননী তার একা দোষী নয়, পিতার মত রামচন্দ্রও দোষী। এই জটিল সংকট রামচন্দ্রের ভুলে এবং লোভে হল। জননীর প্রতি রামচন্দ্র যথেষ্ট উদার হতে পারেনি। জননীর মাতৃত্বের অভিমান তার জন্যে পীড়িত হয়েছিল। সিংহাসনের অভিষেক বার্তা রামচন্দ্র যদি নিজের মুখে কৈকেয়ীকে দিত তা হলে এই বিষবৃক্ষের সৃষ্টি হত না। রামচন্দ্র বিবেচক, জ্ঞানী, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী হয়েও ক্ষমতা লোভ জয় করতে পারেনি। রাজ্যলোভীর এই কলংক কোনদিন তার চরিত্র থেকে মুছবে না। তার সব ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, মহত্বের উপর চাঁদের কলঙ্কের মত ঐ দাগটুকু অম্লান থাকবে। তবে কি নিজের কলংক গোপন করতে রামচন্দ্র বনবাস মেনে নিল? না অন্য কিছু?

রামের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিণতি কি, ভবিষ্যৎ কি—এই নিয়ে তার মনে নানা অদ্ভুত প্রশ্ন জাগল। বাইরের সংকট—জনরোষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃংখলা প্রভৃতির আঘাত উদ্যত দেখল। যা তার মনকে এক অজ্ঞাত ভয়ে অস্থির করে তুলল। তাই ভরত নিজেকে প্রশ্ন করলঃ রামচন্দ্রের এই যাত্রা কিসের? পিতার সহস্র বাধা নিষেধ, আপত্তি তুচ্ছ করে, প্রজাদের ব্যাকুল আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, মরণাপন্ন পিতাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে রাম বনগমন করল কোন স্বার্থে? তার উদ্দেশ্য কি? কোথায় তার গন্তব্য? এই সব জিজ্ঞাসার রহস্য ভেদ করতে অসমর্থ হল ভরত।

রামচন্দ্রের প্রতি প্রেম ও ভয় যুগপৎবোধের দ্বারা তার চিত্ত আচ্ছন্ন। স্থান ও কালের এবং পরিস্থিতির এই মুহূর্তে রামচন্দ্রকে তার জীবনে নিয়তির এক অলংঘ্য সংকেত-রূপে মনে হল। রামচন্দ্র একটু উদার আর বিবেচক এবং দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন হলে বোধ হয় এই বিপদ বাধা উত্তীর্ণ হওয়া যেত। বৃদ্ধ পিতার প্রতি সে তার যথোচিত কর্তব্য করেনি। অন্ততঃ তাঁর কথা চিন্তা করে বনগমন বিলম্ব করতে কোন বাধা ছিল না। তার এবং শত্রুঘ্নের আগমন পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করত তাহলে আর উল্টোপাল্টা ঘটনা হত না। তবে কি রামচন্দ্র এই বিপর্যয় মনে মনে চেয়েছিল ? তাকে বিপাকে ফেলে শাস্তি দেবার জন্য কি এই আয়োজন ? রাম সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথা তার বুকে বিস্ময়ের ঢেউ তুলল। আর অভাগিনী জননীর কথা মনে পড়ল। ভরত এই প্রথম সহসা নিজের অজ্ঞাতেই জননী সম্পর্কে একটি আবেগ অনুভব করল বুকের ভেতর। আর কেমন একটা অপরাধবোধে চিত্ত পীড়িত হতে লাগল।

ভরতের অপরাধ বিমর্ষ চোখে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। অসহায়তা এত গভীর যা ক্রমে তাকে অযোধ্যার পরিস্থিতির মধ্যে টেনে আনল। রামের বনগমন কিন্তু কৈকেয়ীর পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। যে জয়ের জন্যে জননী লালায়িত সেই জয় পতাকা অত্যন্ত অবহেলায় জননীর হাতে দিয়ে সে বিজয় গৌরবে বনে যাত্রা করল। হাসিমুখে নিজেকে রাজসুখ, ঐশ্বর্য, বিলাস, আরাম থেকে বঞ্চিত করে বনবাসের অশেষ দুঃখ, কষ্ট, সহ্য করার যে মনোবল, দৃঢ়তা দেখাল তাই রামচন্দ্রকে এক মহান মানুষ করল। তার ত্যাগ সুন্দর। সংযম, কঠোরতা অসাধারণ। বনযাত্রা যেন সকল বন্ধন থেকে মুক্তি, বেপরোয়া, দুর্নিবার। রামচন্দ্রের দৃঢ় মনোবল, কঠিন কর্তব্য, অসাধারণ ত্যাগ সীমাহীন সহিষ্ণুতা ভরতের চোখে এমন রহস্যময় হয়ে উঠল যে ত্যাগের আদর্শের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নেয়ার কথা মনে হল বারংবার। তার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়, এব গভীর অনুভূতিতে বেঁচে উঠার মতো মহিমান্বিত হয়ে উঠল।

নিঃশব্দে সুবীর ভারতের কক্ষে ঢুকল। খোলা জানলার দিকে মুখ করে ভরত প্রকৃতি দেখতে মগ্ন ছিল। সুবীরও আকাশের দিকে তাকাল। নীল আকাশের উঁচুতে বিন্দু বিন্দু কয়েকটা পাখি। প্রাসাদের পশ্চিম দিকে একফালি অপরাহ্নের রোদ।

ভরত কি ভেবে ঘাড় ফেরাল। সুবীরকে দেখে বিভ্রান্ত বিস্ময়ে চমকিয়ে উঠল। মুখে সৌজন্যের হাসি।

সুবীর একটুও অবাক হল না ভরতের আচরণে। চিরকালই সে এইরকম। ভরতের হাবভাব কেমনতরো। মুখটা শুকনো। চোখের চাউনিতে গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং জিজ্ঞাসা। সুবীরকে দেখে ভরতের কুঞ্চিত ভুরু সটান হল। সুবীর তীক্ষ্ন চোখে ভরতের হাবভাব লক্ষ্য করছিল। ধীর স্বরে বলল ঃ রাজকুমার নিদারুণ কষ্টে কাটছে আপনার দিনগুলো। আপনার ঐ করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু অনেকদিন হল। এতদিন নিজের মনেই কথাগুলো রেখেছিলাম। এখন একেবারেই না বললে নয়। কর্তব্যবোধে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। আপনি অনুমতি করলে, নিবেদন করতে পারি।

ভরত স্পষ্ট করে চোখ বড় বড় করে সুবীরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। মনে তারও নানা প্রশ্ন জাগে, যা উচ্চারিত হয় বুকের ভেতরে। ভরত ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়ে বলল ঃ বেশ বলুন।

সুবীর ব্যস্ততা ও দায়গ্রস্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ঃ পুরোহিতেরা আপনার অভিষেকের শুভদিন স্থির করেছিল। কিন্তু আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। কৈফিয়ৎ চাওয়ার অধিকার আমার নেই। শুধু সবিনয়ে বলব, রাজা ছাড়া যে রাজ্য চলে না, এ'ত আপনি জানেন। এ রাজ্যের পরিচালনা আপনাকে করতে হবে। কষ্ট হলেও কর্ত্তব্যবোধে রাজ্যচালনার ভার আপনাকে নিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

ভরতের চোখে অপরিসীম বিস্ময়, জিজ্ঞাসায় কুঞ্চিত ভূরু। দাবিসূচক কথাগুলো তার মস্তিষ্কে ধ্বনিত হয়। চোখে মুখে বিব্রত লজ্জা বিরক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সহসা ভ্রূকুটি মুখ শক্ত হল। ভরতের অভিব্যক্তি অনুমান করতে সুধীরের কষ্ট হল না। তার কিছু বলার আগেই সুবীর তার বক্তব্যকে কিঞ্চিত অপ্রতিভতায় সংশোধন করে নিয়ে নিচু স্বরে বলল ঃ আপনার দ্বিধা কোথায় আমি জানি। কিন্তু কর্তব্যে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া ঠিক নয়। নীতিতে আপনি ভীষণ কঠোর। সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে তা আর পরিবর্তন করেন না, আমি জানি। তবু কি জানেন, ত্যাগী নির্লোভ চরিত্রের মানুষেরা স্বভাবতঃ হৃদয়বান হয়। সব পরিস্থিতিতে তারা নির্দয় হয় না।

প্রশংসা এমনি এক জিনিস যা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষকেও দুর্বল করে। ভরতের গৌরবর্ণ মুখে রক্তের ছটা লেগে যায়। চোখে মুখে একট বিব্রত লজ্জার ভাব ফোটে। চোখের পাতা নত হয়। তাকিয়ে থাকতে পারে না সুবীরের দিকে। সুবীরের দৃষ্টিতে চতুর হাসির অপ্রস্তুত অভিব্যক্তি। চকিতে সে গলার স্বরে একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। গলাটা ভারী ভারী করে বলল ঃ না, না, আমি আপনার স্তুতি করছিনা। তাতে আমার লাভ নেই। আমি আপনার মন্ত্রণাদাতা কেকয় রাজের প্রতিনিধিমাত্র। স্তুতি আপনাকে বিচলিত করবে না সেও জানি। চিরকালই আপনি না বৈরাগী, না সংসারী। আপনি যে কি চান স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না। মানুষ হিসাবে আপনি আমার নমস্য। কিন্তু রাজনীতিতে কঠোরতা ও বাস্তবতা আপনার চেয়ে আমি বেশি বুঝি একথা বলার অধিকার আমার আছে। কিন্তু মানুষের মনের গতিপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মন রাখা রাজনীতির কলা কৌশল নির্ণয়ে আপনার দক্ষতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। আপনাকে কথাতে ভোলাবো স্পর্ধা করি না।

ভরত সুবীরের স্পষ্ট ভাষণে চমৎকৃত হল। উদ্দীপ্ত চোখে চমকানো শংকা অপসারিত হল না। নিজের সত্তার গভীরে অবগাহন করে মন্দ্রিত স্বরে সে বলল ঃ মহামাত্য যে অনুভূতি ক্ষমতার উত্তাপে ঘুমন্ত আকাংখাগুলো জাগিয়ে তোলে তার প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে উম্মাদ না করাই ভালো। আমি সিংহাসন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। অযোধ্যার স্বার্থ কেমন করে নিরাপদ করা যায় তার কথাই আমাকে বলুন।

রাজকুমার বর্তমান সংকট মুহূর্তে আপনার এই ভাবপ্রবণতা শোভা পায় না।

পরিস্থিতির কঠোর সমালোচক হয়ে নিরাবেগ চিত্তে রাজনৈতিক সংকটকে বিচার করা উচিত।

ভরতের মনে হল সুবীরের কথাগুলো অতি স্বাভাবিক এবং অনিবার্য তথাপি, সে গভীর কাতরতা বোধ করল। কারণ এ জিজ্ঞাসার জবাব তার জানা নেই তা নয়, তবে বলতে পারছে না। তাই না বলার কাতরতা তাকে গম্ভীর আর ব্যথিত করে তুলল। স্তিমিত স্বরে বলল ঃ জননীর ইচ্ছের সঙ্গে আমার যে সংঘাত বেঁধেছে ভয়ে নয় কর্তব্যবোধে। আমাদের ভায়ে ভায়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন এতই দৃঢ় যা আমার মনকে রামচন্দ্রের দিকে প্রবলভাবে টানছে।

সুবীর নিঃশব্দে হাসল। বলল ঃ কুমার, আপনি অযোধ্যার জনরোষ এবং ষড়যন্ত্রের ভয়ে সিংহাসন গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত। কিন্তু আপনার ভয় কাকে ? কেকয়ের চতুরঙ্গ বাহিনী আপনার সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এছাড়া অযোধ্যার নিজস্ব সৈনিক আছে। তারাও রাজাদেশ মানতে বাধ্য। সৈনিকের নিজস্ব নিয়ম শৃংখলা এবং আনুগত্যবোধ তাদের অন্তরে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এ ভীতি আপনাকে মানায় না।

সুবীরের কথায় চমকাল ভরত। তার মুখের উপর জবাব দেবার মত কোন কথা তার ছিল না। নির্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সুবীরের দিকে। কিছুক্ষণ পর তার চোখের পাতা নত হল। মনেতেও একটা ভয় ক্রিয়া করছিল। মুখে প্রকাশ না করলেও অস্বস্তিতে তার বুক চমকাচ্ছিল। সুবীরেব চিন্তাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল ঃ মানুষের লোভ, মোহ, ভোগ, অধিকার, সুখের কামনা, ঐশ্বর্যের আকাংখা, ধনের লালসার অমীমাংসিত রহস্যের কোনকালে মীমাংসা হবে না। মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে ঘৃণা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, লোভ, বৈরিতা, বিশ্বাসঘাতকতা। এসব ছোট স্বার্থের সংঘাতে গোলমাল বাধে। পদে পদে স্খলন অনিবার্য করে তোলে। তখন মহাকাল তার বিচার করে কঠিন দণ্ড দেয়।

সুবীর একটু চুপ করে থেকে বলল ঃ মহাকালের কালদণ্ডের ঘূর্ণিপাকে আপনি জন্ম থেকে এমন জড়িয়ে আছেন যে তা থেকে মুক্তির পথ বুঝি আর খোলা নেই।

সুবীরের দিকে একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ভরত। লোকচরিত্র অনুধাবনের অভ্যাস তার নেই। তবু, তার মুখ দেখে তার চরিত্র ও প্রকৃতির অভিব্যক্তি বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল ঃ আপনার কথার তাৎপর্য কিছু বুঝতে পারলাম না।

পারার কথা নয়। নিঃসংকোচে বলার অনুমতি পেলে তবে, জানাতে পারি।

ভরত একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গাঢ় স্বরে বলল ঃ অযোধ্যার সিংহাসনের উপর মোহ সৃষ্টি হয় এমন কোন কথা আমায় বলবেন না।

সুবীর একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল। অধর প্রান্তে ফুটে উঠল একফালি হাসি। বেশ বুঝতে পারল ভরতের মনের মধ্যে রাম সম্পর্কে এমন কিছু প্রত্যয় শিকড় গেড়ে বসেছে যা সহজে ওপড়ানোর নয়। তার শিকড় রয়েছে ভ্রাতৃত্ববোধের একটি আবেগে। তবু অসন্তুষ্ট হল না সুবীর। নিজের অজান্তে কেবল ভুরু কুঁচকে গেল। সুবীরের

মনে হল, ভরতের ভ্রাতৃত্ববোধের আবেগকে সরাসরি ঘা দেয়া ভাল হবে না। তাই একটা পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে খুব নিরীহভাবে সে বলল ঃ আপনার মাতার প্রার্থনা নির্মল। তবু ভৎর্সনা তিরস্কার তাঁর ভাগ্যের লিখন। মহিষী কৈকেয়ী লোভের বশবর্ত্তী হয়ে রামকে বনবাসে নির্বাসন করেছেন এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। তবু, মায়ের প্রতি আপনার নিজের কর্তব্য সম্পাদন করলেন না। কিন্তু রাজকুমার রামচন্দ্র বনযাত্রার প্রাক্কালে জননীর প্রতি পুত্রের সমুচিত কর্তব্য করে গেছেন। রামচন্দ্রের অনুপস্থিতির সময় মহিষী কৌশল্যা এবং সুমিত্রার নিরাপত্তা ও তাদের দেখাশোনার ভার অর্পণ করলেন বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের উপর।

ভরত প্রায় বিষণ্ণ স্বরে বলল ঃ আপনি আমাকে এরূপ শ্রুতিকটু কথা বলে পরিতাপিত করবেন না। আমি আবার বলছি, আমার রাজ্যাভিষেক ও রামের বনবাস বিষয়ে জননী যা করেছে তাতে আমার অনুমোদন নেই। তাই তাঁর কোন কথাই আমি স্বীকার করতে পারছি না।

সুবীর খুব একটু মলিন হেসে চোখ টান টান করে বলল ঃ রামচন্দ্রের ভ্রাতৃভক্তি আপনার মত উঁচুদরের নয়। তিনি কল্পনাপ্রবণ আবেগপ্রবণ মানুষও নন। কঠিন বাস্তবজ্ঞান তাঁকে কিছু রূঢ় ও সচেতন করেছে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে। রাজপ্রাসাদে কাউকে বিশ্বাস করেন না তিনি। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আগাম দান হিসাবে দিয়ে নিজের মনোমত চর নিযুক্ত করেছেন। বশিষ্ঠ পুত্র সুযজ্ঞের উপর মহিষী কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে দেখাশোনার ভার দেবার ছলে তাকে রাজপ্রাসাদে রাখলেন গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্যে। বনগমনের প্রাক্‌কালে দুঃখী দরিদ্র প্রজাদের প্রচুর ধনরত্ন বিলিয়ে তাদের হৃদয় জয় করলেন সে শুধু কুমার সম্পর্কে তাদের মনে বিদ্বেষের বীজ বপনের জন্যে। রামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কুমার ভরতের তারা নিন্দায় নিন্দায় মুণ্ডুপাত করেছে। আপনি সুখে শান্তিতে রাজ্যপরিচালনা করুন, রামচন্দ্র এটা চান না। তাই অশান্তির বীজ বপন করে গেছে অযোধ্যার মাটিতে। আপনার সঙ্গে একটা কূটনীতির লড়াই যাতে অব্যাহত থাকে রামচন্দ্র তার সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন করে গেছেন। আপনি বৃথাই মায়া মোহে কষ্ট পাচ্ছেন।

ভরত অবাক হয়, চমকায়। কিন্তু কথা বলতে পারে না। চোখে মুখে একটা ভয় ফুটে উঠল। মনে একটা কষ্ট হতে লাগল। বিশ্বাসে আঘাত লাগে বলে ভুরু কোঁচকাল। নানা চিন্তা ও জিজ্ঞাসায় তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। গলাটা ভারী শোনাল। বলল ঃ মহামাত্য সুবীর। আপনি কি এই সংসারটাকে এক ভয়ংকর জঙ্গল করে তুলতে চান? এতে আপনার কি লাভ? অস্বাভাবিক কোন কথা বলা আপনার শোভা পায় না।

সুবীর ভরতের মৃদু ভৎর্সনা বাক্যে বিমর্ষ হল। বিব্রত হয়ে বলল ঃ রাজকুমার! আপনি রাজপুত্র। রাজনীতি আপনার রক্তে। রাজনীতিতে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই, আদর্শবাদের কোন মূল্য নেই। আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে আসলে আপনি ভয়, ভীরুতা ব্যক্তিত্বহীনতাকে ঢাকতে চাইছেন।

মহামাত্য ! ভরতের কণ্ঠে ভয়ংকর ক্রোধ গর্জে উঠল।

রাজকুমার ! যে বীর, যার যোগ্যতা আছে সে বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ন্যায় ধর্ম রক্ষা করে। আপনার অবগতির জন্যে বলি যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছে তাতে যদি হার স্বীকার করেন তা হলে পরাজয়ের পরের দিনগুলি ক্লান্তি আর অবসাদ আনবে।

আমি ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী নই। জিতবার কোন আগ্রহও নেই আমার। আপনি দয়া করে আমাকে উত্তেজিত করবেন না।

আপনাকে উত্তেজিত করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জন করেছেন মান, যশ, সুনাম। তাকে এরকম করে নয়-ছয় করছেন এই কষ্ট ভুলতে পারছিনা।

মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা, প্রেমের এখনও মৃত্যু হয়নি মহামাত্য সুবীর। এসব হত্যা করে আমি রাজনীতির জন্যে রাজনীতি করতে চাই না। আমি অযোধ্যায় ইতিপূর্বে কোন রাজনীতি করিনি। তাতে অযোধ্যায় কোন ক্ষতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু জননী যেই সিংহাসন চাইল, অমনি গোলমাল বাধল। অথচ, তার আগে পর্যন্ত পিতা সুখে রাজত্ব করছিল। রামচন্দ্র পরমানন্দে দেশ সেবা করছিল। কোথা থেকে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসে সব কিছু গোলমাল করে দিলাম। রাজনীতি আর নয়।

কুমার, জননীকে দুঃখ দিয়ে কেউ কোন দিন বড় হয় না।

আশ্চর্য মানুষ আপনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার প্ররোচনা সত্ত্বেও রাজনীতি আমার সবটুকু সত্তা গ্রাস করেনি। আপনি এখানে বেশিক্ষণ থাকলে হয়ত আমি দানব হয়ে উঠব। আপনার মত বিপজ্জনক মানুষের এস্থানে থাকার কোন অধিকার নেই। এখনি এরাজ্য ত্যাগ করে চলে যান। আমাকে একটু একা থাকতে দিন।

দশরথের অন্ত্যেষ্টির পর চোদ্দ দিন কাটল, এর ভেতর ভরত শত্রুঘ্নের কেউ একবারও কৈকেয়ীর কক্ষে এল না। তাদের সঙ্গে দেখাও হল না কৈকেয়ীর। অথচ প্রতিদিন কৈকেয়ী তাদের আশায় আশায় দিন কাটায়। তারা কেমন আছে, কি করছে কে জানে? লোকজনের কাছে মায়ের প্রাণ খবর নেয়, কিন্তু তাতে মন ভরে না। চিন্তাও যে ঘোচে তাও নয়। স্পর্শকাতর মনটি তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। অথচ, সেকথা কারোকে জানানোর মানুষ নেই। মন্থরাকে শত্রুঘ্ন কেকয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন সে সঙ্গীহীন। একা। ভীষণ একা। তার নিঃসঙ্গতার কেউ সাথী নেই। একা একা এক অন্ধকূপের ভেতর সে তলিয়ে যায়। তখন আর কোন আত্মজন বা সুহৃৎকে নয়, নিজের অদৃষ্টকে মনে পড়ে।

অপমানবোধের কষ্ট যেন বুকে থাবা গেড়ে বসে। তীক্ষ্ম নখ বিঁধিয়ে যন্ত্রণা ছড়ায়। অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। দু'হাতে বুক চেপে ধরে ধীরে ধীরে শ্বাস

ফেলে। পায়ের পাতা মাটি শক্ত করে চেপে ধরে মনের কষ্ট দমন করে। সমস্ত শরীরে একটা কষ্টের ঝাপ্টা তাকে মাঝে মাঝে নিশ্চল করে দেয়। কখনও তার জ্বালায় অস্থির হয়ে ছটফট করে ঘরময়। অনুভূতি জুড়ে তোলপাড় করে ভরত সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন। ভরতের এধরণের মাতৃ অবজ্ঞা কেবল অবিশ্বাস্য নয় চিন্তার অতীত। ভরতের এ স্পষ্ট পশ্চাদপসরণের পশ্চাতে আছে তার দায়গ্রহণের অস্বীকৃতি। ভরত ছোট থেকে সব তাইতে কেমন নিস্পৃহ উদাসীন। তার চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে কোনদিন সে নিজেকে মেলাতে পারেনি। বোধ হয়, তার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে এরকমটা হয়। মাতা পুত্রের মনের গ্রন্থীবন্ধনটা দৃঢ় এবং মজবুত হয়নি তার। একটা আহত বিষণ্নতা তার প্রাণ জুড়ে বিরাজ করতে লাগল।

ভরতের মুখখানা অকস্মাৎ চোখের উপর ভেসে উঠল। অমনি বুকের ভেতর কেমন হু-হু করে উঠল। তাকে একান্ত বুকের কাছে পেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সে তার আপন জগতের মধ্যে এমন লুপ্ত হয়ে আছে যেন, একটা আড়াল তাকে ঘিরে থাকে, যাকে ভেদ করা কিংবা স্পর্শ করা যায় না। জননী হয়ে পুত্রের স্বভাব ও চরিত্রকে সম্পূর্ণ জানতে না পারার কেমন একটা লজ্জা তাকে সংকুচিত করল। মুখে বিব্রত অপরাধবোধের ছায়া পড়ল। কৈকেয়ীর মনের বিষণ্নতা দুঃখে রূপান্তরিত হল।

কিন্তু চলমান মুহূর্ত্ত মনের উদ্বেগকে আরো গভীরতর করল। নির্জন কক্ষের স্তব্ধতা, একাকীত্বকে আরো ভয়ংকর করল। নিজেকে এক অদৃশ্য বন্ধনের ক্রীড়নক মনে হল। দারুণ একটা কষ্ট দীর্ঘশ্বাস হয়ে যেন বুক থেকে বেরিয়ে এল। কণ্ঠস্বরে তার হাহাকার বাজল। ভরত। শত্রুঘ্ন! তোরা কোথায়?—আর্ত্তকান্নার স্বরে বলল: ভরত! তোর অবহেলায় আর অবজ্ঞায় আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল! তোর ভাল করতে গিয়ে আমি সব হারিয়ে বসে আছি। বোধ হয়, তোদের দু ভাইকেও।

কৈকেয়ীর দৃষ্টির কষ্ট যেন যন্ত্রণায় তীব্র হয়, নাকের হীরা কেঁপে যায়। জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি ফোটে বোবা ঠোঁটে। আটকে যাওয়া স্বরকে মুক্ত করার জন্যে জানলার কাছে যায়। নিঃশ্বাস ফেলে নির্বিকার প্রকৃতিকে জিগ্যেস করে: কি অপরাধে এত কষ্ট দিচ্ছ? আমার দুঃখ বেদনাকে এত বড় করে তুললে কেন?

কৈকেয়ীর অসহায়তা এত গভীর যা ক্রমে তা পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে এবং জীবন সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞতা দেয়। জীবনের গতি সরলরেখার মত নয়; সর্পিল। তার অজ্ঞাত বাঁকের মুখে ভরত এক বিস্ময়ের চকিত হুঙ্কার। সন্তানের উপর মায়ের অধিকার বোধের দাবি কখনো তার প্রাণের মূল ধরে নাড়া দিল না। পরিবর্ত্তে মায়ের প্রতি তার একধরণের বিজাতীয় ঘৃণা অবিশ্বাস তার প্রাণেতে এত গভীর দাগ কাটল যে জননীকে হৃদয় থেকে নির্বাসিত করতে এতটুকু কষ্ট হলনা। এই আবেগের গভীরে ডুবে সে নিঃশব্দে মাথা কোটে।

বিষাক্ত একটা পোকার মত ব্যর্থতা জনিত অপমান আর বিষাদ তার মাথার ভেতর

অনুভূতির ভেতর কি যেন কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল। আর কৈকেয়ীর সমস্ত বাস্তববোধ ওলোট পালোট হয়ে যেতে লাগল। অথচ, চোখের সামনে যা ঘটে, তাও বাস্তব। হয়ত, অতি ভয়ংকর কিংবা বীভৎস তা। তাই পুরনো বাস্তববোধের সঙ্গে তাকে মেশানো যায় না। কোন এক অদৃশ্য থাবা যেন পুরনো বাস্তববোধকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কৈকেয়ী নিজেকেই আক্রান্ত এবং বিপদগ্রস্ত ভাবল! ডাগর চোখ দুটির দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তার ভয়। কৈকেয়ীর অসহায়তা গভীর হয়। তার সমগ্র অনুভূতি অবশ হয়ে আসে। অবচেতনের গভীরে তলিয়ে যাওয়া মনটা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। আমি কি করেছি? কেন এই কলংক? নিজেকে সে আর সংযত রাখতে পারল না। "না, আঁ আঁ"—এই তীব্র দীর্ঘ আর্ত্তনাদের সঙ্গে কৈকেয়ীর নিজের কষ্ট তাকে মুক্ত করার প্রয়াসে স্খলিত স্বরে অধিকতর উচ্চ ও দুরন্ত হয়ে উঠল। ভারতের উপর তার অভিমান। নিজের মনে বলল ঃ নিষ্ঠুর। ভীষণ নিষ্ঠুর। এত নির্দ্দয় তুই'ত কোনদিন ছিলি না ভরত? তবে কার প্ররোচনায এমন কঠিন হল তোর হৃদয়? তোর কি চোখ নেই, মন নেই, অনুভূতি, উপলব্ধি কিছু নেই? তুই কি পাষাণে তৈরী? নির্জন কক্ষে তার আকুল কান্না প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নিজের দুঃখে যে মানুষ কত একা ও নিঃসঙ্গ, কৈকেয়ী অনুভব করল। মনেতে প্রশ্ন উদয় হল তবে কি স্নেহ ভালবাসা মমতা সবই চোখে ভ্রম? সংসারে এর কি কোন মূল্য নেই? মানুষের সঙ্গে জঙ্গলের জীবের তাহলে তফাৎ রইল কোথায়? নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণায় ভয়াবহ অনুভূতি কারোকে বোঝানোর ছিল না কৈকেয়ীর। এ শুধু তার নিজের। নিজের হাতে তৈরী অভিশাপ। একসঙ্গে ইহকাল পরকাল খুইয়েছে। পাপী তাপী হয়ে বেঁচে থাকার ভয়ংকর কষ্ট এক অপরাধে অভিশপ্ত। মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। স্বস্তিও পায়না। একটা কলঙ্কজনক সর্বনাশের ভাবনা তার উদ্বেগকে গভীরতর করে তুলল। বুকের ভেতর অভিমান পুঞ্জীভূত হয়। দশরথের উপর তার রাগ অভিমান একটা অজ্ঞাত ভয় ও উদ্বেগে দুর্বল হল তার অন্তঃকরণ। বিস্ময় বিভ্রান্তি অসহায়তায় কৈকেয়ী শিশুর মত কেঁদে ফেলল। আর্তকান্নার স্বরে বলল ঃ স্বামী! তুমি আমার জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছ। কি কুক্ষণে তুমি কেকয় গিয়েছিলে? তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত!

রাতের শেষ প্রহরে কৈকেয়ী ঘুমোল। সকালে তাকে জাগাল সূর্যের আলো আর পাখির ডাক। কোকিলের ডাকে হু হু করে উঠল তার বুক। খোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টি তার দিগন্ত ছুঁয়ে থাকে। কিন্তু সে দৃষ্টি স্থির এবং শূন্য। কিছুই নজরে পড়ছিল না। কেবল স্মৃতি ভাসছিল।

নিস্তেজ শরীরে উঠে সে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করল। তারপর ধীরে ধীরে দশরথের মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিঃশেষ করে দেখল। আবেগে বুক থরথর করে কেঁপে উঠল। চোখ ভরে গেল জলে। ঠোঁট চেপে ধরে কাঁদল কিছুক্ষণ। তারপর একটা উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ সব অর্গল

খুলে গেল। মর্মন্তুদ হাহাকারের মত কণ্ঠস্বরে বাজল ঃ আমার জীবনটাকে তুমিই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিলে? তোমার জন্যে আমার অমন সোনার চাঁদ ছেলেরা পর হয়ে গেল। তুমি ষড়যন্ত্র করে পুত্রদের আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। কেন? আমিত কোন দোষ করিনি। তবে, তুমি নিষ্ঠুর হলে কেন? আমি তোমার কি করেছি? উঃ উঃ—। দশরথের মর্মর মূর্তির উপর মাথা রেখে কাঁদল কৈকেয়ী। অভিমানে তার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। নাভির কাছ থেকে একটা কাঁপুনি উঠে এল। নিঃশব্দের ব্যঙ্গ স্নায়ুর মধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজতে লাগল।

দিন রাত্রি কিভাবে কাটে কৈকেয়ী টের পায় না। শূন্যতা যে কতখানি ভয়ংকর আর দুঃসহ হতে পারে নির্জন কক্ষে বসে কৈকেয়ী তা অনুভব করল। আর একটা অব্যক্ত কষ্ট মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল তার বুকে। রুদ্ধ অভিমানের তুফান উঠে। চোখের কোন জলে ভরে যায়। ফোঁপয়ানিতে কেঁপে উঠে বুক। লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনে একা একা বকে। স্বামীর মৃত্যু আর রামের বনগমনের জন্যে আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হলাম? যার জন্যে এইসব করা সে এর মধ্যে থাকল না। তবে, বৃথা এই অপ্রীতিকর ঘটনা না বুঝে, না জেনে কেন করতে গেলাম? এসবের মধ্যে কোনদিনই ছিলাম না, থাকতেও চাইনি, তবু অদৃষ্ট সেখানে এনে দাঁড় করল আমাকে। এযে কত বড় দুর্ভাগ্য বোঝাই কার? যারা সব চেয়ে আমার নিজের তারা কেউ বুঝল না আমার অন্তরের কথা। শুনল না আমার প্রার্থনা। রাগ করে, অভিমান করে আমাকে ত্যাগ করল। কিন্তু আমি যে মা! তারা আমার সাম্রাজ্য, আমার জীবন। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, তেমনি সন্তানই জননীর পরিচয়। সন্তানকে জড়িয়ে মায়ের যত স্বপ্ন, সাধ, সাধনা। মায়ের এই দুনিয়া ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকব? আমার হৃদয় যে তাদের জন্যে কেঁদে কেঁদে আকুল হয় সে খোঁজ কি রাখে তারা? দুঃখে, অনুতাপে, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে দিবসরাত্রি যে জ্বলছি; তার জ্বালা কি টের পায়? শুনতে পায় আমার কান্না? আমার প্রয়োজন কি তাদের ফুরিয়ে গেছে? অভাগী মাকে দেখতে তাদের একবারও ইচ্ছে করে না কি? কেমন আছে এই খবরটুকু পর্যন্ত দাস দাসীর কাছে খোঁজ করেনি কোনদিন। আমি কি শুধু ঘৃণার পাত্র?

কৈকেয়ী আর স্থির থাকতে পারল না। হু হু স্বরে কেঁদে উঠল। উচ্ছ্বসিত কাতর কান্না তার মর্মন্তুদ আর্তনাদের মত শোনাল। মাতৃত্বের বন্ধনটা তার যত জ্বালা যন্ত্রণা আর কষ্টের জন্যে দায়ী। সে কষ্ট ভীষণ ভয়ংকর এবং মর্মান্তিক। পুত্ররা তাকে ত্যাগ করেছে, সংসারেও তার কোন প্রয়োজন নেই। নিজের যে প্রয়োজন বলে কিছু আছে তার দাবিও ফুরিয়েছে।

নির্জনে আত্মসমালোচনা করতে করতে তার মনে হল, সে হয়ত ভুল করেছে। হয়ত তার জীবনের যোগ বিয়োগের ভুল। সংসার থেকে বনে পালিয়ে এ ভুল শোধয়ানো যাবে না, সংসারে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েই তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার অসাধারণ মাতৃত্বের গায়ে যে কলংক লেগেছে তাকে মুছে ফেলার প্রায়শ্চিত্ত

করে নির্মল শুভ্র মাতৃত্বের গৌরব রক্ষা করব। পুত্রের সঙ্গে সুখকর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে যা যা করবার সব করবে সে। তার নিজের যন্ত্রণা সকলের কল্যাণ হয়ে সকলকে অভিষিক্ত করুক এটাই তার একমাত্র কামনা।

বুকের ভেতর গুরু গুরু করে উঠল কৈকেয়ীর। স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। ভরতের নিদারুণ অবহেলার দুঃখ ভুলতে পারে না। অপমান বুকের ভেতর নিরন্তর পাক খেতে লাগল। তার বাদামী রঙের আয়ত দুই চোখে অপলক দৃষ্টিতে কেমন একটা সকরুণ ভাব ফুটল। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন।

ভরতের জন্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু পবিত্র মাতৃত্বের কলংক লেপন করে ভাগ্যের কি সুখ হল? পৃথিবীর সব কিছু বদলে যায়, কেবল কলংক কখনও বদলায় না। তার ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। সে স্থবির। অনন্তকাল ধরে পর্বতের মত অচল অনড়, তাকে নড়ানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ভরতের জন্যে সে ছোট হয়ে গেল। পেটের কাঁটার মত বড় শত্রু আর কে আছে? অথচ জননী হয়ে সে তার ভাল চেয়েছিল, তার শুভ কামনা করেছিল। সে বড় হোক, সুখী হোক, যশস্বী হোক এই মঙ্গল সে চেয়েছিল। কিন্তু এই চাওয়ার মধ্যে তার কোন পাপ কিংবা ছলনা ছিল না। অধর্ম কিংবা অসত্যও নয়। তবু ভরত ভ্রাতৃপ্রীতিবশে এমন আচরণ করল যাতে সত্যবাদিতা পাপ হল। অসত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে বিদ্রোহ করা হল পাগলামি। তাই সত্য মিথ্যা কৈকেয়ীর গণ্ডোগোল হয়ে গেল। মনের অতলান্ত থেকে থেকে বারংবার একটি কথাই তাকে আকুল করল জননীর স্নেহ কি পাপ? মানুষকে ভালবাসা, বিশ্বাস করা, পুত্রের শুভ ও মঙ্গল কামনা করা কি অন্যায়? দোষ! অপরাধ! তবু, এই মুহূর্তে কৈকেয়ীর নিজেকে দোষী, অপরাধী মনে হল।

ভরত তার অপরাধের শাস্তি দিতেই তার কক্ষে ঢোকে না। এখানে সে নিজের বিবেকের কাছে বন্দিনী। মনের কাছে নিঃসঙ্গ। দুঃসহ একাকীত্ব তাকে নির্বাসনের যন্ত্রণায় কাতর করছে। তার কেউ নেই। এমনকি পুত্র ভরত শত্রুঘ্নও নয়। কিন্তু এই সম্পর্ক সূত্রটা জট পাকানোর জন্যে তার দায়িত্ব কতখানি? সে'ত এর বিন্দু বিসর্গও জানত না? তবু সব অপরাধ, দোষ তার। সে একাই এর কলংক বয়ে বেড়াবে। কিন্তু কেন? আর পাঁচটা মেয়ের মত সেও স্বামী, সন্তান, সংসার নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজনীতির ঘূর্ণি ঝড়ে সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। সন্তানের জননী হওয়ার দিন থেকে তার সূচনা। বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায় বিচ্ছিন্নতা এসে তার কাছ থেকে সন্তান, স্বামী, সব দূরে সরিয়ে দিল। অন্যদিকে তেমনি বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষা, স্বার্থপরতা উত্তাল হল। দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, ভাষার সঙ্গে ভাষার, কালোর সঙ্গে সাদায়। তারপর সেই বিরোধ চুপি চুপি এসে ঢুকল পরিবারের ভেতর। বিরোধ বাধল পরিবারের পতি ও পত্নীতে, পিতায় ও পুত্রে, ভাইর সঙ্গে ভাইর। শেষ সংঘাত বাধল মাতাতে পুত্রতে। এ কি কম বিপর্যয়! এই বিপর্যয়ে ওলোটপালোট হয়ে

গেল তার জীবন। এখন শুধু নিজের সঙ্গে নিজের সংঘর্ষ। নিরন্তর সংঘর্ষে তার মনের ভেতর কেমন একটা রূপান্তর চলেছে।

দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াল কৈকেয়ী। এ কি চেহারা হয়েছে তার? একেবারে ভোল পাল্টে গেছে! নিজেকেই নিজে চেনা তার দায় হল। গালের সেই মোহন টোলটা একটা গর্ত ছাড়া আর কিছু নয়। শরীরের কাঁচা সোনার রঙ পুড়ে তামার মত হয়েছে। চোখের কোণে কালির দাগ। দৃষ্টি নেভা। কিন্তু মুখ চোখ থেকে নিদারুণ ঘৃণা, বিদ্বেষ নিঃশেষে মুছে গেল। তপস্বিনীর মত দেখাচ্ছে তাকে।

চৈত্রের শেষ। আকাশ নীল। বাতাস স্তব্ধ। গাছপালা শান্ত। প্রকৃতিলোক নির্বিকার। নিশ্চল গাছের পাতারা একটি একটি করে ঝরে গেছে। ডালপালা মেলে কঙ্কালসাড় কাণ্ডখানা আকাশের দিকে মুখ তুলে কার জন্যে যেন দিবারাত্র প্রার্থনা করে চলেছে। প্রকৃতি তার মতই যোগিনী সেজেছে। বৈরাগীর এক তারা নিয়ে সেও বেরিয়ে পড়েছে পথে। তার উদাস করা গানের সুরে বাতাস উতলা হয়, পৃথিবী বিরহী হয়। নদীর জলে লাগে ভাঁটার টান। ছোট ছোট ঢেউয়ে বাজে বৈরাগীর খঞ্জনী।

বাতায়ন পাশে দাঁড়িয়ে কৈকেয়ী পিপাসিত অনুভূতির প্রতিরন্ধ্র দিয়ে গ্রহণ করল প্রকৃতির আশ্চর্য তাপস্বিনী মূর্তিকে। সম্মোহিতের মত স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হতে লাগল, চৈত্রের প্রচণ্ড তাপে যেন কোমল অনুভূতিগুলোর রক্ত মাংস নিঙড়ে নিয়ে তাকে বিবেকহীন এক অমানুষ করেছে, তাই রামচন্দ্রের উপর এত নিষ্ঠুর হওয়া তার সম্ভব হয়েছে। একগুঁয়ে হৃদয়হীনতা স্বামীর মৃত্যুকে শুধু শুধু ত্বরান্বিত করেছে। বুকের ভেতর হাহাকার গুব গুর করে উঠল। কিন্তু কৈকেয়ী জোর করে চাপা দিল সেটা। কষ্টটা চাপতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখের অবশ্যম্ভাবী জলটুকু আঁচলে মুছে নিল।

অস্থির কৈকেয়ী কতবার যে ঘরবার করল তার ইয়ত্তা নেই। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। অপলক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল: চৈত্রের কালবৈশাখী ঝড় সে। আর ভরত রাজগৃহের পুরোন ভিতের মত। সে বন্য দুরন্ত টগবগে আর ভরত স্থির শান্ত, স্থবির গৃহের মত। তথাপি, তার স্নিগ্ধ ছায়া আছে। আছে সুনিশ্চত আশ্রয়। তার শান্ত সংযত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে সব কিছুই নিরাপদ। জীবনের ও স্বভাবের ছন্দপতন করা তার ধর্ম নয়। যক্ষের মত সে আগলায়; বৃক্ষের শিকড়ের মত মাটি কামড়ে ধরে সে ঐতিহ্য, প্রথা, সাংস্কৃতিকে রক্ষা করে। আর কৈকেয়ী কালবৈশাখীর প্রমত্ত ঝড়ের মত রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে অকস্মাৎ চঞ্চল অস্থির করে তোলে রাজবাড়ির পুরোন ভিতকে। তার উম্মাদ আক্রমণে শুধু গৃহের ছাদখানা উড়ে গেছে। কিন্তু পুরোন ভিতের কিছু হয়নি। নির্বিকারভাবে ভরত বাইরের তাণ্ডব সহ্য করল কিন্তু নিজে বিচলিত হল না।

মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানা। বুকের ভেতর জ্বালা, ক্ষোভ, অভিমান, দুঃখের কোন অনুভূতি নেই। কেবল থেকে থেকে মনে হতে লাগল: ভরতের

শরীরে বিশুদ্ধ আর্যরক্ত। আর্যভরত অনার্য বিদ্বেষ নিয়ে অনার্যমাতার উপর প্রতিশোধ নিল, একি তার কম গৌরব! পুত্রের এ গৌরবে সেও একজন অংশীদার! পুত্রের জয়ের গৌরবতৃপ্তিতে কৈকেয়ীর মন উদ্ভাসিত হল।

এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল কৈকেয়ী, এমন সময় ভরত এল সেখানে। পিছন থেকে ডাকল ঃ মা! মাগো।

ভরতের ডাক শুনে কৈকেয়ীর প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা কেঁপে উঠল। তার অনুভূতির মধ্যে একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকের মত বুকের ভেতর নানা অনুভূতি, সংশয়, জিজ্ঞাসা ঝলকিয়ে উঠল। আশার নাকারা যেন বুকের ভেতর খুব উচ্চরবে বাজতে লাগল। তার শরীর ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত নিমেষে সোজা হয়ে উঠল। পালঙ্ক কাঁপিয়ে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসল। প্রকৃতপক্ষে, বুকের দ্রুত-স্পন্দন তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। পড়ি মরি করে পালঙ্ক থেকে নেমে ছুটে গেল ভরতের দিকে। শত্রুঘ্নও ছিল তার পাশে।

কৈকেয়ীর দৃষ্টি স্থির। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। ভরত শত্রুঘ্নের চোখের উপর চোখ রাখতে ঠোঁট কাঁপে থিরথির করে। একটা অশান্ত আবেগের ঘূর্ণি বুকের ভেতর থেকে উৎসারিত হয়। মুহূর্তে তা আনন্দ সাগরে রূপান্তরিত হয়ে উথাল পাথাল, করতে লাগল। ঢেউ শুধু ঢেউ। সারা শরীরে ঢেউ তুলে যেন ধেয়ে এল। দৃষ্টিতে উদ্বেগের রূপ বদলায়, প্রাণের উদ্বেলতায় ভাসিয়ে উঠল সব কিছু।

কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর তার মাতৃত্ব গলে গলে পড়ছিল। আধবোজা দুই চোখ ফেটে অশ্রুর নির্মল সলিলধারা পূতপ্রবাহিনী গঙ্গার মত ধেয়ে আসছিল। কেকেয়ীর কান্নায় কোন শব্দ ছিল না। কেবল মৃদু ও মন্থর ঢেউয়ে বুক ওঠা নামা করছিল। চিবুক কাঁপছিল।

জননীর নিঃশব্দ কান্নার ভাষা ভরতের পাঠ করতে কোন অসুবিধা হল না। সে আরো অনুভব করতে পারল; জননী এবং তারা দুভাই যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ফাঁকটুকু কেকেয়ী বিছুতে অতিক্রম করতে পারছে না। তার বিমর্ষ মুখে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। ব্যাকুল নয়নে তার আবেদন আর করুণ মিনতি। ভরত আরো অনুভব করল তার দুই ওষ্ঠের ফাঁকে সাজানো দাঁতের সাড়ি যেন প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে তার বুকের ভাষা আটকে রেখেছে। তার চাহনিতে লজ্জা ও আত্মগ্লানির কষ্ট। চোখে অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। একটা মুগ্ধ মুহূর্ত ভরতকে জননীর দিকে টানতে লাগল। অলৌকিক একটা অনুভূতি অজ্ঞাতে মনের মধ্যে নিবিড় হয়ে নেমে এল। অন্তর্চেতনার স্রোতে বুক ভাসিয়ে এল করুণা, মায়া, গভীর ভালবাসা। শিশু বয়সের সেই দুকুল ছাপানো আবেগ নিয়ে সে 'মা' বলে কৈকেয়ীর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল।

বুকের মধ্যে ভরতকে চেপে ধরে কৈকেয়ী ফুঁপিয়ে উঠার মত আর্তনাদ ক'রে উঠল এবং সেই মুহূর্তে মনে হল, জননীর হৃদয়ের মহত্তম আকাঙ্খার পূর্ণতার একটা সুখানুভূত তার হৃদয়তন্ত্রীতে মোমের মত গলে পড়ছে। শরীরের প্রতি কোষে মাতৃত্বের স্নেহধারা ক্ষরিত হলে যে, এত উল্লাস আর যাতনা থাকতে পারে জানা ছিল

না কৈকেয়ীর। অনির্বচনীয় মহিমময় সুখের অনুভূতি মন থেকে রাগ, বিরাগ, মান অভিমানকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তার জীবনে আর একটি পথ খুলে দিল। যে পথ আগের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হলেও, যেন এক বাঁক থেকে একেবারে ভিন্ন এক পথে, যার মধ্যে ছিল রক্তের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং এক অতল গভীর মমতা।

কৈকেয়ীর বুক থেকে একটা উৎকণ্ঠিত কষ্টের ভার নেমে গেল। মুখের ও চোখের রূপ বদলে গেল। কেমন একটা খুশি আর গৌরব বোধ জাগল মনে। মুগ্ধতা এবং স্নেহ কৈকেয়ীর চোখে নিবিড় হয়ে এল। স্বপ্নের ঘোর তখনো কাটেনি। আচ্ছন্ন স্বরে বলল ঃ ভরত! বাবা আমার!

ভরতও কম অবাক হল না। জননী যেন আমূল বদলে গেছে।

ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অন্য মহিয়সী মহিলা। কাদার পিণ্ড থেকে এক দেবী বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। উচ্চাকাংখার আগুনে যে জ্বলে উঠেছিল প্রত্যাখ্যানের আগুনে পুড়ে পুড়ে সে সোনার মতই খাঁটি হল। কৈকেয়ীর দৃষ্টি ও বাক্যের যন্ত্রণার কষ্ট তার মানসিক পরিবর্তনের জন্য। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে জননীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনন্দে উজ্জ্বল হল মুখ।

ঘটনার আকস্মিকতার মধ্যে ভরতকে ভাল করে দেখা হয়নি কৈকেয়ীর। সহসা তার চোখ পড়ল ভরতের বসনে, উত্তরীয়তে অবশেষে চূড়া করে বাঁধা চুলের উপর। স্বপ্নের ঘুম তৎক্ষণাৎ ভেঙে গেল। বুকের নিঃশ্বাস মেঘ আবর্তিত হল। প্রতিক্রিয়া সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ঝাপ্টাতে লাগল। আকাশ দিনমানে অন্ধকার বোধ হল। পৃথিবী মাথার মধ্যে বনবন করে ঘুরতে লাগল। তীব্র ব্যথায় বুক টনটনিয়ে উঠল। বুকের স্পন্দন তাকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিগ্যেস করল? এ সাজে সেজে কোথায় চলেছ পুত্র?

ভরত কৈকেয়ীর দিকে না তাকিয়েও মায়ের অনুসন্ধিৎসু নিবিড় দৃষ্টি প্রতি অঙ্গে অনুভব করতে পারছিল। শংকিত বিহ্বল অনুভূতির মধ্যে নিজেকে হারাল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস গলায় বলল ঃ তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। এ রাজ্য আমার বিষবৎ বোধ হচ্ছে। রামচন্দ্রের জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়েছে। তাকে রাজ্য দিয়ে আমি বনবাসে যাব।

ভরত! কৈকেয়ীর বিস্মিত স্বরে উদ্বেগ ও আতঙ্ক বেজে উঠেছিল।

মা! আচ্ছন্ন স্বরে ডাকল ভরত। পরমুহূর্তেই চোখের পাতায় তার নিবিড়তা নেমে এল।

কৈকেয়ীর চোখের তারা দুটো যেন সহসা উদ্দীপ্ত আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবেগের ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে একটা সুন্দর অনুভূতি তাকে বৃহত্তর ত্যাগের প্রস্তুতির সংকেত দিচ্ছিল। ভরতের চোখের তারায় কৈকেয়ী যে রহস্যের দ্যুতি দেখতে পেল তাতে তার নিজের প্রাণও দ্যুতিময়ী হয়ে উঠেছিল। নিখাদ আবেগে তার মন পূর্ণ হল। মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হল তার মুখমণ্ডল। বিগলিত কণ্ঠে বলল ঃ আজ আমার আনন্দের দিন, মুক্তির দিন।

এক বিস্মিত জিজ্ঞাসার ঝিলিক দিল ভরতের মনে। মায়ের ব্যাপারটা তার অদ্ভুত লাগল। স্মৃতিচকিত হয়ে উঠল ভরতের জিজ্ঞাসা। বলল ? মা তোমার কি হয়েছে আজ ? আমি তোমার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না !

কৈকেয়ীর শরীর ও হৃদয় জুড়ে বেজে যাচ্ছিল বিসর্জনের বাজনা। তার বুকে রাগ অভিমান অহংকার কিছু ছিল না। প্রাণের সমস্ত দিগন্ত মুক্তির আনন্দে ঝলমল করছিল। ভরতের বিস্ময়ে সে নিঃশব্দে ফিক করে হাসল। বলল ঃ আমি যা পারিনি করতে আমার পুত্র হয়ে তুই তা করলি বাবা। আমাকে তুই অপরাধ থেকে, পাপ থেকে মুক্তি দিলি। আমার মনে আর কোন গ্লানি নেই।

ভরত চমকাল। তার বুকে আবেগ শিব শির করে উঠল। সম্মোহিত হয়ে অবাক স্বরে ডাকল ঃ মা !

ভরত তুই আমার মহাপ্রাণ পুত্র। আমার গর্বের ধন। বিধাতার আশীর্বাদ। ত্যাগ তোকে সুন্দর আর বড় করেছে। বোধ হয়, রামের চেয়েও।

ভরতের বিস্ময়ের অন্ত নেই। জননীকে এতো প্রগলভ হতে দেখেনি কখনও। জীবনের বাস্তব কি আশ্চর্য, স্থান কালের পরিস্থিতির এই মুহূর্তে কৈকেয়ী প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মতই অপরূপ হয়ে উঠল। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভরত বলল ঃ মাগো, আমায় রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ হয়ে থাকতে দাও। ছোট হয়েই যেন আমি তাকে পূজা করতে পারি—এই আশীর্বাদ কর।

অপূর্ব ! কৈকেয়ীর পুত্রের উপযুক্ত কথা। পুত্রের এত বড় জয়ের পাশে মায়ের পরাজয় কি মানায় ? বড় আদর্শের আলো যখন আমার মত ছোট মন ছোট প্রাণ মানুষদের উপর পড়ে, তখন তার ছটায় আমরাও উদ্ভাসিত হয়ে উঠি। সমস্ত পাপ, অন্যায়, স্খলন-পতন স্বার্থকতা নিয়ে আদর্শের পতাকাতলে আমরাও কিছু বড় হয়ে উঠি। কলঙ্ক, কালিমা, দুর্বলতা হঠাৎ কেটে যায়।

মা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

না, বাবা আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। হৃদয়ে আজ মুক্তির প্লাবন। আমাকে তুমি সবার সামনে বড় হবার অপূর্ব-সুযোগ এনে দিয়েছ। মানে, সম্মানে, ক্ষমতায় বড় হওয়া নয়—ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে বড় হওয়া। মহান হওয়া। কলঙ্কের কালিমা আমার মুছে যাবে। তখন লোকের চোখে, মানুষের মনের মন্দিরে আমি হয়ে উঠব এক সার্থক রত্নাগর্ভা জননী। পুত্র তুমি নীরব কেন ? চাঁদের কলঙ্ক তার গৌরব। শুভ্র নির্মল আলোর তুলনায় তার কলঙ্ক কত সামান্য। লোকে'ত চাঁদের আলোকেই পছন্দ করে, কলঙ্ককে নয়। তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় কবির অলস কল্পনা। সুন্দরের আরাধনায় সে কলঙ্ককে দরকার পড়ে কবির পূজার নৈবেদ্য করতে। আমাকেও মাতৃত্বের মহিমা নিয়ে চাঁদের মতই আলোকোজ্জ্বল হতে হবে, কলঙ্ক গৌরব না হোক, অগৌরবের কালিমায়-জীবনকে সে অন্ধকার করতে পারবে না।

ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ভরত কৈকেয়ীর দিকে তাকিয়ে ছিল। দৃষ্টিতে কোনো প্রশ্ন ছিল না। যেন এমনিই একটা দার্শনিকতা, যা সব প্রশ্নের অতীত। দেহের

মৃত্যু সত্য। কিন্তু অমরত্বের তৃষ্ণা নিরন্তর। তাই মানুষের আত্মনাশ কখনও একেবারে হয় না। বাঁচাবার তীব্র ইচ্ছা তাকে অমরত্বের প্রতি লোভী করে। অমরত্বের পিপাসা কৈকেয়ীর অনুভূতি উপলব্ধির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাকে এক অন্য মানবীতে রূপান্তরিত করল। অপ্রস্তুত বিস্ময়ে ভরত তাই থমকে গিয়েছিল। স্নিগ্ধ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল। চিন্তান্বিত মুখে খুব শান্ত স্বরে বলল ঃ সত্যি বলছো নাকি ? এমন চিন্তা আগে করলে না কেন ? এ যদি তোমার প্রাণের কথা হত, তাহলে এ ভুল করতে না কখনও। দোষের ভাগী হয়ে থাকতে হত না তোমাকে।

ভরতের কথাটায় কৈকেয়ীর পুরনো ক্ষতে ব্যথা দিল। মায়াবী চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে ভরত শত্রুঘ্নকে দেখল। কৈকেয়ীর বুকে অভিমান জমল। বিষণ্ণ গম্ভীর গলায় বলল ঃ আচ্ছা ভুল কি শুধু আমার ? তোদের কারো কোন দোষ হয়নি ?

কৈকেয়ীর প্রশ্নে ভরত একটু উদ্বিগ্ন হল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা এবং যে মতগুলো আছে তা কখনো অন্যের কাছে ব্যক্ত করে না। তর্ক করতে ভরতের ভাল লাগে না। স্থান কাল-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জননীর প্রশ্ন এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে ভরত মৃদুস্বরে তার উত্তর করল ঃ 'না, আমরা সবাই তোমার নির্মল শুভ্র মাতৃত্বকে অপমান করেছি, তার উপর অবিচারও করেছি। দোষী আমরা সবাই। এখন বুঝতে পারি রামচন্দ্র নিজের ভুল, অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করে প্রায়শ্চিত্ত করতে দ্রুত বনে গিয়েছিল।'

কৈকেয়ী ভরতের উত্তরে অপ্রতিভ হয়ে একটু হাসল। তবু তার বুকের পুরনো ক্ষতটা বড় জ্বালা দিচ্ছিল। ব্যথিত ও বিমর্ষ কৈকেয়ী শরবিদ্ধ হরিণের মত কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ভরতের মুখের দিকে। ভরত তার অস্বস্তি কাটানোর জন্যে বলল ঃ তবু বলি, তোমার জননীত্বে অভিমান আর অহংকার দুই আছে। বিধাতা অহংকার সইতে পারে না। বোধ হয় তোমার মাতৃত্বের অভিমানের উপর এমনি করে এক কলংক লেপে দিল।

কৈকেয়ীর মুখখানা সহসা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। একটা অদ্ভুত কষ্টে আর ব্যথায় তার বুক টনটন করতে লাগল। শরীরও কাঁপল। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দেয়ালে শরীরের ভর রেখে সে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল। চোখ বুজতেই দেখতে পেল রামচন্দ্রের মুখ। বনবাসের কষ্ট, পথ শ্রান্তিতে সে মুখ শীর্ণ, সাদা। এবং ঠোঁট শুকনো। চোখের কোণে কষ্টের হাল্কা নীল ছোপ পড়েছে—তৎসত্ত্বেও সে মুখ বড় সুন্দর। আশ্চর্য মায়াময়। দৃশ্যটা তার বুকের যন্ত্রণাকে আরো তীব্র করল। চোখ খুলল। বিস্ফারিত চোখে চাইল ভরতের মুখের দিকে। একটা বড় শ্বাস ফেলল। কষ্টটা অনেকখানি বেরিয়ে গেল শ্বাসের সঙ্গে।

ভরত মাথা হেঁট করে তাকে প্রণাম করতে আসছিল। পিছনে তার শত্রুঘ্ন। পায়ের পাতাতে মাথা ঠেকিয়ে ভরত প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে। প্রবল সম্মোহনে কৈকেয়ীর পা দু'খানা যেন তাকে আটকে রেখেছিল। চোখের জলে যেন মাতৃপদ তর্পণ করল। স্খলিত ভেজা গলায় বলল ঃ মা, আমাকে বিদায় দাও। আশীর্বাদ কর, আবার

তোমার এই রাঙা দু'চরণ যেন প্রণাম করতে পারি। রামচন্দ্র না ফিরলে আমি আর অযোধ্যায় ফিরব না। জানি না রাক্ষুসী অযোধ্যা কি চায় ?

ভরতের কথায় কৈকেয়ীর কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগল। একটা বিষণ্ণ ব্যথায় টনটন করছিল তার বুক। কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতা তার দুই চোখে। বিস্ময়ের মধ্যে আনন্দ এবং মুগ্ধতা যুগপৎ তার মুখে বিরাজ করছিল। গম্ভীর গলায় বলল ঃ রামচন্দ্রের কাছে আমাকেও নিয়ে চল, বাবা। আমি না গেলে সে অযোধ্যায় ফিরবে না। আমার উপর রাগ করে অভিমান নিয়ে সে চলে গেছে। বড় অভিমানী রাম আমার।

শত্রুঘ্ন সহসা অবাক হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল ঃ তুমি কোন মুখে দাঁড়াবে তার সামনে ?

শত্রুঘ্নের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কৈকেয়ী যেমন অবাক, তেমনি বিপন্ন। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। প্রতিবাদের উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল কৈকেয়ীর শরীর। আত্মপ্রত্যয়ে ভ্রূকুটি দৃষ্টি ও মুখ পলকের জন্যে শক্ত হয়ে উঠল। একটু ব্যস্তভাবে জোর দিয়ে বলল ঃ মায়ের দাবি আর অধিকার নিয়ে দাঁড়াব তার সামনে। সন্তানের কাছে মায়ের কোন লজ্জা থাকে না। জননী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়ালে কোন পুত্র ফেরাতে পারে তাকে ? ?